সুশান্তকুমার চাকু

বৈষ্ণব কাব্যের কবিভাষা

1

বৈষ্ণব কাব্যের কবিভাষা

D

3

বৈষ্ণব কাব্যের কাব্যভাষা

ড. সুশান্তকুমার চাকু

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা : ৭০০০০৯

Vaishnab Kabyer Kabibhasa Poetic Diction of Vaishnab Literature by Dr. Susanta Kumar Chaku Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2, Ramanath Majumder Street, Kolkata : 700 009, January 2011, Rs. 130.00

গ্রন্থস্বত্ব
শ্রীমতি বীথিকা চাকু

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০১১

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
বিভাবসু

অক্ষর বিন্যাস
শালিনী ডটস্
১৯/এইচ/এইচ/গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০ ০০৬

মুদ্রণ
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ISBN : 978-81-89827-61-8

মূল্য : একশো তিরিশ টাকা

পিতা মাতা, গুরু,
গুরুজনদের উদ্দেশ্যে
নিবেদিত

ভূমিকা

কবিতার ভাষা তথা কাব্যভাষা নির্মাণ গদ্যভাষা অপেক্ষা স্বতন্ত্র যত্নপ্রসূত। কবিভাষার গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ শব্দ নির্বাচন। এই নির্বাচন কবি এমন সুচারুরূপে সম্পাদন করেন ও সাজিয়ে তোলেন যাতে কবি-প্রেরণাটি ওই কবিভাষা আশ্রয়ে পাঠক মনে সঞ্চারিত হয়।এই সঞ্চরণের ক্ষেত্রে কবিভাষায় প্রযুক্ত নতুন শব্দাবলী, শব্দের নানা রূপান্তর-ভাঙাগড়ার সঙ্গে ছন্দবোধ এক মুখ্য ভূমিকা আশ্রয় করে। যুগ-প্রভাবিত ব্যক্তিত্ব সাপেক্ষে কবিগণ যে স্বতন্ত্র ভাষা রচনা করেন তা অলংকৃতও বটে। অলংকার-ব্যবহারের মাধ্যমেও কবি প্রকাশ করে থাকেন বিষয়বস্তুর ব্যঞ্জনা। এই সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার জগতে প্রবেশ করার জন্য কবিতায় আমরা দেখতে চাই বিশেষ চিত্রকল্প। কবিভাষার প্রাঞ্জলতা, ধ্বনিব্যঞ্জনা, সুবোধ্যতা সৃষ্টির পিছনে বাক্য বা পদ গঠন কৌশলও বিশেষ ভূমিকা নেয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যই কবিভাষা পাঠকের কাছে আলাদা জগৎ সৃষ্টি করে। অবশ্য রাষ্ট্রীয় প্রভাব বা সমাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে অনেক সময় কবি সামাজিকদের স্বতঃস্ফূর্ততা ব্যাহত হয়। ফলে কবিভাষাও কম বেশি। দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে।

আলোচ্য বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্যভাষা আলোচনাতেও এই সত্য উদ্‌ঘাটিত যে, প্রাচীন-মধ্যযুগের বাংলা কাব্য তথা চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী মূলত ধর্মভিত্তিক রচনা-সৃষ্টি। তথাপি ধর্মের প্রয়োজন মিটিয়ে কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টিতেও তা সমান পারঙ্গম। নিছক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি নয়, চর্যা থেকে বৈষ্ণব পদাবলী—সর্বত্রই কাব্যের রূপরীতিগত ঐতিহ্যে নতুনত্ব সংযোজিত। তন্মধ্যে বৈষ্ণব কাব্যেই কাব্যের ঐশ্বর্যময় জগতের প্রকাশ সমধিক। জয়দেবের ভাষা প্রাক্‌চৈতন্য যুগের আদর্শ স্বরূপ। আবার চর্যাপদের দ্ব্যর্থকতাও একটা নতুন রীতি। চর্যার বৌদ্ধ-ধর্মবিশ্বাস-নির্ভর কাব্যভাষা, মঙ্গলকাব্যের মনসা—, চণ্ডী—, ধর্ম প্রভৃতি কাল্ট-সাহিত্য অপেক্ষা রাধাকৃষ্ণ-ধর্মবিশ্বাস গত বৈষ্ণব কাব্যভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে প্রেম উপজীব্যতা স্বীকার্য। বৈষ্ণব কাব্যভাষার বর্ণাঢ্যতা ও বৈচিত্র্য

রাধাকৃষ্ণ প্রেমভাবনার সূক্ষ্ম রস ব্যঞ্জনায় মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, বাসু ঘোষ, জগদানন্দ, শশিশেখর, লোচনদাস প্রমুখ কবিদের কবি ব্যক্তিত্ব সমৃদ্ধ করেছে বৈষ্ণব কাব্যের কবিভাষা। তাঁদের কাব্য বিশ্লেষেণের অনুবর্তনে বৈষ্ণব কাব্যের কবিভাষার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে।

সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যাঁরা এ বিষয়ে আমাকে গবেষণা কর্মের অনুমতি দিয়েছিলেন। স্মরণ করি প্রয়াত প্রফেসর ড. নীলরতন সেন মহাশয়কে যাঁর সক্রিয় তত্ত্বাবধানে কাজটি সম্পন্ন করেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি বহু গ্রন্থাগারের সহৃদয় সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়, ড. রামেশ্বর শ' নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। এঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। এছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক ড. জ্যোর্তিময় ঘোষ, অগ্রজ তুল্য অধ্যাপক ড. রতন কুমার নন্দী, ড. দীপক দাশগুপ্ত, অধ্যাপক শিবনাথ দে প্রমুখও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। লামডিং (আসাম) কলেজের প্রয়াত অধ্যক্ষ অশোক পাল এবং বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বন্ধুবর অধ্যাপক জাফর আলি খান, অধ্যাপক নিবাস পাল, অধ্যাপক সুলেমান আলি, অধ্যাপক বিশ্বতোষ রায় আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি বন্ধুস্থানীয় কিশোর সাহা, মিলন ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখের নাম। গোবর ডাঙ্গা হিন্দু কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, প্রাক্তন ও বর্তমান বহু ছাত্রছাত্রী গ্রন্থটি প্রকাশে আমাকে সহায়তা করেছেন। স্নেহাস্পদ ছাত্র ও বর্তমান সহকর্মী শ্রী উৎপল কুমার মণ্ডল (বিভা বসু) গ্রন্থটির প্রচ্ছদ অঙ্কন করে দিয়ে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার সহধর্মিনী

শ্রীমতী বীথিকা চাকু, সহোদর শ্রীকান্ত চাকুর নিরন্তর সহযোগিতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

সর্বোপরি স্মরণ করি প্রকাশক শ্রী দেবাশিস ভট্টাচার্য মহাশয়কে যাঁর নিরলস যত্ন, মনযোগ ও ধৈর্য ছাড়া গ্রন্থটিকে পাঠক সাধারণের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়ত সম্ভবই হতো না। প্রকাশনা সংস্থার সমস্ত সহকর্মীরাও নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। উপরোক্ত সকলের সহযোগিতায় প্রকাশিত গ্রন্থটি পাঠক সমাজে স্বীকৃতি পায় কিনা সেজন্য অপেক্ষা করে আছি। দ্রুত প্রকাশের জন্য কিছু ত্রুটি স্বীকার করে নিচ্ছি। আশা করি, নানা দিক থেকে আলোচনার জন্য তথা গ্রন্থটির উৎকর্ষ বিধানে মূল্যবান পরামর্শ পেলে পরবর্তীকালে সে সম্পর্কে সজাগ থাকব। ইচ্ছা রইল পরবর্তীকালে কবিব্যক্তিত্ব, শৈলীগত দৃষ্টিকোণ, শব্দার্থ ও পরিশিষ্ট সংযোজনারও।

সূচিপত্র

কাব্যভাষার পরিচয় বৈষ্ণব কাব্য ও কবিব্যক্তিত্ব	১৩
বিদ্যাপতির কাব্যভাষা	১৯
চণ্ডীদাসের কাব্যভাষা	৫০
জ্ঞানদাসের কাব্যভাষা	৬৯
গোবিন্দদাসের কাব্যভাষা	৯৩
কয়েকজন গৌণপদকর্তগণের কাব্যভাষা বলরাম দাস, বাসু ঘোষ, জগদানন্দ, শশিশেখর ও লোচন দাস	১২০
উপসংহার	১৫৭

কাব্যভাষার পরিচয় বৈষ্ণব কাব্য ও কবিব্যক্তিত্ব

কাব্যালোচনায় বিশিষ্টার্থে কবিভাষা বা পোয়েটিক ডিকসন[১]-এর ব্যবহার এখন আর বাংলা কাব্য সাহিত্যেও অপরিচিত নয়। বলা যায় যে, বাগৈশ্বর্য (ল্যাঙ্গুয়জ), ছন্দ (রাইম), অলংকার (রেটরিক), বাক্‌প্রতিমা (ইমেজ) প্রভৃতি শৈল্পিক কারুকৃতি, কবির কল্পনা, কবি প্রতিভার সৃজনী শক্তি, ভাবানুভূতি ও কাব্যের বিষয় এবং কবি ব্যক্তিত্বের অখণ্ড অন্তরঙ্গ-তায় সম্পৃক্ত হয়ে কাব্যের যে প্রত্যয় সমৃদ্ধ ও স্বাতন্ত্র্য বিভূষিত স্বকীয় ব্যঞ্জনা তারই সামগ্রিক সত্তা কবিভাষা বা পোয়েটিক ডিক্‌সন্। আলোচ্য 'বৈষ্ণব কাব্যের কবিভাষা' প্রসঙ্গেও একথা প্রযোজ্য। কবিভাষায় কবি ও কাব্যের সামগ্রিক অস্তিত্বের অভিপ্রকাশ ঘটে বহু বিস্তারিত শৈল্পিক অনুষঙ্গে। অ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী ঃ

> "The perfection of Diction is for it to be at once clear and not mean... On the other hand the diction becomes distinguished and non-prosaic by the use of unfamiliar terms, i.e. strange words, metaphor, lengthened forms, and everything that deviates from the ordinary modes of speech.... A certain admixture, accordingly, of unfamilier terms is necessary."[2]

অর্থাৎ কবিতার তথা রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে আছে প্রাঞ্জলতা, দ্বন্দ্বময়তা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত গদ্যধর্মী নয় এমন ভাষাবাহিত বাক্য, নতুন শব্দাবলীশোভিত ভাষাপ্রয়োগ, নতুন-পুরাতন শব্দের মিশ্রণে জাত শব্দের ব্যবহার প্রভৃতি। এ থেকে বলা যেতে পারে কবিভাষায় বাগৈশ্বর্য বা ভাষাশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের মতানুযায়ীও শব্দার্থময় রচনার মাধ্যমে সহৃদয় শ্রোতা তথা পাঠকের মধ্যে আহ্লাদ সঞ্চার করা কাব্য লক্ষণ। যথা—"সহৃদয় হৃদয়াহ্লাদি শব্দার্থময়ত্বমেব কাব্য লক্ষণম্।"[৩] অর্থাৎ শব্দ অর্থ মিলিত হলে কাব্য হয়। "শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্।"[৪] শব্দকে হতে হবে রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক—তবেই তা কাব্য-গণ্য হবে। "রমণীয়ার্থ প্রতিপাদক ঃ শব্দ ঃ কাব্যম্।"[৫] কাব্যভাষায় শব্দার্থ শরীরস্বরূপ। "শব্দার্থৌ শরীরম্।"[৬] কিন্তু, কাব্যে শব্দ কেবল মাত্র রমণীয়ার্থ হলেই চলবে না, তাকে বিবক্ষিত তথা অভিপ্রেত অর্থের একমাত্র বাচক হতে হবে। "শব্দো বিবক্ষিতাথৈকবাচকোহ ন্যেষু সৎস্বণি।"[৭] শব্দ তাই প্রকাশ করবে কবির চিত্তগত অভিপ্রায়, যার ফলে এক এক কবির কবিভাষায় লক্ষিত হয় স্বতন্ত্র' স্বকীয়তা ও বৈচিত্র্য। কবি, বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়েও কাব্যভাষায় পরিবর্তন এবং গতানুগতিকতার বর্জন করতে পারেন নানাভাবে। যেমন, ক্রিয়াপদের স্বেচ্ছাকৃত রূপায়ণে, বা লোকায়ত তথা কথ্য ভাষা ব্যবহার করে, কিম্বা, সংলাপাত্মক নাটকীয়তা করে, অথবা বর্ণনাত্মক বিষয় উপস্থাপনার মাধ্যমে, কখনো বা কাব্যের আঙ্গিকগত পরিবর্তন করে। উপরন্তু, নির্বাচিত শব্দাবলীর বিশিষ্ট

প্রয়োগে যেমন ভাষাশিল্পের অভিব্যক্তি ঘটে, তেমনি, যুগ-উপযোগী হয়ে ওঠার বাসনাও কবিভাষার লক্ষণীয় তথা উল্লেখযোগ্য ধর্ম।

> "The poetry of alomost all ages has been written in a special language, a 'peoticdiction', which includes words, phrases, a stylised syntax, and types of figures not current in the ordinary conversation of the time."[৮]

কবিতার তথা কাব্যভাষার রীতিও তাই যুগ চাহিদানুসারে পরিবর্তিত হয়। কেননা, একই ভাষা, ছন্দ, অলংকার চিত্র বহু প্রয়োগে সৌন্দর্যহীন ও বিশেষত্বহীন হয়ে পড়ে। সেজন্য কবিকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে শব্দ ব্যবহারে তৎপর হতে হয়।

> "...যিনি স্বপ্নের বশে নেশার ভরে কবিতা লেখেন বলে শোনা যায়—তাঁকেও গণ্য করতে হয় শব্দের সংযম—"[৯]

কবিভাষায় তাই ভাষা তথা শব্দ প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শব্দ প্রয়োগ যথার্থ্যের ফলে কাব্যের রূপকার্থও (metaphor)

> "Metaphor consists in giving the thing a name that belongs to something else..."[১০]

উদঘাটিত হয়। তাছাড়া, 'প্রতিটি শব্দের একটি স্বতন্ত্র শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই সে স্বাধীনভাবে নিজের অর্থ প্রকাশ করে।[১১] এই অর্থটিও পাঠকের চিত্তে আহ্লাদ উৎপন্ন করে, নিজস্ব ভাব ও স্পন্দনে সুন্দর হয়ে ওঠে। "অর্থঃ সহৃদয়হৃদহ্লাদকারি স্বস্পন্দ সন্দরঃ।।"[১২] অন্যদিকে, কাব্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দের উচ্চারণগত বিশিষ্টতা মারফৎ সৃষ্টি হয় ধ্বনিতরঙ্গ যা কিনা শব্দার্থেরই বাহন। শুধু তাই নয়, 'প্রত্যেকটি শব্দ তাহার ধ্বনির পক্ষে বহন করিয়া আনে অনেকখানি ইতিহাস...একটা বিশেষ যুগের একটা বিশেষ সমাজ জীবনের বিবর্তন'।[১৩] তাই কাব্য তথা কাব্যভাষায় কবি-প্রযোজিত ও ব্যবহৃত শব্দাবলীর মধ্যে মানসিক আবেগ-কল্পনাসহ ফুটে ওঠে যুগের সামাজিক চিত্র ও লোকায়ত পটভূমিকা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট —

> "Poetry...takes its words and arranges them in such a way that the affects are roused and forced to take up a new organisation towards reality, a new emotional attitude."[১৪]

কবিভাষার শরীরী অবয়ব নির্মাণে শব্দ বা ভাষার মতো শব্দধ্বনিরও বিশেষ মূল্য আছে। শব্দধ্বনি এবং তজ্জনিত স্পন্দন থেকেই কবিভাষায় তথা কাব্যদেহে আসে ছন্দোপ্রবাহ। উচ্চারিত ধ্বনির নিয়মানুসারী গতি ও যতির বা চলা ও থামার পুনরাবর্তনে জাগে ছন্দোস্পন্দ। আর 'ছন্দ হলো ছন্দোস্পন্দের বিশিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত রূপ'।[১৫] কবিভাষায় ছন্দের উপরোক্ত বহিরঙ্গ উপজীব্যতার অন্তরালে থাকে কবির বিশেষ মানসিকতা—'ছন্দ গ্রহণেরও একটা প্রধান কাজ কবিতার অন্তর্গত সমস্ত শব্দের টুকরোগুলির এবং তাহার সহিত সকল অর্থগুলিকে একটা গভীর ঐক্যের ভিতরে বাঁধিয়া একটি অখণ্ড রসানুভূতির দিকে আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করা'।[১৬] অর্থাৎ কাব্যের 'ভাব যেমন ভাষা ও ছন্দ ঠিক তেমন হওয়া চাই'।[১৭] ভাবের যথার্থ প্রকাশ

ঘটাতেই কবিভাষা ছন্দ আশ্রয়ে হয়ে ওঠে সঙ্গীতধর্মী ও চিত্রধর্মী —

> "ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সঙ্গীত।"[১৮]

'কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না, ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়'।[১৯] সেই ছবির সৃজন হয় কাব্যালংকারের প্রয়োগ চাতুর্যে। কবিভাষায় তাই অলংকারও বিশেষ স্থান গ্রহণ করে আছে। যদিও সংস্কৃত কাব্যের অলংকার বিচারে মুখ্য অবলম্বন ধ্বনিস্পন্দন ও শব্দনির্মিতি, কিন্তু, কবিভাষায় ধ্বনিবাহিত শব্দালংকার বহিরঙ্গ রূপ ও গতিশীলতা সৃষ্টিতে এবং উপমা-রূপকাদি অর্থবাহিত ভাব অলংকার ব্যবহারে তার আভ্যন্তর অর্থ-শক্তির বৃদ্ধিকরণ হয়। বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমায় অলংকৃত কবিভাষা পাঠকের শ্রবণ, বোধ, ধারণা ও চিন্তাশক্তি প্রভৃতি দ্বারা তার বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় উদ্‌বোধিত করে। কাব্যভাষার ধ্বনিগত সুর মূর্চ্ছনা ও অর্থগত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি অলংকারের মূল উদ্দেশ্য। তবে, 'অলংকারের চমৎকারিত্বের মধ্যে কবির কী মানসিকতা কাজ করে তা বুঝতে না পারলে চমৎকারিত্বের উপভোগও সীমাবদ্ধ হয়ে যায়'।[২০] যদিও স্বীকার্য যে, রূপকাদি অলংকারের মূল কাজ হলো সাদৃশ্য বিধানে কাব্যের অর্থবৈচিত্র্য সৃষ্টি করা, এবং 'অলংকার যেমন তাৎক্ষণিক তেমনি বাচনিক'।[২১]

কবিভাষার উপাদান চিত্রকল্প যদিও প্রায়শই অলংকার বাহিত, তার মাধ্যমে কবির বক্তব্যের উদ্‌ভাসন ঘটে। ভাবের বাঙময় ছবিই চিত্রকল্পের মূল উৎস। উপমা–রূপক উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অর্থালংকারও প্রত্যক্ষভাবে তাই চিত্রকল্পধর্মী।

> "..Imagery is used to signify figurative language, especially the vehicles of metaphors and similes."[২২]

কাব্যে ক্ষণকালীন চিত্র এবং কাব্যাত্মাগত চিত্রকল্প দুইই লক্ষিত হয়। শব্দের উপযুক্ত গ্রন্থন হেতু পাঠক সম্মুখে সৃষ্ট ছবিই চিত্র, চিত্রকল্প হলো কবিভাষার ব্যঞ্জনাধর্মী ছবি—যার সাহায্যে কবিতার সমগ্র ভাবটি স্পষ্ট হয়। কবিতার দৃশ্যগ্রাহ্য চিত্ররূপকে অতিক্রম করে আরও গভীর অর্থের ব্যঞ্জনা আনে কবিভাষার বাক্‌প্রতিমা বা চিত্রকল্প। চিত্রকল্প তাই উপলব্ধ ও অনুভবগম্য—

> "The image writes a modern French poet, Paul Reverdy, is a pure creation of the mind."[২৩]

কাব্যের চিত্রকল্প ও নব নব কল্পনায় স্বসৃষ্ট শিল্পরূপের মাধ্যমে পাঠকের ইন্দ্রিয়ানুভূতি চমকিত করে এবং কাব্যভাষায় নতুনত্ব সঞ্চার করে —

> "What the moderns look for in imagery, I suggest is freshness, intensity, and evocative power. Freshness, the potentiality of an image through the novelty of its action, its material, or both, to reveal some thing we had not realised before..."[২৪]

তবে চিত্রকল্পও একক অবয়বে বিচার্য নয়। কবিতার ভাব, আবহ, রসানুভূতির সমগ্রতায়

তার স্থাপনা সুসমঞ্জস্য এবং যথার্থ কিনা—আলোচনা প্রয়োজন। চিত্রশিল্পের মধ্যে দিয়েও কাব্য ভাষা তথা কবির মানস পরিচয় ইঙ্গিত হয়—

> "The artistic image is a beautiful form of integrated knowledge of life."[২৫]

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিল্পতত্ত্বালোচনা সাপেক্ষে জানা যায় যে, কাব্য তথা কবিভাষার শরীরী ও মানসী প্রতিমা রচনায় তাই ভাষা বা শব্দনির্মিতি এবং শব্দবাহিত ধ্বনি ও তার স্পন্দন ও আবর্তন জাত ছন্দোবৈচিত্র্য এবং শব্দার্থ ও তার প্রয়োগ কৌশল সৃষ্ট অলংকার এবং শব্দসজ্জা ও বাকবৈদগ্ধগত প্রতিমান বা চিত্রকল্প বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলার বৈষ্ণব সমাজে আদৃত হয়। মধ্যযুগের ব্রজবুলি ও

> "...the Vaisnava aesthetics and an ethics behind which could never allowed the poet to develop in his own ways."[২৬]

সেই কবিভাষা একদিকে অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ লীলাকে অবলম্বন করে এবং অন্যদিকে 'নবদ্বীপ চন্দ্র', প্রাকৃত চৈতন্যদেবকে উপজীব্য করে। কারণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে গৌরাঙ্গ তথা চৈতন্যদেব হচ্ছেন বহিরঙ্গে রাধা ও অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ। অর্থাৎ রাধা কৃষ্ণের সমন্বিত অবতারস্বরূপ। চৈতন্যবাদী-দার্শনিকতা তথা অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব এবং ভক্তিধর্ম বা রাগাত্মিকা ও রাগানুগা—

"প্রেমের দ্বারা বা অনুরাগের দ্বারা ঈশ্বর আরাধনার নাম রাগানুগা ভক্তি। ...রাগাত্মিকা ভক্তির অর্থ—যাহাতে চিত্তের অনুরাগ ব্যতীত আর কিছুই নাই। ভগবানের পরিকরের বা শক্তির অনুরাগ মূলক ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। জীব যখন সেই আদর্শ অনুসরণ করে তখন সেই ভক্তির নাম হয় রাগানুগা ভক্তি। অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি বল্লবী-যুবতীদের অনুরাগ রাগাত্মিকা ভক্তি, এবং মর্তের বৈষ্ণব ভক্তদের কৃষ্ণানুরাগ রাগানুগা ভক্তি।"[২৭]

ভক্তির প্রকাশ তাই উত্তর চৈতন্য মহাজন পদকর্তাদের কাব্যে আদর্শ রূপে বিরাজ করেছে। চৈতন্য কর্তৃক সমর্থিত রাধাকৃষ্ণ প্রেম-লীলার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম মধুর রস। সেই রসোপলব্ধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর পরম্পরাও বিশ্লেষিত ও অনুসৃত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীতে। বৈষ্ণব পদাবলীর কবিভাষাও উপরোক্ত তত্ত্ব-প্রকাশক হয়ে কবিদের ব্যক্তিত্বকে ধর্মীয় গণ্ডীতে আচ্ছন্ন করেছে। এই ধরণের ধর্মদর্শন ভাবিত কবিতা তাই কাব্য হিসেবে সীমাবদ্ধ—

> "This poetry moves within the boundaries of wishfulfilment. Its creators have too little spontanity in their life to be greatly conscious of necessity."[২৮]

তবে চৈতন্য-পূর্ব রাধাকৃষ্ণ লীলার পদে গৌড়ীয় তত্ত্ব অনুপস্থিত। সেখানে রাধাকৃষ্ণ মানবিক-দৃষ্টি ও-সাযুজ্য লাভ করেছে। কিন্তু নায়ক-নায়িকা যেখানে দেবতার নামে ও কায়ায় উপস্থিত, তার মাধুর্য ও মর্যাদা নিমিত্ত কাব্যভাষাও হয়েছে কৃত্রিম ব্রজবুলি, যা পরবর্তীকালে বৃহত্তর বাংলা ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর কবিভাষ সীমবদ্ধতা সত্ত্বেও আপন স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল। আর পদাবলী গান শুধু বৈষ্ণবের জন্য রচিত হয়েও বৃহত্তর সমাজে গৃহীত হয়েছে।

"...বৃন্দাবন লীলা বা রাধাকৃষ্ণের লীলা বিশ্বজীবন ও বিশ্বভুবনের লীলা"[২৯] রূপে সাহিত্যে পরিগণিত।

বৈষ্ণব কাব্যের কবিভাষার বা poetic diction-এর বৈচিত্র্য ও বর্ণাঢ্যতা কিভাবে ভাষা-ছন্দ-অলংকার-চিত্রকল্প আশ্রয়ে চৈতন্য-পূর্ব বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ পদকর্তা ও চৈতন্য-সমসাময়িক ও-পরবর্তী জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, বাসু ঘোষ, জগদানন্দ, শশিশেখর, লোচনদাস প্রমুখ কবিদের কবি-ব্যক্তিতে বা poetic personality-তে পরিস্ফুট হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থসূত্র

১. The first person to use the term 'poetic diction' is apparently Dennis (John), in his—'Advancement and Reformation of Modern poetry,' (1701) Chap-V.
২. Aristotle : Concerning the Art of poetry,—(1962), P-70 Transslated by Ingram Bywater
৩. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় অনুদিত ঃ আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক (১ম খণ্ড, ১৯৭২) পৃ.১৩।
৪. সুধীর কুমার দাশগুপ্ত ঃ কাব্যালোক, গৃহীত (ভামহ : কাব্যালংকার ১।১৬ (১৩৭৯) পৃ.৩৫২।
৫. সুধীর কুমার দাশগুপ্ত ঃ কাব্যালোক, গৃহীত (ভামহ : কাব্যালংকার ১।১৬ (১৩৭৯) পৃ.১১। জগন্নাথ ঃ রসগঙ্গাধর ১।১ বৃত্তি
৬. সুধীর কুমার দাশগুপ্ত পৃ.৩৫৬। ঃ কাব্যালোক, গৃহীত (ভামহ : কাব্যালংকার ১।১৬ (১৩৭৯) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সাহিত্যদর্শন ১।২ অধ্যায়
৭. সুধীর কুমার দাশগুপ্ত পৃ.৩৬০। ঃ কাব্যালোক, গৃহীত (ভামহ : কাব্যালংকার ১।১৬ (১৩৭৯) কুন্তক ঃ বক্রোক্তি জীবিত ১।৯ বৃত্তি
৮. M. H. Abrams : Concerning the Art of Poetry, 1962, P. 71-72. Translated by Ingram Bywater.
৯. শঙ্খ ঘোষ ঃ নিঃশব্দের তর্জনী (১৩৭৮) পৃ.১০।
১০. Aristotle : A Glossary of Literary Terms, 3rd Edn., 1970,P.131.
১১. ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত ঃ শিল্পলিপি (১৩৫৮) ১ম সং., পৃ.২।
১২. কুন্তক ঃ বক্রোক্তি জীবিত, ১।৯ বৃত্তি।
১৩. ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত ঃ শিল্পলিপি, (১৩৮২) ৩য় সং., পৃ. ৩।
১৪. Christopher Caudwell. : Illusion and Reality, 1966, Ch.X, P. 229.
১৫. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার ঃ সাহিত্যের রূপ-রীতি, (১৯৮৫) ১ম অধ্যায়, পৃ. ৯৭।
১৬. ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত ঃ শিল্পলিপি, ১ম সং., ১৩৫৮, পৃ. ১৫-১৬।
১৭. মোহিতলাল মজুমদার ঃ সাহিত্য বিচার, (১৩৭৩), পৃ. ২০০।
১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সাহিত্য, সাহিত্যের তাৎপর্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃ.৭৩৮।
১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সাহিত্য, সাহিত্যের তাৎপর্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৭৩৮।

২০. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার ঃ সাহিত্যের রূপ-রীতি, (১৯৮৫), ১ম অধ্যায়, পৃ. ৯০।
২১. ড. কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প, ১ম সং., ১৩৮২, পৃ. ৬।
২২. M. H. Abrams. : A glossary of Literary Terms, 3rd Edn., 1970, P.77.
২৩. Herbert Read : Collected Essays in Literary Criticism, 2nd Edn., Reprinted, 1950, P. 98/99.
২৪. C. Day Lewis. : The poetic Image, Reprinted, 1968, Ch-II, P. 40.
২৫. I. Smolianov. : Problems of Contemporary Aesthetics, 1984,The Artistic Image Translated by A. Muller : A category of True Art, P. 206.
২৬. Aloke Ranjan Dasgupta. : The Lyric in Indian poetry, 1962, Chap-IV. P.98.
২৭. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, ১৯৬২, পৃ. ২৭৮।
২৮. Christopher Caudwell. : Illusion and Reality, 1966, Chap-II, P. 33.
২৯. ড. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ঃ পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র ভারতী, (১৩৮৪) ২য় সং., পৃ. ১৩৬।

বিদ্যাপতির কাব্যভাষা

প্রাক্ চৈতন্য রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনার ক্ষেত্রে মিথিলার রাজসভার শৈব উপাসক কবি বিদ্যাপতির নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই কবি সম্ভবত খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের শেষদিক থেকে ১৫শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। এবং মিথিলার রাজসভার এই বিদগ্ধ কবি বহু রাজনৈতিক উত্থান পতনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এ সমস্ত বিশৃংখলার মধ্যেও তাঁর কাব্য লেখনী অব্যাহত ছিল। মিথিলার অধিবাসী হলেও এবং মাতৃভাষা মৈথিলিতে অন্যান্য বহু গ্রন্থ রচনা করলেও বিদ্যাপতি মধ্যযুগের বাংলা কাব্য সাহিত্যে এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর রচিত প্রায় সহস্র সংখ্যক বৈষ্ণব পদাবলীর জন্য স্থায়ী আসন পেয়েছেন।

বস্তুত বৈষ্ণব পদ রচনার ক্ষেত্রে তিনি মাতৃভাষা মৈথিলিকে অবিমিশ্রভাবে গ্রহণ করেননি। তাঁর বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা আসলে মৈথিলি—বাংলা ভাষা উদ্ভূত একটি কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ভাষাবন্ধ। এই নবোদ্ভূত ভাষাটি 'ব্রজবুলি' নামে পরিচিত। ড. জয়কান্ত মিশ্র বিদ্যাপতির এই ভাষার উৎস সম্পর্কে বলেছেন—

"To the east, in purnea, it becomes more and more infected with Bengali, till, in the east of that District it is superseded by the Siripuria dialect of that language which is a border form of speech, Bengali in the main, but containing expressions borrowed form Maithili and written not in the Bengali character..."[১]

অর্থাৎ বিদ্যাপতির ভাষা বাংলা প্রভাবিত, তবে, প্রকাশভঙ্গি ও বৈশিষ্ট্য মৈথিলি ভাষার মতো। গ্রিয়ারসন সাহেব এই ভাষার উৎস হিসেবে পশ্চিমা মগহি (মাগধী) ও অংশতঃ বাংলা প্রভাবিত মৈথিলি ভাষাকে মনে করেছেন এবং এর ভৌগোলিক বলয় নির্দেশ করেছেন —

"South of the Ganges, Maithili is influenced more or less by the Magahi spoken to the west and partly also by Bengali."[২]

ভাষাচার্য ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই ভাষার শব্দাবলী ও স্বরূপ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"...mixed Maithili and Bengali with a few western Hindi forms, which was widely used in Bengal in composing poems on Radha and Kfisna. This mixed dialect came to be called ব্রজবুলী <Braja-buli> or speech of Vraja..."[৩]

তাঁর মতে মৈথিলি, বাংলা ও পশ্চিমা হিন্দী ভাষার মিশ্রণ জাত, এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনার বাহন হিসেবেই 'ব্রজবুলী' উপভাষার সৃষ্টি। ড. সুকুমার সেনও এই ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"ব্রজবুলি বাঙ্গালার একটি উপভাষা। ব্রজবুলি মূলত মৈথিলি ভাষা হইতে উদ্ভূত

হইলেও, ইহা বঙ্গদেশে, বাঙ্গালী কবির হস্তে এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আশ্রয়ে ও রসসঞ্চারে পুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহাকে বাঙ্গালার উপভাষা বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। "এবং"...ভাঙা মৈথিলই ব্রজবুলির আদিম রূপ"।[৪]

বিদ্যাপতি সৃষ্ট এই কৃত্রিম ভাষাঙ্গিক পরবর্তীকালে বৃহত্তর বাংলায়, বিশেষত বৈষ্ণব সমাজে, ব্যাপকভাবে আদৃত হয় এবং বাংলাদেশে স্বীকৃতি ও বিস্তৃতি লাভ করে ক্রমশ। তবে, চৈতন্য-পরবর্তী কালে বৈষ্ণব পদাবলীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে, বিষয় বস্তুতে রাধাকৃষ্ণ লীলার তত্ত্ব-নিরপেক্ষ লোক জীবনের মানবীয় প্রেম কথাই মুখ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বিদ্যাপতি অনুসৃত রাধাকৃষ্ণ লীলা কাহিনীর উৎসভূমি সম্ভবত লোকায়ত সমাজে কথিত ও প্রচলিত "রাখালিয়া নাটগীতি"[৫] এবং অংশত জয়দেবের "গীতগোবিন্দে"[৬] গ্রন্থ। তা ছাড়া, গীতগোবিন্দে জয়দেব যেমন স্বরান্ত শব্দের ব্যাপক প্রভাবে, ধ্বনিঝঙ্কার সৃষ্টি করে, ভাষায় মাধুর্যগুণ এনে তাঁর "মধুর কোমলকান্ত পদাবলী" প্রবর্তন করেছেন, বিদ্যাপতির ব্রজবুলিও তেমনি নতুন সৃষ্টি-সমন্বিত ভাষা। বস্তুত এই ভাষা না খাঁটি মৈথিলি, না খাঁটি বাংলা বা পশ্চিমা অপভ্রংশ হিন্দী। তবে নিঃসন্দেহে এটি কৃত্রিম নিজ সৃষ্ট সাহিত্যিক ভাষা। ব্রজবুলি ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ এর অপূর্ব ধ্বনি মাধুর্য। কবিভাষায় কোমলতা ও পেলবতা, ছন্দ-লালিত্য প্রভৃতি সম্পাদনে এর যুগপৎ ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রয়োগ ও শব্দরূপের ব্যবহারও স্মরণীয়। প্রথমে ধ্বনিতত্ত্বের বিবিধ প্রয়োগের আলোচনা করা হোল।

যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট শব্দকে উচ্চারণের সুবিধা কল্পে ভেঙে দিয়ে তার মাঝে স্বরধ্বনির প্রবেশ ঘটিয়ে অর্থাৎ স্বরভক্তির সাহায্যে বিদ্যাপতি তাঁর রচিত পদে একদিকে শ্রুতিমধুরতা অন্যদিকে ছন্দোমাত্রায় সমতা রক্ষা করেছেন। যুক্তাবস্থায় এবং স্বরভক্তির প্রয়োগে কলামাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি না ঘটিয়ে শুধুমাত্র যে সমস্ত শব্দ মূলত শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়েছে তার কতকগুলি উল্লেখ করা হোল—ভসমে (৩৬ সংখ্যক পদ)[৭], দুরবল (৪৪), ধরম (৪৫), ধৈরজ (৫৫), মনমথ (৫৫), পরণে (৭৩), অরতিখ, পরতহ (১৫০), পুরুব (১৫৩), পরতিকি (১৫৭), অগোআনে (৩৮৩), নিরমল (৪৭৩), নিরদয় (৮০৮), উনমুখে (৮২২), মুরুছি (৮৮৫), নিরমান (৯২১) প্রভৃতি।

স্বরভক্তি বিশিষ্ট বহু শব্দ আছে যারা প্রত্যক্ষভাবে ছন্দোকলা মাত্রায় হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শব্দগুলি হোল—পরমাণ (২৭) এখানে মূল শব্দ 'প্রমাণ' তিন কলা মাত্রার, 'পরমাণ' চার কলামাত্রার শব্দ। তাছাড়া—পরচারি (৩৭), পরকার (৪০), উনমত (৪৪), পরবাস (৪৬), তরাসে (৫২), সিনেহ (ঐ), ভরাম (৫৫), সিরীফল (৬৬), পরকিত (৭৮), পরতখ (৭৯), পরহার (১৫৭), পরতাতি (১৬৪), বেয়াধি (১৮৭), গরাম (২৭১), পরবন্ধ (৪৬৮), পরসংসতা (৩৯৬), উকহিহু (৫৮৩), পরাপতি (৫৪১), হিরদয় (৬১৭), তিরপতি (৭১৪), বিসরল (৭৫২) ইত্যাদি। দেখা যায় যে, স্বরধ্বনির অনুপ্রবেশ কাব্যে ধ্বনিকোমলতারও সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যাপতির এই ধরনের কবি-প্রয়াস অভিনবত্ব দাবী করে।

স্বরসঙ্গতির সাহায্যে বাক্য মধ্যে বহু স্থলেই ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি করেছেন কবি। এর দৃষ্টান্ত গুলির মধ্যে—খেনে (৪৪), সুনু (৬৪), লুটু (৬৮), সিরিসি (৭৩), কুপুত (ঐ), পুনু (৪৮১),

মিলল (৭১৩), চলব (৭৫৩) প্রভৃতি। একই সঙ্গে স্বরসঙ্গতি ও স্বরভক্তির পারস্পরিক সহায়তায় সৃষ্ট শব্দগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল--গুপুত (২,৩), লুবুধল (৩৮), উলটন (৯৭), সুকুতি (৬৪), পুরুব (১৫৩), মুগুধলি (৪৭৩), মুরুখ (৪০৮), মুরুছি (৮৮৫) ইত্যাদি শব্দসমূহ।

বহুস্থানে যুক্তবর্ণের একটি লোপ করে ছন্দের মাত্রা সমতা রক্ষার প্রয়াস লক্ষিত হয়। শব্দ সংযোজনায় পেলবতা সৃষ্টিও হয়েছে একই সঙ্গে। যেমন--কটাখ (৩৭), এখানে মূল শব্দ 'কটাক্ষ'র একটি বর্ণ লুপ্ত হয়েছে, ফলে, ছন্দোমাত্রায় হ্রাস ঘটেছে। এছাড়া আছে--অথির (৬০), নিসাস (৬১), লজায় (৬২), গুণে (৬৯), পচবাণ (৭৯), নিঠুর (১৫৫), দখিণ (১৫৭) , বিপতি (১৬৫), অহনিসি (৪৩১), পরিছেদ (৫৮৪), উৎপতি (৬১৩), উতগত (৭৪২), সরবস (৭০৪) প্রভৃতি। এছাড়া কিছু শব্দের ধ্বনিলোপ পেলেও মাত্রার হেরফের ঘটেনি। যথা--পেম (৫৫), ভমর (৫৭), প্রীতম (৫৭), শহর (৬৪) সেদ (৬০) খিন (৫৪৫), পিঅ (৮০৮) প্রভৃতি।

ব্রজবুলি ভাষাবাহিত শব্দে বহু জায়গায় স্বরবর্ণের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটিয়েছেন কবি। বিশেষ করে পদান্ত মিল বা পংক্তি প্রান্তিক মিলই এর উদ্দেশ্য। যেমন--চকোরা-মোরা (১৯৯), দুজনা-তরুণা (২০৭), জলধারা-মোতির হারা (৬২৬) পেল-নিল (৭৩৩), চৌপাসা-নাসা, রেহা-দেহা (৭৩৭), তাছাড়া অন্যান্য শব্দগুলির মধ্যে আছে—বলয়া (৩৪), সমধান (৪৭১), গঙ্গ (৬০১), অকাস (৬২০) হসিয়া (৭৫৩) প্রভৃতি। এখানে 'অ' এবং 'আ' বর্ণের উলটোপালটা ব্যবহার লক্ষণীয়।

'ই' এবং 'ঈ' কারের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার লক্ষিত হয়। যথা—মতিহীনী-চিহ্নী (১৫৭), মুগোধি-চোরি (৩৪০), অঞানি-হানি (৩৫৪), অহি-নিরবাহি (৪৪১), অবিচারি-কপালি (৫৫৫), গমনী-রমনী (৫৭৭), পরচারী-গারী (৬১৬), মধাঈ-লুবুধাঈ (৭৫১) ইত্যাদি।

এছাড়া, জাগু, ভাগু (৩৪), বরু (বর) (৮৫,১২৭,৪৪০), বিনু (বিনা) (৪৪০), পুস (পৌষ) (১৭৪), জুআর (জোয়ার) (৫০০) প্রভৃতি স্থলে 'উ' কাব্যের ব্যবহার কবি ছন্দামিলের প্রয়োজন মতো করেছেন।

'এ' কারের ক্ষেত্রেও স্বাধীন ব্যবহার লক্ষিত হয় অনেক জায়গায়। যথা---ভঙ্গ সুরে - নেপুরে, কালে--ঝাঁ ঝাঁ কাঁরে, গাছে-পচাসে, কবারে-কুমারে (২০৪), (২০৪), সাধে-অপরাধে (২৪৪), উদাসে-আসোয়াসে (৬৭৭) প্রভৃতি।

'ঐ', 'ও', 'ঔ' প্রভৃতি বর্ণেরও যথেচ্ছ ব্যবহার বিদ্যাপতির পদাবলীতে লক্ষ্য করা যায়। যথা--তৈলোক (ত্রিলোক) (৬০৯), থোএ (থুয়ে) (২২৯), দহও (দশ) (১৩৪), ধোই (ধুয়ে) (১১৫), পোরি (পুর) (৩৭১), বৌরি (বৈরি) (৭৪২) প্রভৃতি 'স্বরবর্ণের এই ধরণের স্বেচ্ছা-ব্যবহার করেছেন কবি এবং প্রয়োজনমতো ছন্দোসমতা রক্ষার কাজে লাগিয়েছেন।

ব্যঞ্জন বর্ণের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অনেক স্থানে বর্ণান্তর লক্ষিত হয়। 'ষ' এর উচ্চারণ অনেক সময় 'খ' এর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। যেমন--বিখাদ (বিষাদ) (১৪৮), অখায় (আষায়) (১৭৪), দোখে (দোষে) (১৯২,৩৯৭,৪১৭), বিসেখ (বিশেষ) (২৭৮), অবিসেখে (অবশেষে) (২৮৭), বীখ (বিষ) (২৬৬) প্রভৃতি। তবে মৈথিলিতে এই ধরণের পরিবর্তন স্বীকৃত।

বস্তুত 'শ', 'ষ', 'স'—এই শিষধ্বনিগুলি যথেচ্ছভাবে শব্দে স্থানগ্রহণ বা বা বদল করেছে ব্রজবুলিতে। অর্থাৎ, তিন 'স' ধ্বনি আসলে একটি। 'স'-এ পরিণত। যেমন—দরস (২৪), বিস (৫৩), রুসলি (রোষ) (১৩০), সীতল (১৪৮), উপদেস, বিদেস (১৫৭), পুরুস (১৮২), সিত (১৬১) সাসু (শাশুড়ী) (৭০, ৩৬৫) সসিমুখী (২২৩), দসন (২৯৩), সর (৩৮০, ৫৪০), বীসব (বিষম) (৩৬১), দসমি দশা (৫২২) ইত্যাদি।

বিদ্যাপতির পদাবলীতে বর্গীয় 'জ' ছাড়া অন্তঃস্থ 'য' এরও ভিন্ন উচ্চারণ স্বীকৃত হয়নি। যথা—জতনে, ধৈরজ (২৭৩) পরিজুগুতি (৩১৩), জৌবন (৩১৫), জনু (যেন) (৩১৫), জুবতি (৫৮০) ইত্যাদি।

মূর্ধন্য 'ণ' এর অস্তিত্বও দন্ত 'ন' এর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। যথা—দারুন, নিবরুন (১০৮), রমন (২৮৯), পরিণত (৩১৯), বানে (৪৮০), হরিনী (৫১৭খ), মরন (৬৫৪), পরান (৬৬৬), গুন (৮৩২) ইত্যাদি। তবে যুক্ত বর্ণে 'ণ' এর ব্যবহারই লক্ষিত হয়। যেমন—ঘান্টু (১২৪), কণ্ঠহার (৪৭৭), কুণ্ডল ৪৭৮) প্রভৃতি।

বিদ্যাপতির পদে 'ল' বর্ণের স্থানে 'র' বর্ণের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—আঁচর (ল) (৮৩৫), কাজর (৩৭২), সিমর (শিমুল) (১১৭) সামরা (শ্যামল) (২০) প্রভৃতি শব্দাবলী।

বর্গীয় 'জ' এবং 'র'-এর স্থলে অন্তস্থঃ 'য়' এবং 'জ' বর্ণের ব্যবহার দেখা যায় অনেক পদে। যথা—'রজনী'র স্থলে রয়নি (১০৪), বা রঅনি (১০৩), 'করল'র স্থলে 'কয়ল' (৬৪২) , 'ভুজঙ্গম' এর স্থলে ভুয়ঙ্গম (৩২২) ইত্যাদি বহু শব্দ এভাবে প্রযুক্ত হয়েছে।

বিদ্যাপতির ব্রজবুলী পদে আনুনাসিক বর্ণেরও ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষণীয়। তাঁর কাব্যভাষায় 'ছন্দের অনুরোধে কখনও কখনও সংযুক্ত 'ন' (ক্বচিৎ 'ঙ' এবং 'ঞ') লুপ্ত হয় এবং পূর্ববর্তী স্বরবর্ণকে আনুনাসিক করিয়া দেয়"।[৮] আনুনাসিক হয় ("চন্দ্রবিন্দু") সহযোগে। যথা—কাঁতি (কান্তি) (৫৩), সাঁঝহি (সন্ধ্যা) (১৫৮), সাঁচি (সঞ্চয়) (২৫৪), পাঁতি (পংক্তি) (৩১৬), ভাঁগল (ভাঙ্গিল) (৬৫৯) প্রভৃতি প্রকারের শব্দ। লক্ষণীয় যে, এইরকম পরিবর্তনে ছন্দ মাত্রারও পরিবর্তন ঘটেছে প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই।

কোন কোন পদে আবার সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে সংযুক্ত 'ন' এর আনুনাসিক রূপটি অপসারিত, লুপ্ত হয়েছে। এবং ছন্দমাত্রা সমতা রক্ষা করেছে এইভাবে। যথা—'কর কিসলয় সয়ন রচিত গগন মডল (মণ্ডল) পেখী' (২৪৬), 'সাহর মজর (মঞ্জুরিত) ভমন গুজর (গুঞ্জন) কোকিল পঞ্চম গাব' (১৮৮) ইত্যাদি।

অনেক সময় 'ম' বর্ণের স্থলে 'ঞ' এই আনুনাসিক বর্ণের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—নাঞেঞা (নাম) (৪২), তঞে (তুমি) (৫৫,৩১১), জঞেঞা (লমন) (২৪৬), মঞে (আমি) (২৪৭, ৩১৭, ৪৭৭), জঞুন (যমুনা) (৩৩১) ইত্যাদি।

দন্তম' এর স্থলেও 'ঞ' বর্ণের ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমন—জঞেঞা...তঞেঞা (যখন...তখন) (৭১), জঞেঞা (যেন) (৩২৯), কাঞি (কেন) (৪১০), জানিঞ (জানিও) (৪১০), নিবেদঞেঞা (নিবেদন) (৫১৮) ইত্যাদি।

বহু স্থলে 'ঙ, ঞ, ন, ম, এবং ং' প্রভৃতি নাসিকা বর্ণধ্বনি স্থলে '(চন্দ্রবিন্দু)-র ব্যবহার কবি করেছেন তাঁর পদে। ছন্দের মাত্রা সমতা রক্ষায়ও এই পরিবর্তন কাজে লেগেছে। যথা—সাঁকরি (সঙ্কীর্ণ) (৭০), গুঁজা (গুঞ্জন) (১১৩) খেঁওব (ক্ষমা) (১৮৩), ভঁগবইতে (ভাঙ্গিতে)

(২০৪), নিঞাঞেঞা (নিঙড়াইয়া) (২৫০) আঁকুস (আঙকুশ) (২৫২), চঁদনকের (চন্দনের) (২০৪), আঁগ (আগুন) (২৭০), ভঁাার (ভাণ্ডার) (৩১৩), লাঁঘল (লঙঘন) (৩১০), বিলঁব (বিলম্ব) (৩১৪), জওঁ (জন্ম) (৪৪৭), সঁসারক (সংসারের) (১০০), আঁগন (অঙ্গন) (২০৪) , ঝঁঝকারে (ঝঙ্কারে) (ঐ), সঁকেতা (সংকেত) (৩৬৫) ইত্যাদি। এই দৃষ্টান্ত গুলিতে দেখা যায় প্রায় সর্বত্রই কলামাত্রার হ্রাস হয়েছে (চন্দ্রবিন্দু) যোগের ফলে শব্দ সংক্ষেপ হেতু।

বিদ্যাপতি সৃষ্ট ও ব্যবহৃত ব্রজবুলিতে ধ্বনিরূপের মতো শব্দরূপেও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। তবে প্রায়শই শব্দরূপের পরিবর্তন গুলিতে লক্ষ রাখা হয় যাতে ভাষার শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি পায়। প্রথমে ক্রিয়াপদের বিভিন্ন কালের ব্যবহৃত রূপ উল্লেখ করা যায়।

ক্রিয়ার বর্তমান কালের উত্তম পুরুষে 'ই, উ, এ, ও' প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে দেখা যায়। যেমন--চরই (২০), জানথি (২২), ঝুঝাউলিসি (৪৫) আউ (১৯) পুজু (২০), সঞ্চরু (৩৭), জাগু (৫৬৫), পঞ্চএ (৩৮), কএ, লএ, দএ (৪২) চাএঞা (৪২) প্রভৃতি। অতীত কালের উত্তম পুরুষে 'ল, লি, লুঁ, হঁ, হু, হুঁ', উ' ইত্যাদি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। যথা---দেখল (৫) ভাঙ্গল (৬), বারল (২৫), দেখলি (২৫), পাওলি (৩৬) বুঝলি (৩৫৫), পেখলুঁ (৬২৭), আয়লুঁ (৭৪৪), জানলুঁ, সাধায়লুঁ, বুঝলুঁ, তপায়লুঁ, (৭১৬), জইতঁহ (১৫৮), চড়লিহু (৪৯), রহলিহু (৩৪), জনিতহুঁ, ফসিতহুঁ, হেরিতহুঁ, হাসিতহুঁ, সহিতহুঁ, রহিতহুঁ, সজিতহুঁ, বহিতহুঁ, গুণিতহুঁ, পবিতহুঁ, পরিহরিতহুঁ, ঝাঁপু (৩১), দেখু (৩৫), পেখনু (৬২১), চলু (৯৯), ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ কালের উত্তম পুরুষে 'আ, ব' প্রভৃতি প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখি। যথা--পরকারা (৩২), গাথব (৪), কহব (২৫), বুঝা এব (৩৫২), ধরব, ফরব (৪২৫), গমাওব (৫১৭খ), বিলসব (৭১৩), রাখব (৭২৮) , গোঙায়ব (৭২৯) ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষের বর্তমান কালে 'অ, উ, সি' প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা--নিরবাহ (৭), দেখি তা (২৭), নকবি তা, নহোইতা (৪৯), নিরেখহ (৩৪০), বোলিতা (৪০৬), মিলহ (৬৫৬), পরাউ (১৯) ঝুঙসি (৩), বোলসি (ঐ), দেখলিসি (১৮), পঠাবসি (৪৫), কহসি (৬৫৬) ইত্যাদি। অতীত কালের মধ্যম পুরুষে সাধারণত ব্যবহৃত হয় 'লি (ই), হু' প্রভৃতি প্রত্যয়। যথা--ছোড়লি (৭১৭), ফেরি (৭০১), সোপিলহু (৪৬) ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ কালের মধ্যম পুরুষে ব্যবহৃত হয় 'ব, বি (ই)' প্রভৃতি প্রত্যয়। যেমন--করব (২৮৯), বোলতি (৪১), চোরি (৪৮), জাউবি (২৮৯), মানবি (৬৩০) প্রভৃতি।

ক্রিয়ার বর্তমান কালের প্রথম পুরুষে ব্যবহৃত হয়। 'তা, এ' প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দ। যেমন--বাঁধহ (২), দেখি তা (৪), বাঢ় (৭), চল (১৯), গাব এ, জান এ (১৮), নিহার এ, পাএ, উলটা এ, নুকা এ (২৮) প্রভৃতি। অতীত কালের প্রথম পুরুষে 'ল, এল, লা, উ, থি' প্রভৃতি। যথা--পাওল (৫), সুখাএল (৬), কয়ল (১৯), বইসল (২০), নারল (ওই), ছাড়ল, বাঁধল (১৮), নিরমিল (২২), সোঁপল (ওই), উগল (২৩), মিঝাএল (৪১), উলটল, খসল (৬১৮), পাঠলি (৩), ভুললি (৩), রতলি (৪), বাঢ়লি (১৮), বিছুড়লি (৪১), পাললি (৩৫৮), বাঁধললি (৪৪১) , চড়লা (২৬), খসু (৫), বোলথি (২৮) ইত্যাদি ধরণের পদ। ভবিষ্যৎ কালের প্রথম পুরুষে 'ব, ত, এ' ইত্যাদি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়ে পদকে গম্ভীর কোরে তুলেছে। যথা--পতিআকব (৩২), আনব (৩৭), রহত (৪৬), লুকাএত (৫১), আওব (৭৩২), পরিতেজব (৭৪০), আবএ (৩৭) ইত্যাদি।

প্রথম পুরুষে ভবিষ্যৎ কালে 'ত' প্রত্যয়ের ব্যবহার বাংলা থেকে ব্রজবুলিকে তথা মৈথিলি ভাষাকে পৃথকত্ব দান করেছে। প্রসঙ্গত বলা যায়—

> "Maithili becomes distinct form Bengali by the use of future in 't(a)' in the third person and by very complex conjugation of verb, which is so uniform and so simple in Bengali."[৯]

ব্রজবুলিতে অসমাপিকা ক্রিয়ারও বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। বাক্ রীতিতে বৈচিত্র্য এনেছেন কবি এর সাহায্যে। সাধারণত বর্তমান কালে 'ই, হু (উ), এ' প্রভৃতি প্রত্যয় এবং অতীতকালে 'হ, লে (এ)' প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। যথা—বিসেখী (৩), চুনিচুনি (৩৪), পরবোধি, (৬৭৪), সীচি (২২৪), হেরিতহি (৪২৩), ঠাড়ি (৫৪০), মোড়ি (৭০৮), জাই (৭১৩), ভখি (৭৩০), পরিহরি (৭৭৮),ভমিভমি (৮৮৩), জতনহু (৪৪০), অছিকহু (৪৪৫), অবলম্বনে (৬৬৭), ছুতাইতে (৬৭৪) , উগারএ (৩৫৬), মজ্জনকএ (৪৯২), দরশনে (৪৩৯), এবং কএলহ (৪৭১), ছুইলে (৪২০), উপজাওল (৩৫৫), পসারল (৩১২) প্রভৃতি। ভাষায় ধ্বনিঝংকার সৃষ্টির আরেকটি কৌশল হিসেবে বিদ্যাপতি প্রয়োগ করেছেন ধ্বন্যাত্মক শব্দ বা অনুকারাত্মক শব্দ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—চুনিচুনি (৩৪), ধক ধক (৮৪), চেও চেও (১৪৩), চহকি চহকি (২৭), বেরি বেরি (১১৪), জগমগ (২৭৪), চরিএ চরিএ (৫২৬), গদ গদ (৫২৯), খিখিয়ায়ল (খিল খিল) (৫৯৬), লহুলহু (৮৭০), গর গর (৮৭১), বিচ বিচ, লগা লগা (৮৮৯) প্রভৃতি।

ব্রজবুলি ভাষার শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন বলেছেন,—

> "তৎসম শব্দের প্রাচুর্য ব্রজবুলির একটি প্রধান বিশেষত্ব। ব্রজবুলির ছন্দ মাত্রামূলক, এবং পদান্ত 'অ' কার অবলুপ্ত। সুতরাং ব্রজবুলি কবিতায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার যথেচ্ছ ও নির্বাধ। এই কারণে এবং লৌকিক মূলকতার জন্য অর্ধতৎসম শব্দের প্রয়োগও খুব আছে।"[১০]

বলা বাহুল্য যে, ব্রজবুলি কৃত্রিম-সৃষ্ট ভাষা হলেও, বিদ্যাপতির অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রযত্নে তা সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বিদ্যাপতির পদাবলীতে যে সমস্ত শব্দের বহুল ও ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষিত হয়—তার মধ্যে বহু শব্দ আছে যা পরবর্তীকালের বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তাদের পদেও অনুসৃত হয়েছে। যেমন—কির| কীর (২৬,১৯১,২৯৪), কৈতব (৫২,৮২,৩৭২) , খিন| খিনী| খীনী (১৮৪,৩৬০,৩১৫,৫৪২,৫৫০) গিম | গীম| গীমা| গৃম (গ্রীবা) (২০,৩৮,১১১,১২৭,২৮৪,৪৬৩), বিহি (২৩,২৫,১৮৫,২৬৪,৩৭১,৪৪৭), গমার (১৫৯,৩০১,৪০৬,৫৬০), বৈসল (৭০৩) ইত্যাদি।

উপমা, প্রতীক ইত্যাদি হিসেবে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত বিশেষ্য ও বিশেষণাত্মক শব্দগুলির মধ্যে আছে—কাঞ্চন, কনক পুতলা (১৭৬,৭৩৯), কলাবতি| কলামতি (৮২,১৬৪,১৭৬,১৮২,৭৪২), সামরা| ঝামরি (৬৮,৯৭,১৩৭,১৬৮), পঁচবান (৩৩,৭৯,১২৭,১২৮), বরজৌবতি (৩৯,৬৪,৭৪,৮০,১৩৩,৩১৪), অভাগিনি (১৭৪,১৮৩), কনক কটোরা (৬৯,৯৭,৬২৪,৬২৬), কনক সম্ভু (৩৯,৬২৩), নয়ন তরঙ্গ (১৮,৬২৪), কুসুম-, শর, সায়ক (১৭৫,১৯২,২২৩,৬২২), কমলমুখি (১৭৯,২৩৯), সসিমুখি (১৯৪,২২০,২৬৭,৬৮৯) ইত্যাদি। লক্ষণীয় যে, বহু ব্যবহার

হেতুই এই ধরণের শব্দগুলি স্বাতন্ত্র লাভ করেছে।

বিদ্যাপতির কাব্যে ভাষা বৈচিত্র্যের অন্যতম সম্পদ প্রবচনের প্রয়োগ। বহু প্রবচনের যথাযথ শৈল্পিক ব্যবহার তাঁর পদাবলী গানে লক্ষিত হয়। কখনো ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে, কখনো হৃদয়ের গভীরতর অনুভূতির অভিব্যক্তিতে, কখনো উপামাস্থাপনের চারুত্বে, কখনো বা গূঢ়ার্থ প্রকাশ কল্পে লৌকিক অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রবচনের নিপুণ প্রয়োগ করেছেন কবি। তাঁর কাব্যভাষা আলোচনায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর ব্যবহৃত অসংখ্য প্রবচনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুলির আলোচনা করা হল।

নায়িকার প্রেরিত সখী নিজেই নায়কের সঙ্গে কামক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করেছে। অন্য সখীরা তা জেনে নায়িকাকে সতর্ক করে দিচ্ছে এই লোকাভিজ্ঞতার ভিত্তিতে—'বিরলা কে ভল খিরহর সোম্পলহ, দুধ বহলি অচ্ছডাঢ়ো (৮৩)'— অর্থাৎ বিড়ালকে (সখী) দুধ রক্ষার ভার অর্পণ করেছ? অতএব তার যা করণীয় সে করেছে। কবি এখানে প্রবচনটির মাধ্যমেই বক্তব্য এবং তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছেন। আবার প্রসঙ্গান্তরে দেখি, নায়ক বা প্রিয়তম প্রবাসে। এই সুযোগে সখী নায়িকাকে বোকা বানিয়ে পরপুরুষের কাছে প্রেরণ করেছে। নায়িকার সক্ষোভ উক্তি—'জে পতিপালক সে ভেল পাবক ইথী কি বোলত আন (৪৬)',–অর্থাৎ রক্ষকই যদি দাহক (ভক্ষক) হয়, তাহলে, অপরে কি সমালোচনা করবে? এই প্রবচনে কবি প্রথাগত লোকনিরুক্তিকেই ব্যবহার করেছেন।

সম্ভোগের কালে রাধাকৃষ্ণের কাছে কামকলার শাস্ত্রনীতি আশা করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তার ধারে কাছে না যাওয়ায় রাধা সক্ষোভে কৃষ্ণকে ব্যঙ্গাঘাত করেছেন—'গোরু চিহ্নএ গোপক কাজ (৮১)'। অর্থাৎ গরু চেনাই হচ্ছে গোয়ালার একমাত্র কাজ।

রাধা যতই চেষ্টা করুন না কেন কৃষ্ণ কিছুতেই আশানুরূপ কর্মদক্ষতা দেখাতে পারেন না। ফলে রাধার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কৃষ্ণ সম্পর্কে এই যে, 'কাজর দুধেঁ পখালল জানি (৮১)'। অর্থাৎ, কাজলের কালি কি দুধে ধোওয়া যায়। স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ে যায় আর একটি বহু প্রচলিত প্রৌঢ়োক্তি—অঙ্গার শতধৌতেন মলিত্বংন মুঞ্চতি।

নিম্নোক্ত পদটিতেও একাধিক প্রবচন বাক্যের মাধ্যমে কৃষ্ণের কলারসজ্ঞানহীন স্থূল পরিচয়টি রাধা উপস্থিত করেছেন। রাধা এখানে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন কৃষ্ণকে এই বলে—-'বানর মুখে কভু না সোভই পান (৭৮)'। অর্থাৎ, বানরের (কৃষ্ণের) মুখে তাম্বুল চর্বণ মানায় না ও শোভা পায়না। আরও পর্যুদস্ত করেছেন এই বলে, 'বানর গলে কাঁহা মোতিম মাল (ওই)'। অর্থাৎ বানরের (কৃষ্ণ) গলায় মুক্তোর মালা (রাধা) দিলে তার মর্ম বোঝেনা সে। রূপমুগ্ধা রাধা ধরা দিয়েছেন কৃষ্ণের কাছে। কিন্তু গ্রাম্য রাখালের সম্ভোগ রীতিতে মার্জিত ভাব নেই। তাই রতিকলায় আনাড়ি কৃষ্ণের উপর রাধা ভীষণ চটে গিয়ে সখীকে বলছেন, 'পিতরক টাঁড় কাজ দহ কওন লহ। উপর চকমক সার (১১৭)। অর্থাৎ, সখি হে, পিতলের টাড় (কৃষ্ণ) কোন কাজেই লাগে না। কেবল উপরের চকমকই (রূপ) সার। নিম্নোক্ত পদেও দেখি রাধা কৃষ্ণের জোর পূর্বক সম্ভোগে বিরক্ত ক্রুদ্ধ। তিনি অনুযোগ করেছেন সখিকে, কবিও যেন রাধার পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন—'ভূখিত জন কিয়ে দুই করে খান (৬৮০)'। অর্থাৎ, ক্ষুধার্ত হলেই কি দুহাতে খেতে হবে? তেমনিই যেন কৃষ্ণের সম্ভোগবাসনা। কৃষ্ণের উৎকট কামাভিলাষকে রাধা উপমিত করেছেন, 'পাবক সিখা নিচন ধাব এ উঁচ ন জা জলধারা (৮০৯) এর সঙ্গে। অর্থাৎ আগুনের শিখা যেমন নিম্নগামী হয় না বা জলের ধর্ম যেমন উর্ধগামী হয় না, কৃষ্ণের স্বভাবও তেমনিই, নিরন্তর বেড়েই চলে। এখানেও রাধার উপমায় কবি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

রাধার মানস পরিচয়েরও টুকরো টুকরো ছবি বিদ্যাপতির ব্যবহৃত লোকোক্তি প্রবচনে ধরা পড়েছে নিখুঁত ভাব, অভিব্যক্তিতে। যেমন, অনুরাগিনী নায়িকা প্রেমকে গোপন রাখতে চাইছেন। কিন্তু প্রেম-গোপনের ফলে তা যন্ত্রণাময় হয়ে উঠেছে। নায়িকার এই দগ্ধ অন্তরটি প্রকাশ করেছেন বিদ্যাপতি —'খত খরিআ সন ভেল সিনেহ (৭১)'—এই প্রচলিত অভিজ্ঞতা থেকে। অর্থাৎ, ক্ষতস্থানে প্রযুক্ত লবণের যন্ত্রণা নায়িকার গোপন প্রেমের ধালার মতো।

ঋতুরাজ বসন্তের কামোদ্দীপক পরিবেশ প্রভাবে রাধা, কৃষ্ণ আসঙ্গ লিপ্সায় প্রতীক্ষারত। কিন্তু প্রত্যাশা মেটেনা কৃষ্ণ না আসায়। তাই হতাশ রাধা কৃষ্ণ বচনকে গভীরতা দিয়ে বলেছেন, 'গুরু সুমেরু তহ সুপুরুষ বোল (১৪৩) অর্থাৎ, প্রকৃত মানুষের দেওয়া কথা সুমেরু পর্বতের ন্যায় ভারী। বিশ্বাসী প্রিয়জন সর্বদাই কথা রাখে। সুতরাং কৃষ্ণেরও কথার দাম থাকা উচিত। অথচ তা হচ্ছে না।

মানউন্মত্তা রাধা কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, কৃষ্ণের স্বভাব ভ্রমরের মতো। এক ফুলে আসক্ত নয়। রাধা এই বিশ্বাসভঙ্গতা বরদাস্ত করেননি। কিন্তু (সখী রাধাকে তিরস্কার করছে এই বলে যে, 'পুরুষ(ক) চঞ্চল স্বভাব (৬১)'[11]) অর্থাৎ পুরুষের স্বভাবই চঞ্চল, সেজন্য মান করার কি আছে? সখির মুখের এই উক্তিতে তৎকালীন সমাজে পুরুষের প্রেম-রীতির নির্লজ্জ প্রকাশ দেখি। পুরুষ (ভ্রমর) ইচ্ছামত কুসুমে কুসুমে মধু খেয়ে বেড়াবে। তাই একথা স্মরণে রেখে সখি রাধাকে দৃষ্টান্ত সহযোগে বলছে, 'কুপ ন আবএ পথিকক পাস' (ওই)। অর্থাৎ কুপ (কৃষ্ণ) কখনো তৃষ্ণার্ত পথিকের (রাধা) কাছে নিজে থেকে আসেনা। এখানেও স্বেচ্ছাচারি পুরুষ সমাজের চরিত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ করেছে সখি। সঙ্গে সঙ্গে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণারও ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়।

বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাসে মিলনের পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে। কৃষ্ণ-প্রতীক্ষারত রাধা। কিন্তু কৃষ্ণ আসেন না। হতোদ্যম রাধা সংসারের অঙ্গন থেকে চয়ন করেছেন অভিজ্ঞতা, 'কাহুক বিপদ কাহুক সম্পদ (১৪২)।'[12] অর্থাৎ, কারো পৌষমাস কারো বা সর্বনাশ। বিরহিনী রাধার ক্ষেদোক্তি 'চোর জননী জঞো মনে মনে ঝাখিঞোঁ রোঞোঁ বদন ঝাপাঞ (১৪৭)'। কৃষ্ণ তাঁর প্রেম প্রত্যাখ্যান করে চলে গেছেন। কিন্তু বিরহ যন্ত্রণা প্রকাশ করা যাচ্ছে না, কারণ, এই প্রেম পরকীয়া অবৈধ। রাধার অবস্থা যেন চোরের মায়ের মতো। সে মনে মনে শোকে গুমরায়, কাঁদে মুখ ঢেকে, কেননা সামনে লোকসমাজ ও লোকনিন্দার লজ্জা। এখানেও লৌকিক অভিজ্ঞতার বাণীরূপ দেখি।

নিম্নোদ্ধৃত অংশে বিরহিনী রাধা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে বুঝেছেন, 'দুহু কর গন্থক খেলাওন ভেল (৫৩২)'। অর্থাৎ, কৃষ্ণের আলিঙ্গন আসলে খেলা। প্রভুর হাত দুটির আলিঙ্গনে ক্ষণিক আনন্দ পিয়াসী। খেলনার প্রতি সাময়িক আসক্তির মতোই প্রভুর আলিঙ্গন ও ক্ষণস্থায়ী (রাধার প্রতি)। এখানেও রাধার তীক্ষ্ণ মনোবিশ্লেষণ লক্ষণীয়।

সখি রাধাকে নানাভাবে উত্তেজিত করছে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য। কিন্তু রাধা গররাজি। তিনি দ্বিধাজড়িত ও অস্থিরতা প্রকাশ করছেন কথাবার্তায়। সেজন্য সখি একহাত নিয়েছে রাধাকে-—'গুরু তা না হো আমড়াকাঁ কাঠ (২৬৩)'—অর্থাৎ, আমড়া কাঠ কখনোই ভারী হয় না। তেমনি, রাধার মনটাও আমড়া কাঠের মতো হালকা ও লঘু। এখানে বাক্‌ভাষায় তীক্ষ্ণ তির্যকতা ও নিপুণ লোক অভিজ্ঞতা প্রসূত উপমা প্রয়োগ লক্ষণীয়।

ঠিক প্রবচন নয় অথচ প্রবচনের মতোই প্রায় স্বতঃসিদ্ধ এরকম বহু বাক্যসম্ভার বিদ্যাপতির কবিভাষাকে এক দুর্লভ অভিব্যক্তি দান করেছে।

রাধা ছলনায় নেমেছেন। নিজের অনুপম দেহবল্লরীকে দোকান সামগ্রী করে সুরতরসের কারবারে বসেছেন। তাই কানাই (কৃষ্ণ) কে বিনামূল্যে এই সামগ্রী দিতে তিনি নারাজ। বিশেষত বউনির (প্রথম বিক্রয়) বেলায়। তাই রাধার ব্যবসায়ী উক্তি 'পহিল পঢ়ঞোক উধারি ন দেবা' (৩৪১)। অর্থা, প্রথম ক্রেতাকে ধার দেওয়াই যায় না।

অন্যত্র দেখি, রাধা দুতিকে বলছেন যে, কৃষ্ণ আসলে কপট। সেই কপটের কথা সে যেন রাধাকে আর না শোনায়। রাধার হৃদয় এখন প্রশান্ত ও শীতল হয়ে গেছে। কৃষ্ণকে তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। সুতরাং 'জুড়িহ হৃদয় পজারসি আসি' (১১৮)। অর্থাৎ, সে হৃদয় এখন জুড়িয়ে গেছে (কৃষ্ণ ব্যতিরেকে) সেখানে আবার আগুন জ্বালানো কেন? রাধার এই শৈল্পিক স্বীকারোক্তি প্রশংসনীয়।

কৃষ্ণের সঙ্গে মিশে রাধার অনুতাপের শেষ নেই। কেননা, তাঁর সঙ্গ কুপুরুষের সঙ্গ। স্বভাবও খারাপ। তাই, কৃষ্ণের উপমা প্রয়োগ করে নিজ যুক্তি দৃঢ় করেছেন এই বলে—'দূরে পটাই অ সীচী অ নীত|সহজ ন তেজ করইলা তীত' (৪১৮)। করলাতে যতই রোজ দুগ্ধ সিঞ্চন করা হোক না কেন, তার তিক্ত স্বাদ অপসারিত হয় না। কৃষ্ণের স্বভাবও করলার মতোই অপরিবর্তনীয়। এখানেও দেখি কবি দৈনন্দিন জীবন অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন সাহিত্যে দেখিয়েছেন।

কৃষ্ণও যুক্তি প্রয়োগে কম যান না। অন্য নারীতে উপগত দেখে রাধা যখন তাঁর উপর ক্রুদ্ধ, এবং বাক্যবাণে জর্জরিত করছেন, তখন কৃষ্ণ বলছেন, 'বাঢ়িক পানি কাঢ়ি জা জানি|ঠাম রহল গএজেনিজ মানি' (১৩১)। অর্থাৎ, ব্যাপারটা স্বাভাবিক কারণ, বন্যার জলের মতো জীবনে সহসা কোন নারী সংস্পর্শ ঘটলে ক্ষতি কি? বন্যার প্রকোপ কমলেই তো জলাশয়ের নিজের জল নিজের কাছেই থাকে। সেরকমই ঘটেছে কৃষ্ণের জীবনে। এই উক্তির মধ্যে নাগরিক, বিদগ্ধ রাজসভাকবির তির্যক তীক্ষ্ণ বাক্‌বৈদগ্ধ পরিস্ফুট হয়েছে।

মাঝে মাঝ গভীর অনুভূতি গ্রাহ্য, শিল্পোজ্জ্বল ভাষা ব্যবহার করেছেন কবি।

সংকেত স্থানে রাধা পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। অন্ধকার এত প্রগাঢ় যে সাপের মাথাতে পর্যন্ত পা দিয়ে ফেলেছেন তিনি। কবি এই সুদুর্গম অমানিশার নীরন্ধ্রতার ভাষারূপ দিয়েছেন রাখার অনুষঙ্গে—'তরুণ তিমির দিগ ন জান এ' (৩৬১)। অর্থাৎ তরুণ লোকের মতোই পুরু ও বলিষ্ঠ এই অন্ধকার। বস্তুত তরুণ শব্দযোগে অন্ধকারের এই চেতন রূপমূর্তি বিদ্যাপতির মৌল প্রতিভার স্বাক্ষর। ২০৭ সংখ্যক পদেও এই অর্থে 'তরুণ' শব্দ ব্যবহার লক্ষিত হয়।

রাজসভার কবি বিদ্যাপতির কলমে ব্যঙ্গের অগ্নিশিখার ঝলকানি লক্ষিত হয়। কৃষ্ণকে ক্ষুরধার বাক্যবাণে জর্জরিত করেছেন রাধা। যেমন কৃষ্ণের কথা প্রথম দিকে রাধা বিশ্বাস করতেন। পরে বিশ্বাস-চ্যুতি ঘটলে রাধা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর ব্যঙ্গোক্তি 'কৌআ মুহন ভনিতা এ বেদ' (২০৫)।[২৩] অর্থাৎ, কাকের (কৃষ্ণের) মুখে কি কখনো বেদ (সত্যকথা) উচ্চারিত হয়? এখানে বক্তব্য কিছুটা বক্রোক্তির ধরণে। কখনো আবার কৃষ্ণকে যাচ্ছেতাই ভাবে আখ্যাত করেছেন রাধা। এমনকি তাঁর স্পর্শ পর্যন্ত ঘৃণা করেছেন—'ভাঁড়ো ছুইল নহি ভরলে পেট' (ঐ, ৯১ সংখ্যক)। অর্থাৎ, অস্পৃশ্যের (কৃষ্ণের) ছোঁয়াও খেলাম, পেটও ভরল না। কৃষ্ণের দেবমহিমা এখানে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়েছে। যদুনন্দন কৃষ্ণকে জাত তুলে গালাগালি দিতেও আটকায়নি রাধার—'আনক বোলিয়ে গোপ গমার' (ঐ, ৯৫ সংখ্যক)। কৃষ্ণ জাতিতে যে গোয়ালা এবং নিতান্তই গ্রাম্য গোঁয়ার—একথা সুবিদিত। স্বভাবতই এইরকম যে কৃষ্ণ, তাঁর প্রেমও ভেজাল হতে বাধ্য। তাই রাধা

অভিযোগে সোচ্চার যে কৃষ্ণর প্রেম আসলে মেকী, লোকদেখানো। 'কপট হেম ধর কতিষণ বানে' (ওই, ১৩৩ সংখ্যক)। অর্থাৎ, মেকী সোনা (কৃষ্ণের কপট প্রেম) তার বিশুদ্ধতা বেশিক্ষণ গোপন রাখতে পারে না পরীক্ষা কালে (রাধার কাছে)। এখানেও তুলির আঁচড়ের মতোই এক একটি বাক্যে কবির মুন্সীয়ানা পরিদৃষ্ট হয়।

পদগঠনের (বাক্যরীতি) বিশুদ্ধতা পুরোমাত্রায় সর্বদা মেনে চলেন নি বিদ্যাপতি। অনেক সময় ক্রিয়াপদ ছাড়াই বাক্যবিন্যাস লক্ষিত হয়। এসব ক্ষেত্রে, ছন্দে মাত্রা সমতা রক্ষা, ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি বা অপ্রয়োজনীয় বোধে ক্রিয়াপদের অপসারণ প্রভৃতি নানারূপ কারণও থাকতে পারে। যথা--কৃষ্ণের পরিচয় প্রদান কালে,--'সে অতি নাগর গোকুল কাহ' (ঐ, ১০৮ সংখ্যক) বাক্যে বলা হয়েছে যে, সেই কানাই (হচ্ছে) গোকুল নগরের বিখ্যাত নাগর।

নিম্নোক্ত পংক্তিটিতেও দেখি অনুক্ত ক্রিয়াপদ। যথা--"সাঁঝকবেরা|জমুনাক তীরা|কদম্বেরি বন তরু তরা" (৭৬)।[২৪] সন্ধ্যাবেলা যমুনাতীরে কদম্ব গাছের নীচে (কৃষ্ণ রাধাকে ধরলেন)। বর্ণনাত্মক উক্তপদে ক্রিয়াপদ না থাকায় অর্থ বুঝতে আড়ষ্টতা জন্মে। উপমাত্মক নিম্নোক্ত পদটিতে দেখি--'সরসজি বিনু সর|সর বিনু সরসিজ|কী সরসিজ বিনু সূরে' (১৬৩)। অর্থাৎ, পদ্মবিনা সরোবর কিংবা সরোবর বিনা পদ্ম, বা সূর্য ছাড়া পদ্মফুল (শোভা পায় না)। এখানেও ক্রিয়াপদ উহ্য, তথাপি অর্থ অবোধ্য থাকে না। ১৭৪ সংখ্যক পদে রাধার বারমাস্যা বর্ণনায় 'মাস অখাঢ় উন্নত নবমেঘ'--এই অংশে ক্রিয়াপদ উহ্য। অর্থাৎ, আষাঢ় মাসে নবমেঘ উন্নত (দেখা দিয়েছে)। এখানেও অর্থ পরিস্ফুট হয় সহজেই।

নিঃসঙ্গাবস্থায় বিলাপ করছেন শ্রীরাধা 'হম অবলা নিরজনি রে' (৮৬৭)। শোকাকুলা রাধা বলছেন যে, তিনি অবলা নারী একাকিনী (হয়ে পড়েছেন)। সম্ভবত বিলাপের ভাষা ক্রিয়াপদ ছাড়াই বোধগম্য হয়েছে। ৮৭৮ সংখ্যক পদটিতে একাধিক পংক্তিতেই ক্রিয়াপদ অব্যবহৃত। যথা--'নখি - কুল - সঙ্কুল বাট বিদূর', অর্থাৎ, দূর পথটি (হচ্ছে) হিংস্র জন্তু পূর্ণ। অথবা, 'দসমি দসা মোহি কওনক দোস'--আমার দশমী দশা কার দোষে (হোল)। বা, 'তোঁহে তরুনত হম বিরহিনি নারি'--তুমি (হচ্ছ) তরুণ পুরুষ আর আমি (হচ্ছি) বিরহিনী নারী। এসব স্থলে বাক্য বিন্যাস বা পদগঠনে আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটি লক্ষিত হলেও কবিভাষা নির্মাণে এই রীতি প্রতিষ্ঠিত সত্য। বরং অনেক সময় কবি প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায় এই জাতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষায়।

কোন কোন পদে কর্তৃপদেরও অনুল্লেখ লক্ষিত হয়। যেমন--'উগমল জগ ভম|কাহু ন কুসুম রম|পরিমল কর পরিহার' (৩৮৮)। অর্থাৎ, (কানু বা কৃষ্ণ) উন্মাদের মতো জগত ভ্রমণ করেন, কোন কুসুমকেই (তিনি) রমন করেন না, (তিনি) গন্ধ ও পরিহার করছেন। ২৫৬ সংখ্যক পদটিতেও কর্তা উহ্য। যথা--'সরুপ কথা কামিনি সুনু|পরহি আগে কহহ জনু'। অর্থাৎ, (হে) কামিনি, (তুমি) স্বরূপ কথা শোন, পরের সামনে যেন (তুমি), কিছু বোল না। এসব স্থলে কর্তা উহ্য থাকলেও কাব্যভাষায় অর্থহানি ঘটতে দেননি কবি।

লোকসমাজে প্রভূত জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ বিদ্যাপতির শব্দ ব্যবহার। আঞ্চলিক তথা দেশজ এবং লোকয়ত সমাজের চলতি ভাষা ব্যবহার করে পদাবলীকে রাজসভার সঙ্গে সঙ্গে লোকসভায় এনেছেন কবি। অবশ্য, পরবর্তীকালে তাঁর পদে লোকভাষার অনুপ্রবেশ বা প্রভাব ঘটাও আশ্চর্য নয়। এই সমস্ত শব্দাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল--মাউগ (স্ত্রী|রমনী), (১৩), বার (বালক) (ওই), ঠারি (দাঁড়িয়ে) (৫৭), খাঙতরি (ছেঁড়া চাটাই), (৫৬), খোএলক (রাধা) (৮৮), বুড়ি (ডুবে) (৯৭), তোড়লে (ভাঙলে) (১২২), গথার (গ্রাম্য, গোঁয়ার) (১৫৯,৩৪৩,৪৫১), চোলরি (চেলি) (২০৫),

থোএ (রাখল) (২২৯), ঠাম (ঢঙ) (৩৪৩,৪৪৮), চহচহ (ফড়ফড়) (৩৪৫), চাঁছল (৩৯৪), করইলা (করলা) (৪২০), খেলাওন (খেলনা) (৫৩২), খত (পচা), কুমেঢ়া (কুমড়ো) (৫৫৭), উহুউহু (না) (৬৬৮), ঠেসতা (ঠোকর) (৭৮৭), খোঁইছা (কোঁচড়) (৮০৪) প্রভৃতি।

বিদ্যাপতির ছন্দ নির্মিতি

একথা বিদিত যে, জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দম্ কাব্যের ভাষা সংস্কৃত হলেও ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি গীত অংশে সংস্কৃত বর্ণবৃত্ত[১৫] ছন্দোরীতির স্থলে জাতি বা মাত্রা ছন্দেরই[১৬] অনুসরণ করেছেন। তাছাড়া, সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরধ্বনির (আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ) দুই মাত্রা উচ্চারণ রীতি—পদ্ধতি তাঁর কাব্যে প্রযুক্ত হলেও বর্ণবৃত্তের দলসংখ্যার (সিলেবল্ ইউনিট) সমতা ও দলবিন্যাস নীতির কড়াকড়ি তথা নির্দিষ্ট নিয়ম মানা হয়নি। সেক্ষেত্রে প্রাকৃত মাত্রাবৃত্ত[১৭] ছন্দানুযায়ী তিনি পংক্তির মাত্রা সংখ্যা সমতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন চর্যাগীতি পদাবলীতে[১৮] এবং জয়দেব পরবর্তী মৈথিল বাংলা-অবহট্ট মিশ্রিত বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষার বৈষ্ণব পদাবলীতে যে ছন্দোরীতি মানা হয়েছে সেখানে প্রাকৃত-অপভ্রংশের মাত্রাবৃত্ত রীতিও সঠিকভাবে অনুসৃত হয়নি। এসব স্থলে রুদ্ধদল বা দীর্ঘস্বরধ্বনির উচ্চারণ কোথাও গুরু, কোথাও লঘু—এই স্বেচ্ছা সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। তেমনি, মাত্রাগণনার সময়েও ছন্দোশ্রুতি অনুযায়ী তা কখনো দুইমাত্রা, কখনো একমাত্রা ধরা হয়েছে। এই স্বেচ্ছাচার বা নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা দেখানো হয়তো এজন্যই দোষের হয়নি যে, পদগুলি গান করা হত। ফলে, সুরের প্রয়োজনানুসারে মাত্রা সংখ্যার উচ্চারণ ত্রুটি ঢাকা পড়ে যেত।

বিদ্যাপতি রচিত ব্রজবুলি পদেও ছন্দ-সৌষম্য রক্ষার্থে এবং সঙ্গীতের প্রয়োজনে অর্থাৎ টান -সাপেক্ষে দীর্ঘ স্বরধ্বনির উচ্চারণ-রীতিতে তারতম্য লক্ষিত হয়। তাঁর পদাবলীতে মুখ্যত প্রত্ন-কলাবৃত্ত ছন্দোরীতি[১৯] প্রযুক্ত হয়েছে। তবে, দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য হেতু ছন্দের কলামাত্রা গণনার ক্ষেত্রে কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম মানা সম্ভব হয়নি। বস্তুত, ছন্দের দুই মৌল ভিত্তিভূমি অর্থাৎ, (১) উচ্চারণ প্রকৃতি ও (২) গঠনতন্ত্র—উভয়ক্ষেত্রেই বিদ্যাপতি কিছুটা স্বাধীনতা দেখিয়েছেন। প্রধানত প্রাকৃত অপভ্রংশ ধারার মাত্রাবৃত্তের অনুসরণ করেই রচিত হয়েছে তাঁর পদাবলী। কিন্তু দীর্ঘস্বরধ্বনি সমন্বিত শব্দাবলী, বা যুক্ত বর্ণবিশিষ্ট শব্দাবলীর উচ্চারণ প্রকৃতি বিদ্যাপতি সুবিধামত কলামাত্রার হিসেবে গণনা করেছেন। নতুবা পর্বমাত্রার মিল রাখা অসম্ভব হোত। তাঁর অল্প কিছু গানে দলসংখ্যাতছন্দেরও (দলবৃত্ত) প্রয়োগ দেখি। তবে, তা আধুনিক দলবৃত্তের থেকে পৃথক। বিদ্যাপতির প্রধান ছন্দ নির্মিতি প্রত্ন-কলাবৃত্তে হলেও সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ-রীতির ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে মিশ্রবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত) ছন্দেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অবশ্য এরকম পদের দৃষ্টান্ত স্বল্প। ছন্দের গঠন আঙ্গিকেও বিদ্যাপতি মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বহু প্রকারের বন্ধৌবৈচিত্র্য যেমন তাঁর পদে লক্ষিত হয় তেমনি, মিশ্র গঠন রীতির পদও পাঠকের কাছে নতুন স্বাদ বহন করে আনে। তবে, কলামাত্রা ছন্দোরীতির পদগঠনেই বিদ্যাপতির সবিশেষ মুন্সীয়ানা পরিস্ফুট। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, জয়দেব কর্তৃক সংস্কৃত লঘু-গুরু-গণসম্মত বর্ণবৃত্তের প্রতি সচেতন বিদ্রোহ ও প্রাকৃত জাতি বা মাত্রাছন্দের প্রতি আনুগত্য থেকেই যেমন বিদ্যাপতি প্রভাবিত, তেমনি, বিদ্যাপতির প্রাকৃত-অপভ্রংশ ছন্দোরীতির স্বরবর্ণের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ সম্পর্কে ও রুদ্ধ দলের সংশ্লিষ্ট-বিশ্লিষ্ট কলামাত্রা গণনা সম্পর্কে স্বেচ্ছা-শৈথিল্য[২০] থেকেই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বাংলা কলাবৃত্ত রীতির ছন্দের আধুনিক রূপ ও বিচিত্র প্রয়োগ-আঙ্গিক সুপ্রতিষ্ঠ হয় এবং

তাঁর হাতেই কলাবৃত্তের চরম উৎকর্ষ ঘটে।

বিদ্যাপতির পদাবলীতে কলাবৃত্ত ছন্দোরীতির বিচিত্রবন্ধের মধ্যে একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, ও চৌপদী-বন্ধের পদের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখি। প্রথমে একপদী-বন্ধের আলোচনা করা হল।

কলাবৃত্তের একপদী বন্ধগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম মাত্রা সংখ্যা বিশিষ্ট পদ হচ্ছে—

সখি) সে সব কহিতে | লাজ। ২) ৬|৩।
যে করে রসিক | রাজ।। ৬|৩।
আঙিনা আওল | সেহ।
হাম চলিল | গেহ।।[২১]

এখানে দুই মাত্রার অতিপর্ব সহ পংক্তির মাত্রা সংখ্যা এগারো। পরবর্তী পংক্তিগুলিতে মাত্রা সংখ্যা নয়। পর্বভাগ দুই) ছয় - তিন (২)৬। ৩।) মাত্রা বিভাগে। পদের শুরুতে দুই (২) মাত্রার অতিপর্ব ব্যবহারের ফলে বিশেষ স্পন্দন বা দোলার সৃষ্টি করা হয়েছে। তা ছাড়া পদটির মাত্রা সংখ্যা প্রথমে এগারো ও পরে নয়—এই অযুগ্ম সংখ্যায়।

একপদী বন্ধের মধ্যে এগারো মাত্রার একাবলী ছন্দ উল্লেখযোগ্য। যেমন—

এ ধনি | কর অব | ধান। ৪।৪।৩।
তো বিনে | উ ন ম ত | কান।।
কারণ | বিনু খেনে | হাস।
কি কহএ | গদগদ | ভাস।।[২২] —এখানে পর্বমাত্রা বিভাগ চার - চার - তিন (৪।৪।৩।) হিসেবে। তবে, একে ছয় - পাঁচ (৬। ৫) পর্বমাত্রা বিভাগেও পাঠ করা যায়।

একপদী বন্ধের বারো মাত্রারও বহু পদ লক্ষিত হয় বিদ্যাপতির পদাবলীতে। যথা—

জ ল উ জঃ ল ধি জ ল । মন্দা। ৪।৪।৪।
জ হা বসে । দারুণ। চন্দা।।
বচন নহিক পর মানে।
সময় ন । সহ পচঃ বাণে।। (৫২৬)।---এখানে তিনটি সমমাত্রিক পর্বভাগ (চার - চার - চার। ৪। ৪। ৪।) লক্ষ করা যায়। বারো মাত্রার একপদী গঠনে বৈচিত্র্য দেখা যায় নিম্নোক্তি পদে। যথা—

ব চ ন ক হ বি । কাঁ দ ন মা খি। ৬।৬
মা ন ক র বি । আ দ র রাখি।।
যব করে ধরি । নিকটে আনি।
উ হু উ হু ক এ । কহবি বানি।। (৬৬৮)। —এখানে পর্ব সংখ্যা দুই। মাত্রাবিভাগ ছয় - ছয় (৬। ৬।)। ছন্দোশিল্পী হিসেবে তাঁর দক্ষতা এখানে নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

অনেক সময় বারো মাত্রার একপদী-বন্ধের সঙ্গে দুই মাত্রার আখর বা ধুয়া যোগ করে গানের মতোই ছন্দে ও নতুন ধরনের স্পন্দন বা তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট চোদ্দো মাত্রার পংক্তিতে তিনটি সমমাত্রার পর্ববিভাগের সঙ্গে দুই মাত্রার আখর যোগ করে অপূর্ব পর্ব ভাগ করা হয়েছে। যথা ----

31

এতদিন | ছলি নব | রীতি | রে। ৪ । ৪ । ৪ । ২)
জলমিন | যে হন | প্রীতি | রে।।
একহি ব চ ন ভে ল | বীচ | রে।
হাস পহু | উতরোল | দেল | রে।।(৪৬২)।

এখানে পর্ববিভাগ—চার - চার - চার - দুই ৪ । ৪ । ৪ । ২) কলামাত্রাভাগে। উল্লেখ্য যে, রীতি, প্রীতি, ভেল, দেল প্রভৃতি শব্দে হ্রস্বস্বর বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে দুই কলার মর্যদা পেয়েছে।

প্রাকৃত-অপভ্রংশে ব্যবহৃত পাদাকুলক[১৩] ছন্দের মতো ষোল মাত্রার ছন্দোবন্ধের ব্যবহারও বিদ্যাপতি করেছেন। পংক্তিগুলি চারটি সমমাত্রিক পর্বে বিভক্ত। যথা—

লোচন | লোর তটিনী নির | মান। ৪ । ৪ । ৪ । ৪ ।
ততহি কমল মুখি| করত সি নান।।
বেরি এক | মাধব | কুলে বাই | জীবই
যব তু তা | রুপ নয়ন ভর | পিবই।।(৭৪৭)।

এখানে পর্ববিভাগ হয়েছে চার - চার -চার - চার (৪ । ৪ । ৪ । ৪ ।) মাত্রা ক্রমে। মাত্রা সমতার জন্য শেষ পর্বে হ্রস্বস্বরও দুইমাত্রা গণনা করা দরকার।

ছান্দসিক কবি বিদ্যাপতি সম্ভবত বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য বা পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজনে কয়েকটি পদে একপদীবন্ধেরই ভিন্ন মাত্রিক পর্ববিভাগ করেছেন সুকৌশল। যেমন নিম্নোক্ত পদটি ----

ক ত খ ন | ব চ ন বি: লা সে। ৪ । ৪ । ৪ ।
সু পু রু খ | গেহিহু | আসা | পাসে।। ৪ । ৪ । ৪ । ৪ ।
আবে হসে | গেলিহু ফে দাই।
অথিরক | আতর | মধখ লজাঈ।।(৪৩৩)

এখানে, প্রথম পংক্তিতে বারো মাত্রা এবং পরবর্তী পংক্তিতে ষোলমাত্রার পর্যায়ক্রম লক্ষিত হয়। মনে হয়, পদটি আসলে পাদাকুলক ছন্দেরই বিন্যাস বৈচিত্র্যের সাক্ষীস্বরূপ। প্রথম পংক্তিতে প্রথম পর্বটি ভাব অক্ষুণ্ণ রেখে অপসৃত করেছেন কবি। ফলে ছন্দোনির্মিতিতে ও সংগীতে ও পাঠে নতুনত্ব সঞ্চারিত হয়েছে। উক্ত পদের পর্ববিভাগ চার-চার-চার (৪ । ৪ । ৪ ।) ও চার - চার - চার - চার (৪ । ৪ । ৪ । ৪ ।) মাত্রার ক্রমে। তবে ষোল মাত্রার পংক্তিগুলি আট - আট (৮।। ৮।) পদ মাত্রা বিভাগের দ্বিপদীবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

কলাবৃত্তের দ্বিপদীবন্ধেরও বহুল ব্যবহার করেছেন বিদ্যাপতি। প্রত্নকলাবৃত্তের শিথিল মাত্রাগণনা পদ্ধতি এখানে ও অনুসৃত হয়েছে। পর্বযতি বিভাগেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন কবি। যদিও দ্বিপদীতে পদবন্ধই স্বীকৃত তথাপি মনে রাখতে হবে যে, কলাবৃত্ত ছন্দোরীতিতে পর্ববিভাগই প্রাধান্য পায়। প্রথমে দ্বিপদী পয়ার ——

চ র ণ ক ম ল ক দ ‖ লী বি প রী ত। ৪ । ৪ ।। ৪ । ২ ।
হা স কলা সে ‖ হ র এ সাঁ চী ত।।
কে পতি | আওব ‖ এহু পর মান।
চ ম্পকে | ক এল থু ‖ হবি নির মান।।

চোদ্দমাত্রা বিশিষ্ট পংক্তির পর্ববিভাগ চার - চার - চার - দুই (৪ । ৪ । ৪ । ২ ।) বা আট - ছয়

(৮।।৬।) পদবিভাগে।

কলাবৃত্ত রীতির দ্বিপদী চতুর্মাত্রা - পর্বিক পদের দৃষ্টান্ত —

চির চন দন উরে ‖ হার ন| দে লা। ৪।৪।।৪।৪।
সো অব | নদীগিরি ‖ আঁতর | ভেলা।।
পিয়াক গরবে হাম ‖ কাহু ক ন | গনলা।
সো পিয়া বি না মোহে ‖ কোকি ন | কহলা।।[২৫] (৭২৭)।

উপরোক্ত পদের পর্ববিভাগ চার - চার - চার - চার (৪।৪ ।।৪।৪।) মাত্রায় বা আট - আট (৮ ।।৮।) পদমাত্রাবিভাগে।

দ্বিপদীবন্ধের ছয় মাত্রার পর্বভাগ সমন্বিত পদের প্রয়োগ বিদ্যাপতির পদে দৃষ্ট হয়। যেমন—

ন ঘর রহলু| ন পর ভেলহুঁ ‖ ন পুরু হৃদয় | সাধ।৬।৬।।৬।৪।
আধাহি পথ স সী হাসি উগল ‖ তে ভেল গমন। বাধ।।
মোরেঁ আসেঁ পিতা। সল মাধব ‖ হো এত মো বড়। পাপ।
সিব সিব সিব। জাতো দূর ত্রিব‖ সহস্র কে পার। তাপ।।[২৬] (৪৮)

এখানে পর্ববিভাগ ছয় - ছয় - ছয় - চার (৬।৬ ।।৬।৪।) মাত্রার দ্বিপদী বন্ধ।

ছয় পর্বমাত্রিক নিম্নোক্ত পদটির ছন্দো বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। যথা —

যব) গোধূলি সময় | ভেলি ।। ২)৬।৪।।
ধনি) মন্দির বাহির | গেলি ।। ২)৬।৪।
নব জলধর | বিজুরি রেহা।।
দ্বন্দ্ব পাসরি | গেলি।।[২৭] (৩১)।

পদটিতে প্রথম পংক্তিতে ও দ্বিতীয় পংক্তিতে প্রথমে দুই মাত্রার অতিপর্ব প্রযুক্ত। এবং পর্ববিভাগ দুই - ছয় - চার (২)৬।৪)। একে ২।৬।৪।। পদভাগেও পাঠ করা যায়। তৃতীয় পংক্তিতে পর্বভাগ ছয় - ছয় - ছয় - চার (৬।৬।।৬।৪।) বা বারো - দশ পদ মাত্রায়। অবশ্য, মাত্রা সমতা রাখতে গেলে 'মন্দির' শব্দটিকে মিশ্রবৃত্ত ছন্দের মতো সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে তিনকলামাত্রা ধরতে হবে। পদটির ছন্দো বন্ধে উপরোক্ত দুই রকম গঠন হেতু এক মিশ্র দ্বিপদী বন্ধও বলতে পারি।

সাত পর্বমাত্রিক দ্বিপদীবন্ধবিশিষ্ট কলাবৃত্ত রীতির পদগুলি বিদ্যাপতির মৌলিক আবিষ্কার বলে গণ্য করা যায়। যদিও, জয়দেবের গীতগোবিন্দে একটি মাত্র সাত মাত্রার পদের দৃষ্টান্ত আছে। বিদ্যাপতির পদটি হোল —

গেলি কামিনি | গ জ হু গামিনী|
বিহসি পালটি নি | হারি।
ইন্দ্র জালক । কুসুম সায়ক।
কুহকি ভেলি বরা নারি ।। (৬২২)। — এখানে পর্ববিভাগ হোল সাত - সাত - সাত - তিন (৭।৭।।৭।৩।) মাত্রাভাগে। একে চোদ্দ - দশ (৭।৭।।৭।৩) - এই দীর্ঘ দ্বিপদীতেও পাঠ করা যায়। (৭।৭।।৭।৫।) কলামাত্রায়, বা, চোদ্দ - বারো পদমাত্রা বিভাগে যথা —

কুলিশ শত শত | পাত মোদিত।। ৭।৭।।
ময়ূর নাচত | মাতিয়া। ৭।৫।

মত্ত দাদুরী । ডাকে ডাহুকী ।।
ফাটি যাওত । ছাতিয়া।।

বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে সাত মাত্রার পর্ববিভাগ বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দ বিদ্যাপতির নতুন সংযোজন বলা যায়। ছন্দ নির্মাণে তাঁর শিল্পী সুলভ আগ্রহেরও পরিচয় এর দ্বারা পরিস্ফুট হয়।

কলাবৃত্ত দ্বিপদীবন্ধের নিম্নোধৃত পদটিতে বিচিত্র পর্ববিভাগ লক্ষ্য করা যায়। দুইপদে বিভক্ত পংক্তির পদমাত্রা বিভাগ - আট - চার - চার আট বা ৮।৪।।৪।৮। এই ক্রমে। যথা —

জও হম জনিতহু | তনিতহ।। ৮।৪।।
উপজত | মদন বেয়াবি। ৪।৮।

বাহু ফাস লএ । ফঁসিতহু ।।
হসিতহু অভিমত। সাধি।। (১৮৭)। — এখানে

লক্ষণীয় যে, প্রথম পদের শেষ পর্ব ও দ্বিতীয় পদের প্রথম পর্বে চার কলামাত্রিক সমতা বিধান এবং প্রথম পদের প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের শেষ পর্বে আট কলামাত্রা - সমতা। শুধু ছন্দোবন্ধের বিচিত্র কৌশলই নয় ধ্বনিগত ঐক্যও সৃষ্টি করেছেন কবি। এটিও তাঁর বিশেষ ছন্দ - সচেতনতার পরিচয় বহন করে। পদটি দীর্ঘ দ্বিপদী বন্ধে (১২।।১২।) ও পাঠ করা যায়।

দ্বিপদীবন্ধের ক্ষেত্রেও একই সঙ্গে একটি পদে ভিন্নমাত্রিক পংক্তিবিন্যাস চোখে পড়ে। এতে ছন্দোবন্ধেও একঘেয়েমী দূর হয়েছে। সম্ভবতঃ এটিও তাঁর ছন্দ-সম্পর্কে পরীক্ষামূলকতারই প্রয়াস। যথা—

লঘু লঘু | সঞ্চরু || কুটিল ক | টাখ।

দুঅও নয়ন লহ ।। এক হোক লাখ।।(৩৭)। — এখানে পর্ববিভাগ চার - চার - চার - চার (৪।৪।।৪।৪।), পদবন্ধ আট - আট (৮।।৮।) মাত্রাভাগে। কিন্তু পরবর্তী অংশে পদবিন্যাস বর্ধিত হয়েছে। যথা —

জে অনু | পম পম || ভোগ ন | আব এ।।
কী ফল | তাহি নি | হারী।
চাঁদ গগন বস ।। অও তারাগণ।।

সূর উগল পর চারি।। (এ) —এই অংশে পদবন্ধ আট - আট বারো (৮।।৮।।১২।) এই ত্রিপদীমাত্রাভাগে। ফলে দেখা গেল একই পদে কলাবৃত্তের দ্বিপদী ও ত্রিপদীর মিশ্র বা যৌথ ব্যবহার। এটিও তাঁর সাহসী শিল্পী মনের পরিচায়ক।

একপদীর মতো দ্বিপদীবন্ধের ক্ষেত্রেও গীতের সঙ্গে আখর বা ধুয়া যোগ করে কিছু কিছু পদে ধ্বনি তরঙ্গ ও ছন্দ দোলা সৃষ্টি করেছেন কবি। যথা —

সহ জহি | আনন | সুন্দর | রে ।।
ভউঁহ সু | রেখলি | আখি ।
পঙ্কজ মধু পিবি মধুকর
উড়এ প সারএ পাখি ।। (৩৮)। —পদটিতে দুই মাত্রার পর্বান্তিক ধুয়া যোগ করে দ্বিপদী বন্ধের আঙ্গিক-পরিবর্তিত হয়েছে —পর্বমাত্রিক পদবন্ধ হোল - চার - চার

- চার - দুই - চার - চার - চার (৪।৪।৪।২) ৪।৪।৪। বা বারো - দুই - বারো (১২।২) ১২। তবে সর্বত্রই এই রূপ অনুসৃত হয়নি, যেহেতু, ধুয়া সর্বপংক্তিতে নেই। সেক্ষেত্রে বিন্যাস—১২। ৪।। ১২। পদমাত্রাভাগে। এখানেও ছন্দ ব্যবহারে কবির মৌলিকত্ব প্রশংসনীয়।

কলাবৃত্তের ত্রিপদী বন্ধেরও বহুল ব্যবহার করেছেন বিদ্যাপতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অবশ্য মিশ্রবৃত্তের মতো অর্ধযতি আট মাত্রায়। যেমন —

পুরুষ ভমর সম ‖ কুসুম কুসুমে রম।। ৮।।৮।
পে অসি করয়ে কি পারে। ১২।
ডর ন রাখল পহু।। পরতখ ভেলনহু।।
ওর ধরি ভেল বিচারে।। (১২৫)। — এখানে পদ

বিভাগ আট - আট -বারো (৮।।৮।। ১২।) মাত্রাসংখ্যায়। ছন্দস্পন্দের সঙ্গে সঙ্গে পদটির পদান্ত ও পংক্তিমিলের শ্রুতিমধুর ধ্বনিমিলও লক্ষণীয়। ত্রিপদীবন্ধের কলাবৃত্ত রীতির প্রয়োগে বিদ্যাপতি জয়দেব ব্যবহৃত চউপইআ।[২৮] ছন্দোবন্ধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে অনুমিত হয়। গীতগোবিন্দ কাব্যের নিম্নোক্ত চতুষ্কলপর্বিক দীর্ঘ ত্রিপদীর সঙ্গে বিদ্যাপতির প্রায় হুবহু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। যথা —

পততি পতত্রে ।। বিচলিত পত্রে ।। শঙ্কিত ভবদু পযানম্।
রচয়তি শনয়ং ।। সচকিত নয়নং ।। পশ্যতি তব পন্থানম্।।[২৯]

ত্রিপদীবন্ধের কলাবৃত্তরীতির পদে অনেক সময় মিশ্রবৃত্তরীতির উচ্চারণ প্রকৃতি এসে পড়েছে যেমন —

সহজ প্রসূন মুখ ‖ দরশ হৃদয় সুখ।।
লোচন তরল তরঙ্গ।
আকাশ পাতল বস।। সেও কইসে ভেল আস।।
চাঁদ সরোরুহ সঙ্গ।। (২৪)।[৩০] — এখানে দ্বিতীয় পংক্তিতে

ব্যবহৃত 'কইসে' শব্দটি মিশ্রবৃত্ত রীতির কলমাত্রা গণনা পদ্ধতি অনুসারে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে দুইমাত্রা খরতে হবে। নইলে মাত্রাসমতা ক্ষুণ্ণ হয়। পদবন্ধটি হোল আট - আট - বারো (৮।।৮।। ১২।)-র দীর্ঘ ত্রিপদী। চতুষ্কল পর্বিক চৌপদীবন্ধের পদও বিদ্যাপতির পদাবলীতে লক্ষিত হয়। বত্রিশ মাত্রার পংক্তিতে সমমাত্রিক পদমাত্রাবিভাজিত পদটি হোল —

উধসন কেশ পা স ।। নখ পদ সুন্দর
লাজে গুপুত হাস ।। পীন পয়োধর
রজনী উজা গরে।। কনকসম্ভুজনি
মুখ ন উজলা। কেশ পুজলা।। (৩)।

এখানে পদমাত্রাবিভাগ আট - আট - আট - আট (৮।। ৮।। ৮।। ৮।) ক্রমে। দীর্ঘ ছন্দো-তরঙ্গের সঙ্গে পদটির পদান্ত মিলের ধ্বনিস্পন্দনও উল্লেখযোগ্য।

প্রত্ন-কলাবৃত্ত ছন্দোরীতি ছাড়াও বিদ্যাপতির পদাবলী গানে একধরণের মিশ্ররীতির ছন্দেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে প্রাচীন রীতি-অনুযায়ী অক্ষর ও মাত্রা—দুই ভাবেই ছন্দ-মাত্রা - গণনা করা যায়। তবে প্রাচীন স্বরান্ত উচ্চারণ, ও, যুক্তবর্ণের পূর্ব অক্ষরের দীর্ঘউচ্চারণ, শব্দারম্ভে ও শব্দমধ্যে একমাত্রার মর্যাদা ও শব্দপ্রান্তিক রুদ্ধ অক্ষরের দুই কলামাত্রা হিসেবে গণনা করা হলে সম্ভবত প্রাচীন অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্তেরই রূপাঙ্গিক পাওয়া যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—

35

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে
আজু কি হোয়ল ধন্দ।
চপলে কাঁপল জনু জলধর
নীল উতপল চন্দ।।[৬১]

উপরোক্ত পদটিতে যুক্ত ব্যঞ্জনের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে এককলামাত্রা ধরলে, ষান্মাত্রিক পর্বের কলাবৃত্ত রীতি পাই। যথা—ছয় - ছয় - আট (৬।৬।৮।)। আবার আধুনিক দলবৃত্ত ছন্দের হিসেবে ধরলে দলমাত্রাবিভাগ হয় ছয় - ছয় - আট (৬।৬।৮।) বদ্ধ। তবে, মিশ্রবৃত্ত ছন্দোরীতির উচ্চারণ পদ্ধতি ও মাত্রগণনায় এটি ত্রিপদীবন্ধের (লঘু) মর্যাদা পায়। এক্ষেত্রেও পদবিন্যাস— ছয় - ছয় - আট (৬।।৬।।৮।)। এটি প্রাচীন অক্ষর সংখ্যাত ছন্দেরই কাছাকাছি বলে ধরা যায়।

নিম্নোক্ত পদটিতে দলসংখ্যার গণনাক্রমে দলবৃত্তরীতির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যথা —

নমিত আলোকে বেঢ়লা মুখ কমল সোভে।
রাহুক বাহু পরসলা সসিমণ্ডল লোভে।। (১৬৮)[৬২]

দলবিন্যাস ক্রমে পর্ববিভাগ এখানে নয় - সাত (৯।৭।) মাত্রায়। আবার, কলাবৃত্ত রীতিতে এটিকে ছয় - পাঁচ - পাঁচ - চার (৬।৫।৫।৪।) পর্বমাত্রাভাগে পাঠ করা যায়। প্রাকৃত নরেন্দ্রবৃত্ত ছন্দের আঁচও বিদ্যাপতির পদে পাওয়া যায়। যথা—

সাঁঝক বেরি। উগল নব সসধর।
ভরমে বিদিত সবিতাহু।
কুন্তল চক্র । তরাসে নু কা.এ ল।
দুর ভেল হেরথি রাহু।। (২৯৯)।

এখানে কলাবৃত্তের দীর্ঘত্রিপদী বন্ধের আট - আট - বারো (৮।।৮।।১২।)-র পরিবর্তে পর্ববিভাগ হয়েছে সাত - নয়- বারো (৭।৯।১২।) মাত্রার হিসেবে। এটিও বিদ্যাপতির মৌলিক প্রয়াস।

১১১ সংখ্যক পদটিতেও সম্ভবত জয়দেবের[৬৩] প্রভাব পড়ে থাকবে। পাঁচ পর্বমাত্রার পদ হিসেবে এটি উল্লেখযোগ্য। যথা—

খ নরি খ ন। মহঘি ভই।
কিছু অরুন। নয়ন কই।
কপটে ধরি। মানসম্মান লেহী।
কনক জয়ঁ। পেম কসি।
পুনু পলটি। বাঙ্ক হসি।
আধি সয়ঁ অধর মধু পান দেহী।।

কলাবৃত্ত রীতিতে ছন্দোবিভাগ ৫।৫।৫।৫।৫।৫।৪। পর্বমাত্রায়। অথবা ১০।।১০।।১৪। দীর্ঘত্রিপদীবন্ধে। সেক্ষেত্রে 'মানসম্মান' বা 'পান' শব্দগুলি সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে যথাক্রমে পাঁচ (৫) মাত্রা ও একমাত্রা ধরতে হবে। আবার দলসংখ্যার হিসেবে হলন্ত উচ্চারণে পর্ববিভাগ হয় ৪।৪।৪।৪।৪।৪।৩। বা ৮।।৮।।১০। মাত্রার ত্রিপদীবন্ধে।

নিম্নোক্ত পদটিতে ও ছন্দোনির্ণয় দুরুহ হয়ে পড়ে। কেননা তা যুগপৎ মিশ্রবৃত্তের এবং দলবৃত্তের রীতি মানতে পারে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এটি মিশ্রবৃত্ত না দলবৃত্ত? একটা কথা অবশ্য বিবেচ্য যে, আধুনিক সিলেবল (দল) ধারণা বিদ্যাপতির যুগে অস্পষ্ট ছিল কিনা। পদটি হোল —

মলয় পবন বহ। বসন্ত বিজয় কহ।।
ভমর করই রোল। পরিমল নহি ওর।। (২১৮)

এখানে মিশ্রবৃত্ত রীতিতে আট (৮) মাত্রার পংক্তি, দলবৃত্ত রীতিতেও আট (৮)টি দলের পংক্তি। কিন্তু মিশ্রবৃত্ত একপদী ছন্দ বিরল, সেক্ষেত্রে এটি (৩। ৩। ২।) ত্রিদল পর্বের দলবৃত্ত বলা যেতে পারে। যদিও দলবৃত্তছন্দ সাধারণত চতুর্দল পর্ববিশিষ্ট হয়।

বিদ্যাপতির অলংকার প্রয়োগ

কবিতার ভাষা তথা কবিভাষার ক্ষেত্রে অন্যতম মুখ্য উপাদান হলো কাব্যের অলংকার। কাব্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠাকল্পে বা কাব্যের রূপ এবং ভাবজগতের সঙ্কেত সৃষ্টিতে কবি তা ব্যবহার করেন। বিদ্যাপতির বৈষ্ণবপদের কবিভাষা আলোচনাতে ও অলংকারের ব্যবহার ও প্রয়োগ বিশ্লেষণ বাঞ্ছণীয়। সর্বোপরি কবিভাষার মাধ্যমে কবির ব্যক্তিত্ব পরিচয় বা কবি মানসের ইঙ্গিতও প্রস্ফুট হয়।

অলংকার রচনার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি যেমন পুরাগত বা প্রথাগত অর্থাৎ সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য শিল্পশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত এবং ঋণ স্বীকৃত হয়েছেন, তেমনি প্রথা প্রভাবকে আত্মসাৎ করে রচনার মধ্যে আপন সৃষ্টি চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছেন। প্রতিভাধর কবির মতো বহুতর নবনব উপাদানের স্বাক্ষরে পদাবলীর রূপে ভাবে এনেছেন মৌলিক কল্পনা। প্রথাস্মৃতি ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেছেন আপন রূপজগৎ। যদিও বৈষ্ণব পদাবলীর জগৎ, আমরা জানি, রাধাকৃষ্ণের প্রণয় লীলার অবিস্তীর্ণ প্রয়োগ ভূমিতেই সীমাবদ্ধ।

কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেন আত্ম সমীক্ষার রূপচিত্র। এবং পাঠককে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির সাগর সঙ্গমে উপস্থিত করেন কাব্যে ব্যবহৃত অলংকার রূপচিত্র ভাষা আশ্রয়ে। অর্থাৎ, কবি যেমন তাঁর অনুভূতিকে স্পষ্টতর করে তুলে ধরেন কখন ও প্রকৃতি বা নিসর্গ চেতনার চিত্র প্রয়োগে, কখনও বা পার্থিব আসবাবের মাধ্যমে তেমনি পাঠকের অনুভূতিও স্পষ্টতর রূপাবয়ব প্রাপ্ত হয় সেইসকল উপমা অলংকারচিত্র প্রভৃতির আবেদনে। শরীরের বাহ্য সৌন্দর্য ছাড়াও তার অন্তর লোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবগুলির সাক্ষাৎ পাই তার মাধ্যমে।

বৈষ্ণব কাব্যের মুখ্য চরিত্র রাধাকৃষ্ণের অঙ্গরূপ বর্ণনায় কবি ব্যবহৃত উপমান বস্তু বা চিত্র সৃষ্টির মূল উৎস প্রধানত সংস্কৃত গ্রন্থ। রাধার অনিন্দ্য সুন্দর-মুখের উপমা চিত্রে বারে বারে এসেছে আকাশের চন্দ্র নানা ভঙ্গিতে মুখকান্তির পূর্ণ সৌন্দর্য প্রকাশে এই চাঁদ হয়েছে 'পরিণত সসি' (৩১) [৩৪] বা পূর্ণচন্দ্র। কখনও 'পুনিম সসি' (৩২) অর্থাৎ পূর্ণিমার চন্দ্রের মতো। চন্দ্রের থেকেও রাধার মুখশোভা উজ্জ্বল তাই উপমান চন্দ্রের গরিমা হ্রাস করে বলা হয়েছে চাঁদ কলঙ্কা' (৩৮৮) রাধার বিরহ তাপিত মলিন মুখচিত্রের মাধুর্যে কবি কল্পনা করেছেন 'পুনিমি ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর। সে ভেল অবসসি রেহা' (৭৩৫) বা প্রতিপদের রেখায়িত চন্দ্র কিংবা 'খিন দিবসক চন্দা' (১৮৪) বা দিবসের অগৌরবের ক্ষীণ চন্দ্র। আর কৃষ্ণকে দেখার অছিলায় বসন মুক্ত আধোমুখের চিত্রাঙ্কনে কবির কল্পনায় এসেছে 'চাঁদ উগলি যেন আধা' (৪৭২) বা অর্ধচন্দ্র। প্রথম মিলন সমাগম জনিত সলজ্জ মালিন্যে রাধার মুখাবয়ব 'গহন লাগ...পুনিমকচন্দ' (৩৫) বা গ্রহণ কবলিত পূর্ণচন্দ্র স্বরূপ। কখনও কৃষ্ণকে অপনোদিত করা হয়েছে মুখকে 'রাহু তরাসে চাঁদ' (৫২) বা রাহুভীত চন্দ্র বলে। রাধা-মুখের উপমান হিসাবে কখনও কখনও পদ্মফুল বা কমলেরও ব্যবহার দেখা যায়। যেমন ৩০২ সংখ্যক পদে 'কমল বদনি রাহি'। উপমানের উপমান চিত্রে রাধার মুখ-চোখের বর্ণনায় কবি

সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন নতুন দৃষ্টিতে—'ইন্দু বদনি ধনি নয়ন বিলালা কমল কলিত আনি মধুকর মালা' (৩০৩) অর্থাৎ বিশালাক্ষী চন্দ্র বদনা ধনি যেন ভ্রমর মালাভূষিত পদ্ম। কোন কোন চিত্রে বিদ্যাপতি গতানুগতিক ধারা অতিক্রমও করেছেন—(৩৮৪) সংখ্যক পদে রাধার মুখ অমৃতের সার মিশ্রিত শুদ্ধ দুগ্ধে ভরা শর্করা তুল্য—'সাকর সুধ দুধে পরিপূরলসান অমিঅকসারে।' রাধা মুখকে অশেষ গৌরব দান করা হয়েছে 'তিমিরারি' (৩৩৫) বলে।

মুখের সঙ্গে চোখ কেশ ইত্যাদি জড়িয়েও বিদ্যাপতি একাধিক চিত্র উপমা নির্মাণ করেছেন। মুখ ও নয়নের উপমাগুলির মধ্যে আছে চন্দ্রচকোর (২১) চন্দ্র কমল (২৪, ২৬৮) কমল খণ্ডন (৩০, ৩৭ ইত্যাদি), মুখের সঙ্গে রেখা মিলিয়ে চন্দ্র অন্ধকার (২৭, ৬৬, ২২৮, ৪৩৪ ইত্যাদি), চন্দ্র রাহু (২৫, ১৬৮, ৩৪০, ৪৯৬, ৪৯৭, ৫১২, ৫৪৬ ইত্যাদি) কমল ভ্রমর (২৫, ২৩৭, ৩০৩, ৩২৭ ইত্যাদি) এবং চন্দ্র মেঘমালা (৬১৭) প্রভৃতি চিত্র যুগ্মক। একাধিক অঙ্গ চিত্রের সঙ্গে মুখের মাধুর্য্যেও বহু চিত্র নির্মিত দেখা যায়। যথা—মুখ নয়ন কেশের একত্র চিত্রনে কবির বিস্ময় 'চিকুরনিকর তম সম পুনু আনন পুনিম সসী নয়ন পঙ্কজকে পতি আঅব এক ঠাম রহুবসী' (৩২) পুর্ণচন্দ্র পঙ্কজ আর অন্ধকার কিরূপে একত্রে অবস্থান, তেমনি মুখ নয়ন কাজল রূপে কমল অঞ্জন—ভুজঙ্গিনী চিত্রিত, মুখ, অধর, দন্তরাজি হয়েছে পদ্ম-প্রবাল পল্লব ও কুন্দ পুষ্প (২৩৯) কবি চন্দ্র সূর্য অন্ধকারকেও প্রেক্ষাপটে এনেছেন। অবিশ্বাস্যভাবে মুখ সিন্দুর বিন্দু ও বেশ কেশাভারের উপমায়। 'সুন্দর বদন সিন্দুর বিন্দু সামর চিকুর ভার। জনি রবি সসী সঙ্গহি উজল পাছু কএ অন্ধকার (২৩) । মুখের সঙ্গে কুচ চিত্রে কবি এনেছেন চন্দ্র ও সুমেরুকে (২৬৬)—এখানে দেখা যায় রাধার চাঁদ মুখ সুমেরু পর্বতরূপ কুচযুগে আশ্রয় নিয়েছে রাহুভীত হয়ে। আর রাহুকে এখানে রাধার বিরহ যন্ত্রণার মূর্তি দিয়ে কবি মৌল কল্পনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। মুখের সঙ্গে হাসি হয়েছে শর ও চন্দ্রসুধারস (১৩৩, ৫৩১), মুখ ও তিলক, চন্দ্র ও কলঙ্ক (৯৬, ৯৭, ৩১২), মুখ ও ঘর্ম এই যুগ্মোপমায় কবি অতিশয়োক্তি অলঙ্কার মাধ্যমে এনেছেন স্বর্ণকমল ও মুক্তপার চিত্র, আবার বসনাবৃত্ত মুখের চিত্রে কবি এঁকেছেন মেঘাবৃত চন্দ্রের (৫৯) অপূর্ব সৌন্দর্য।

রাধার চোখও কবি কল্পনায় বিচিত্র সৌন্দর্য লাভ করেছে। চোখের প্রথাগত বিশিষ্ট উপমানগুলির মধ্যে আছে 'দুই হি ভোমরা' (৪) বা কালো ভমর, 'সারঙ্গনয়ন' (২৫) বা হরিণের মতো চঞ্চল চোখ, 'মোহন শর' (৪১) ইত্যাদি। নতুনত্ব সঞ্চারিত হয়েছে কবি যখন নয়নের নির্মলতা বা স্বচ্ছতার সঙ্গে গভীরতা দান করেছেন তাকে দুধে ধোওয়া ভ্রমর (দুধক ধোএল ভমরা, ৯৭) আখ্যা দিয়ে। উৎকর্ষতায় চোখের কাছে 'নব অরবিন্দা' ও (৯৫৪) ম্লান হয়ে গেছে। আর একটি পদে নয়নের দৃষ্টিতে আকুল ভাবচিত্র কবি এঁকেছেন, কৃষ্ণ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় রাধার নয়ন বহুদূর পর্যন্ত গেল। যেন নয়ন রূপ দিনমনি বদনরূপ কমলকে অস্তাগমে ত্যাগ করে যাচ্ছে। 'দরশনে লোচন দীঘর ধাব। দিনমনি তেজি কমল জনি জাব।।' (২৪০)। আঁখির সঙ্গে পাখির তুলনা করেছেন কবি ৬০৭ সংখ্যক পদে। 'আঁখি পাখি দুহু সমরি সোত্রল জনিত সবে বিকার' (৬০৭ নং) (আঁখি রূপ পাখি দুটি সব বিকার জেন শান্ত হয়ে পড়ল)।

কবি প্রকৃতির দোলায়িত (তরঙ্গ) (৬২৪ নং) এনেছেন সার্থক ব্যঞ্জনায়। জলের ঝাপট লাগা অঞ্জনহীন রক্তিম চোখ উৎপ্রেক্ষায় সূচিত হয়েছে—'সিন্দুর মণ্ডিতহনি পঙ্কজপাতা (৬২ নং)। আবার কৃষ্ণ প্রেমমুগ্ধা রাধার নয়ন 'সাঙন-ঘন' (৬৩২) বা শ্রবণের মেঘতুল্য।

নয়নের সঙ্গেই থাকে কটাক্ষ। রাধার কটাক্ষকে সাধারণত 'বান' (১৭) এবং মদন-শর (৬১৭)

রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ভ্রূর ভঙ্গিমা চিত্রনে ব্যবহৃত হয়েছে 'ধনুক' (১৭) কামদেবের জ্যা (২৭), নিশ্চল ভ্রূকে যুদ্ধ জয়ী কামদেবের বিশ্রাম শায়িত ধনুক বলা হয়েছে ২৯৮ সংখ্যক পদে। আবার বৃদ্ধদশায় অক্ষম ভ্রূর চিত্রকল্পে বিদ্যাপতি দেখেছেন কাশ ফুলের শ্বেতাভা বা 'ছোর কী খোরকী মোহ হবিভছল বনফুলি গেল কাসী' (৬০৭)।

রাধার কমল-নয়নের বৈচিত্রপূর্ণ লীলাবিলাস অন্য অঙ্গের সহায়েও সৃষ্টি হয়েছে একাধিক চিত্রকল্পের একত্র উপস্থিতিতে। তালিকার সাহায্যে দেখানো যেতে পারে এর ব্যবহার—

নয়ন ও অশ্রু — কমল-মধুরাধা (১৮৪)
চকোর অমৃতধারা (২৪৬)

নয়ন ও কাজল - অরুণ কমল-ভ্রমর (৯৩২) এখানে উৎপেক্ষা প্রযুক্ত। এই অলঙ্কারের সাহায্যে কবি সংশয়ান্বিত যে, 'কাজরে রঞ্জিত ধবল নয়ন বর। ভ্রমর মিলল জানি অরুণ কমল দল' (৯৩২)। অন্যত্র দেখা যায় 'চকোর ও ফাঁসের' (৬২৩) উল্লেখ। মিশ্র চিত্রের নয়ন - কাজল - কটাক্ষ একত্রিত হয়েছে খঞ্জন-ফাঁস-গুণ-তীরে (৩৩৫)। রাধার নয়নের মতো কৃষ্ণের নয়নও হরিণের মতো এবং নাসিকা শুকপক্ষী (২৬) তুল্য। এ ছাড়া ভ্রূ কাজল ও কটাক্ষের মিলিত রূপচিত্রে 'ধনুক-গুণ ও বাণের (১৭, ৩০৯) প্রয়োগের মাধ্যমে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যায়। রাধিকার প্রেমালিপ্সা নয়নের ভঙ্গিতে উল্লসিত হয়ে ওঠে ভাবসম্মিলনের ৫৬৪ সংখ্যক পদে। নয়নকে চন্দ্রের পূর্ণতা দান করে কবি, প্রেম সমুদ্রের যে উচ্ছলতার চিত্র এঁকেছেন তার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য অপরিসীম।

ভারতীয় রমণীদের কেশ গৌরব কবি সাহিত্যিকদের হাতে বিশেষভাবে প্রসারিত হয়েছে। রাধার ঘনকৃষ্ণ কেশভারের সৌন্দর্য নির্ণয়ে কবি উপমিত করেছেন 'ঘোর অন্ধকার' (২৩), 'রাহু' (২৫), 'চামর' (৬১৭) প্রভৃতির সঙ্গে। ৭২৭ সংখ্যক পদে ম্লানরতা রাধার কেশ নিঃসৃত জলবিন্দু কবির চোখে 'চামরে গলয়ে জনি মোতিম হারা' অর্থাৎ চামরে মুক্তাহার ঝরে পড়ার মতো উদ্ভাসিত হয়েছে। কৃষ্ণের কুঞ্চিত চূড়াবদ্ধ কেশ বর্ণনার মধ্যে ৬৩০ সংখ্যক পদে 'সাপিনি'র উপমা দেখা যায়।

পয়োধর বর্ণনার ক্ষেত্রেও বিচিত্র উপমার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য আগের মতো প্রথাচিত্রই বেশি। কুচ যুগের উপমাগুলির মধ্যে 'কমল কুড়ি', (৫) 'হস্তীমস্তক', (১৯) 'হিমগিরি' (২০), 'সুমেরু' (২৪), 'শ্রীফল বা বিল্বফল' (৩৩), 'ঘট' (৬১৩), 'গিরিবর' (৬২৩), 'কাঞ্চন গিরি' (৩৮) ইত্যাদিই পৌনপনিক ভাবে ব্যবহৃত। লৌকিক উপমারূপে কুচরূপ 'ভেলা' (১২৮) দেখা যায়। কবির দৃষ্টি ভঙ্গিতে ঐতিহ্যের মধ্যে নতুনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ৬২৭ সংখ্যক পদে এখানে অতিশয়োক্তি অলংকারের মাধ্যমে রাধার সিক্ত বসনাবৃত স্তনযুগল তুষারাচ্ছাদিত স্বর্ণ বিল্বফলের সৌন্দর্য মহিমা লাভ করেছে।

স্তনযুগলেরও যুগ্ম চিত্রকল্পের বহু স্বাক্ষর পাওয়া যায়। তালিকাবদ্ধ করে এর পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

কুচ ও কেশ : কমল কোষ ও সর্পিনী (২৬৫)
কাক ও কৃষ্ণ সর্পিনী (৪৯৬)
স্বর্ণ শম্ভু ও চামর (৬১৭)
স্বর্ণ গিরি ও চামর (৭৪৭) ইত্যাদি।

কুচ ও কেশ	:	কন কলস ও দুগ্ধ ধারা (৪৯৭) স্বর্ণশিব ও গঙ্গাধারা (৩০, ৬২৩) কণকাচল ও জলধারা (৪০) ইত্যাদি।
কুচ ও নখরেখা	:	মেরুশিখর ও নবশশধর (৩, ৫১, ১৩৯ প্রভৃতি) শিব ও চন্দ্ররেখা (২১৩, ২৯৭ প্রভৃতি) কমল ও দ্বিতীয়ার চন্দ্র (২৬) শ্রীফল ও কিংশুক কুঁড়ি (৭৭) ইত্যাদি।
কুচ ও করতল	:	কণকাচল ও কমল (৬৬, ১৮৬ প্রভৃতি) শ্রীফল ও কমল (১৭৭) কলস ও নব পল্লব (২৯৬) স্বর্ণকমল ও নবপল্লব (২৯৬) বিদ্যুৎপাত ও ঢাকনা (৪৮৮ ইত্যাদি)
কুচ ও তনু	:	যুগল গিরি ও কণকলতা (৩২, ২৩২ প্রভৃতি) মেরু ও দ্রোনলতা (২৩ ইত্যাদি)
কুচ - চন্দন - হার	:	শঙ্কর - শম্ভু ও গঙ্গধারা (৩৮)
কুচ - কর - নখাঙ্গুলি	:	কণকশম্ভু - পঙ্কজ ও চন্দ্র (৩৯)
কুচ - অধর - বেণীবন্ধ	:	কণকগিরি - প্রবাল - কাল নাগিনী (২৪৬)।

দেখা গেল কুচ তথা পয়োধরের অসংখ্য চিত্র, যুগ্মচিত্র বা মিলিত চিত্রের মধ্যে গতানুগতিক অনুকরণই বেশি। পয়োধরকে শিবলিঙ্গের চিত্রদ্যোতনা দান করে কবি অনেক স্থলে কামনার মধ্যেও ধর্মবোধ আরোপ করে ভারতীয় আধ্যাত্মচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। ৩৮ সংখ্যক পদে তাই নির্দ্বিধায় কুচযুগকে শঙ্কর, চন্দন প্রলেপকে শঙ্করের অঙ্গভস্ম ও কণ্ঠহারকে শিবের মস্তকস্থ গঙ্গাধারা বলেছেন কবি, 'চন্দন চরুচ পয়োধর গৃম গজ মুকুতা হার ভসমে তরল জানি শঙ্কর সির-সুরসরি জলধার।' এক্ষেত্রে কবি কুমারসম্ভবের[৩৫] শ্লোক দ্বারাও প্রভাবিত —

'তস্যাঃ স কণ্ঠে পিহিতস্তনাগ্রংনবও মুক্তাফল হারবল্লীম।
যা প্রাণমেরু দ্বিতয়স্য মূর্দ্ধিস্থিতস্য গঙ্গোষ যুগস্য লক্ষ্মীয়।।'

৪৮৮ সংখ্যক পদে অভিনবত্ব দেখা যায় যখন কৃষ্ণ পরিরম্ভিত রাধিকার স্তনালিঙ্গন নিবারণ প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতার চিত্রকল্পের জন্য কবি ব্যবহার করেছেন সূক্ষ্মরূপ ঢাকনা ও বিদ্যুৎপাতের সার্থক উপমা। কুচরূপ পুজার কলসে হস্তরূপ নবপল্লবের রূপকর্মেও (২৯৬) কবির স্বকীয়তা লক্ষণীয়।

'শৈবাল' (২৭) এবং তার কোমলতা ও দৃঢ়তা সঞ্চারে কবির নতুন সংযোজন নীল পটোর আনি অতিসে সুদৃঢ় জানি জতনে সিরিজু রোমরাজি' (২৪)। অর্থাৎ সূক্ষ্ম সুদৃঢ় নীল রেশম সুতার ন্যায় রোমরাজি।

রাধার সমগ্র অঙ্গরূপের বর্ণনাতেও বিদ্যাপতির চিত্রপ্রতীক ব্যবহারের উৎকর্ষতা দেখা যায়। এখানেও তিনি সংস্কৃত ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন। রাধার দেহের সামগ্রিক (তনু) উপমায় এসেছে 'দ্রোণলতা' (৮০) কখনও বা 'মৃণাললতা' (৪)। রাধার সুকুমার কোমল তনুর প্রতিষ্ঠায় কবি উপমান হিসেবে বহুবার ব্যবহার করেছেন 'শিরিষ ফুল' (৮০, ২৭১, ২৮৯, ৬২৭)। এখানেও কুমার সম্ভবের[৩৬] প্রভাব লক্ষণীয় —

'শিরীষ' পুষ্পাধিক সৌকুমার্য্যে বাহুতদীয়াবিতিমে বিতর্ক।' সময়ান্তরে রাধার দেহ বিদ্যুতের রেখার মতো সুন্দর কিন্তু বিচ্ছেদক্ষীণা, মিলনকুঞ্জে সমুপস্থিতা শ্বেতাম্বরী-রাধার উৎকণ্ঠিত আগমনের চিত্রকল্পে পবন গতি তাড়িত পাতলা মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্রের (৬৩৭) দ্যোতনায় কবির চিত্র নির্মাণ ক্ষমতার পরিচয় স্পষ্ট। আবার কুলবতী-রাধার কৃষ্ণ প্রেমাসক্তিহীন স্থির প্রতিজ্ঞ, নীতিরূপ ভাবলেশহীন পবিত্র তনুর উপমায় দূতীর চোখে প্রতিভাত হয়েছে পটে আঁকা ছবির (৪৭) চিত্র। বিদ্যাপতির নিজস্বতার মধ্যে রাধার তনু বর্ণনার উপমায় 'ভ্রমরী'র (৯২) প্রয়োগ অভিনব। এক্ষেত্রে মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের ন্যায় কালির মধ্য দিয়ে রাধার অভিসার যাত্রা লক্ষ্যে পৌঁছনোর উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় ভ্রমরীর উড্ডীয়মান মিলনের আঙ্গিকে চিত্রিত। রাধার দেহ-তনু, ৩১ সংখ্যক পদে 'গাথা ফুলমালার'র ন্যায় সৌন্দর্য সৌরভ মণ্ডিত হয়েছে। মিলনভীতা রাধার মূর্তিকে কাঠিন্য দান করা হয়েছে। 'স্বর্ণপ্রতিমা' (৫৭) আখ্যা দিয়ে। আর বিরহ দহনে জরজর শীর্ণা রাধা যেন ক্ষীণ 'সুতার' মতো (১৮৫)।

দেহরূপের বস্তুধর্মের কয়েকটি উল্লেখ্য চিত্ররচনা নির্দেশ করা হল। এখন দেহের গুণধর্ম বিষয়ে নায়ক-নায়িকার অঙ্কিত অলংকার গুলির বিশ্লেষণ করা যায়। কবি রাধার বচনের মধ্যে শোনাতে চেয়েছেন 'কোকিল স্বর' (৩০) বা 'অমৃত' (১১৩) নিঃসরণ, আর বচনের সঙ্গে 'মধুর' উপমাও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় 'মধু সম মধুরিম বাণী রে' (১৩৭ নং)। কৃষ্ণের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় বচন হয়েছে। 'পাষাণে অঙ্কিত রেখার' (১৪০) মতো ঋজু কঠিন, বচনের সঙ্গেই মুখের হাসি-কান্নার অভিব্যক্তি। রাধার হাসির মধ্যে কবি দেখেছেন 'সুধাপ্রবাহ' (২৬৮), 'চন্দ্রের আলোক দীপ্তি' (২৩০) বা জয়দেবের 'তিমির হর' স্মৃতি আশ্রিত 'কলঙ্ক হর'র (৬৯৬) রূপকল্প। তেমনি অশ্রুমুখী রাধার অশ্রুপাতকেও কবি দেখেছেন বিভিন্ন ভাবে। যথা—'ছিন্ন হারের মুক্ত পতন' (৪১১), বা 'কমল নিঃসৃত মধুধার' (১৮৪) কিংবা খঞ্জনের মুক্ত উদগীরণ প্রভৃতি। আবার ৭৩৫ সংখ্যক পদে নয়নের অশ্রুধারা শ্রাবণের বারিধারার বিরহচিত্রে সমৃদ্ধ। রাধার গতি ভঙ্গির কল্পনা চাতুর্য ও কবি উপস্থিত করেছেন ঐতিহ্যাশ্রয়ে। বহুক্ষেত্রেই 'গজগামিনীর (৬২২) প্রয়োগ লক্ষণীয়। কোথাও 'রাজহংসের' (৮৯) গতিও দেখা যায় কুমার সম্ভব[৩৭] আশ্রয়ে —

'সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী গতেমু লীলাক্ষিত বিক্রমেষু।
ব্যনীয়ত প্রত্যুপদেশ লুব্ধৈরাদিৎ সুভির্নুপুর শিঞ্জিতানি।।'

কামতাড়িত রাধার শীঘ্রগতির চিত্রায়নে অশরীরী পবনের গতিবেগ[৩৮] আরোপণে কবির সূক্ষ্ম মনোভঙ্গি উপস্থিত (৯২)। কৃষ্ণের হৃদয়ে তীব্র প্রণায়াবেগ সম্পাত করে রাধার ক্ষণে দৃষ্ট ক্ষণে অদৃশ্য হওয়ার গতিশীল চিত্র কল্পটির সার্থক রূপায়ণে কবি মেঘমালার মধ্যে বিদ্যুতের ক্ষণ অস্তিত্বের (৬২৪) বোধ-চিত্রটিকে মিলিয়ে দিয়েছেন সূক্ষ্ম ভাবে।

বিদ্যাপতির চিত্রকল্প সৃষ্টি

দেহের বস্তুধর্ম-গুণধর্মের মতো বিবিধ মনোধর্ম বা ভাবধর্মেরও অনবদ্য চিত্ররূপ উপস্থিত করেছেন বিদ্যাপতি তাঁর বৈষ্ণব পদাবলীতে। রাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক প্রণয়াবেগের ভাবচিত্রের মূর্ত সম্পর্ক প্রকাশিত হয়েছে 'ভ্রমর-কমল' (৭২৫ নং পদ), 'ভ্রমর-মালতী' (৪৬), 'সূর্য-কমল' (১৫), 'চন্দ্র-কুমুদ' (৪২৬), 'স্বর্ণ-মোতি' (৪২৬), 'জল-মীন' (৪৬২), 'ফুল' (৪৪১), প্রভৃতি বস্তু উপাদানের উপস্থাপনায়। কবির মৌলিক কল্পনাদৃষ্টি রাধাকৃষ্ণের সন্নিষ্ঠ প্রেমের অবিচ্ছেদ্য ইঙ্গিতকে রূপায়িত করেছে এই উপমা চিত্রে —

ধীর নীর সম ন হেরলুঁ নেহ।।(৭৫৯)

এখানে প্রেমের সম্পৃক্তি-উপমিত হয়েছে দুধ ও জলের অবিমিশ্র মিশ্রনের সঙ্গে। প্রেমের টান যে কত প্রবল ও তা যে ঘটনার যোগসূত্রে কত বৈচিত্র লাভ করে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি ৪৪৩ সংখ্যক পদে। প্রেমের টান এখানে আকাশের মেঘ গর্জন এর সঙ্গে পর্বত শিখরে ময়ূরের আনন্দনৃত্যর সাহায্যে উপস্থিত। স্থানের দূরত্ব এখানে মনের দূরত্ব হয়ে ওঠেনি। বিদ্যাপতি ছিলেন রাজসভার বিদগ্ধ নাগরিক কবি। তাই প্রেমভাবনার ক্ষেত্রে নাগরিক তথা বিদগ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁর লেখায় পাই। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শ্লেষাঘাতে নাগরিক, কৃত্রিম প্রেমকে বিদীর্ণ করেছে। প্রেমের মতো গভীর, কোমল ও মধুর সম্পর্ককে কটাক্ষ করেছেন 'পোঁ আ পিবই কাঁহা কুসুম মকরন্দ' (৭৮) অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ কীট রাধারূপ কুসুমের প্রেমরূপ মকরন্দ পান করবে কি করে? —এই মন্তব্য করে। অথবা 'মন্দাবান্দর মুহ সোভ ন পান' (৪৯৮), 'বানরের মুখে কভু না সোভই পান' (৭৮), 'বানর গলে কাঁহা মোতিম মাল' (৭৮) অর্থাৎ বানরের মুখে পান এবং বানরের গলায় মুক্তমালা মানায় না—এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গক্তির সাহায্যে। প্রেম সম্পর্কের মধ্যে এখানে অশ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে। সম্ভবত সমসাময়িক রাজসভার কুরুচিপূর্ণ প্রেম সম্পর্কই এর কারণ। প্রেমের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার চূড়ান্ত উপমা কবি উপস্থাপিত করেছেন ৫৫৭ সংখ্যক পদে —'খত কুমেঢ়া সন বুঝল সিনেহ'—অর্থাৎ প্রেম পচা কুমড়োর মতো হয়ে যায় বেশি পেকে গেলে। বাংলা সাহিত্যে প্রেমের এই রকম দৈনন্দিন বস্তু চিত্রের কল্পনা সুদুর্লভ। কৃষ্ণের স্বার্থকরী প্রেম রাধার কাছ 'কণ্টক সম' (৫৫৭) বোধ হয়েছে।

প্রেমের উপরোক্ত হালকা, অগভীর, ব্যর্থ চিত্রোপস্থাপনায় ধিকৃত অবজ্ঞা প্রকাশিত হতে দেখি। আবার প্রেম সম্পর্কের অতলান্ত গভীরতার দিকটিকেও কবি চিত্রময় করেছেন। যথা— প্রেম যেন 'কূপক পানি অধিক হোঅ কাটি'—(৪৩১) অর্থাৎ কূপের জল যা খনন করলে ক্রমশ বেড়ে ওঠে।। চন্দ্রকলার দিন প্রতি বৃদ্ধির মতো প্রেমেরও ক্রমপূর্ণতা ঘটে—'দিনে দিনে বাঢ় এ সুপুরুষ নেহা। অনুদিনে জৈসন চান্দক রেহা।।' (৪৫০) প্রেমের স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে এই চিত্রনির্মিতিতে যখন অবগাহনের মাধ্যমে সরোবরের অর্থে জলরাশির গহন গাম্ভীর্যে কবি একে ব্যক্ত করেছেন —'বুঝল সবে অবগাহী। সুতে সরবর খাহী' (৪২৬)। প্রেমের পরীক্ষা করার জন্য রাধাকে বলা হয়েছে 'কণক জয় পেম কাসি' (১১১) অর্থাৎ প্রেম হচ্ছে কষিত স্বর্ণতুল্য। প্রেমের জৈব প্রয়োজন বোঝাতে একে 'সুখ মণ্ডল' (৪০৯) সুখের পায়রা বলা হয়েছে। এখানে প্রেমের স্বভাব ধর্মটি কবি সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন লোক অভিজ্ঞতার নিরীখে। প্রেমের তীব্র অনুরাগের গতি অনিবার্য। তা নিম্নগতি ধর্ম বিশিষ্ট জলের মতো। অর্থাৎ প্রেমের অনিবার্য গতির চিত্রোপমা হচ্ছে জলের নিম্নগতির তরলের ধর্ম। জলকে সযত্নে বেঁধে রাখলেও তার নিম্নগতি ধর্ম রোধ হয় না তেমনি প্রেমের গতিও রুদ্ধ করা যায় না কোনভাবে—'জই তাও জতনে। বাঁধি নিররোধি তা। নিমন নীর থিরা এ' (৪৩)। প্রেম অন্ধ—বিচার না করেই প্রেমে অনুরক্ত হয়ে রাধা অনুভব করেছেন তা। প্রেমের ঢাকা কুয়োতে পা দিয়ে রাধা তাই তীব্র বেগে পতিত হয়েছেন—'কাঁপল কূপ। লখই না পারল। জাইত পড়লহু ধাই। (৬৪২)।

মাথুর বিরহের এই পদে দেখি —'জৌবন ভেল বন বিরহ হুতাশন (৭১৯)', অর্থাৎ রাধার যৌবনরূপ বিপুল অরণ্যে বিরহের হুতাশন জ্বলছে। প্রেমের জ্বালার এই চিত্রটি বিদ্যাপতির কবি স্বভাবের সবিশেষ ক্ষমতা নির্দেশ করে। বিরহের সর্বগ্রাসী দহন কবির চিত্তে 'বাড়বানল' (৭১৬)

এর স্মৃতি উদ্রেক করে। বিচ্ছেদের কালে রাধার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে। তিনি 'বিরহজরে' (৭৩৭) ক্ষীণ স্বর্ণরেখার মতো রোগা হয়ে গেছেন। বিরহের অসীম ব্যাকুলতার দ্যোতনা কল্পে, বিরহের অন্তহীন গভীরতা এবং এর বিক্ষুব্ধতার অন্তঃপরিচয় উদ্ঘাটনে কবি একে চিত্রায়িত করেছেন 'পয়োধি' (৭২৯) বা সমুদ্রের সাথে।

দেহের যৌব ধর্মের ক্ষেত্রেও বিদ্যাপতি বিবিধ উপমাচিত্র চয়ন করেছেন। রাধার অপার যৌবনের উপমা চিত্রায়িত হয়েছে 'বন' (৭১৯) এর সঙ্গে। কখনো যৌবনের দৃপ্ত অলঙ্কৃত ভাব চিত্রিত হয়েছে—'গজরাজের' (২৬) মত্ততায়। বা রাধার ভরা যৌবনের সংঘটিত অবস্থা—

'জউবন রতন তোর সো আধিন ককে ন
করসি দান' (২৬২)।—অর্থাৎ যৌবন রত্ন রাধার স্বেচ্ছাধীন, তা কাউকেই তিনি দান করেন না। যৌবনকে বাঁধের সঙ্গে তুলনীত করা হয়েছে ৪১০ সংখ্যক পদে। দেখা গেল, শুধুমাত্র শরীর সৌন্দর্য নয়। মনের বিবিধ ভাব ধর্ম প্রকাশের ক্ষেত্রেও বিদ্যাপতি বিচিত্র উপমাচিত্র সৃষ্টি করে তাঁর পদাবলীকে প্রভূত ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন।

সৌন্দর্যচিত্র ঃ শরীরের বিবিধ অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও শারীরাশ্রিত গুণ ও ভাবধর্মের পরিধির বাইরে, পদসৌন্দর্য সৃষ্টিতে কবির প্রকৃতি চেতনা বা নিসর্গ চিত্রকল্পনার পরিচয় সম্পর্কে প্রসঙ্গত আলোচনা প্রয়োজন।

৩৩ সংখ্যক পদে দেখি —
'তরু তলে ভেটল তরুণ কাহ্নাই।
নয়ন তরঙ্গে জনি গেলিহ সনাই।।' — বৃক্ষতলে কৃষ্ণ দেখলেন রাধাকে। সে দৃষ্টির ব্যাখ্যায় রাধার মনে স্নান দৃশ্যের কল্পনা উদ্ভাসিত। নয়নের দৃষ্টির আস্বাদ জলতরঙ্গে অবগাহনের স্মৃতিতে সিক্ত হয়েছে এক সুখকর অনুভূতির ব্যঞ্জনায়।

'চরণ জাবক হৃদয় পাবক —
দহই সব অঙ্গ মোর।' (৬২২)

কৃষ্ণের পূর্বরাগের এই পদটিতে দেখি রাধা গজগামিনী হয়ে চলেছেন। তাঁর অলক্তরঞ্জিত পদক্ষেপের গতিচিত্রের ব্যঞ্জনায় অগ্নিশিখার দারুণ দহন কল্পিত হয়েছে। রাধার আলতা পরা রাঙা পায়ের গতি কৃষ্ণের ব্যাকুল হৃদয়ে প্রজ্বলিত করেছে অগ্নিশিখার দহন। কবির চিত্রকল্পনা এখানে আধুনিক মনের সমযোগী।

বালিকা রাধার অপুষ্ট, অপরিণত প্রেমোপলব্ধির দ্বিধা পূর্ণ রস-সম্ভোগ চিত্রকে কবি চমৎকার উপমায় রূপায়িত করেছেন প্রেম সমৃদ্ধতার প্রতীকায়িত গভীরতম সাগরের অন্তহীন অতলতার বৈপরীত্যে রাধাকে স্থাপিত করে। যথা —

'সব রস তহি খনে চাহহ তাহি।
সাগর কওনে পত্রবেহী থাহি।।' (৫৮)

এবং কৃষ্ণের প্রতিও কবি 'কামাৎ ক্রোধহাভিজায়তে'র[৩৯] পরিণতির বিপক্ষে সার্থক চিত্রোপমা উপহার দিয়েছেন—'বদ্ধমুকুলের' সঙ্গে 'পরাগের' (প্রেম উপলব্ধি জনিতরস) কার্য কারণ সূত্র গ্রথিত করে —

'মুন্দলা মুকুল কত এ মকরন্দ' (ওই)[৪০]

কৃষ্ণের মনোবিকারের তীব্র অবস্থা কল্পনায় বিদ্যাপতি উপস্থিত করেছেন সুন্দর চিত্র। স্মৃতিরূপ

ঘৃত অগ্নিরূপ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে উদ্ধত লেলিহান শিখায় তাঁর অনুরাগের মর্মজ্বালা প্রকটিত করেছে —

'জনি হুতবহ হবি আনি মেরাওল
তা সম ভেল বিকার।' (৪) —

আগুনের চিত্রকল্পনাকে কবি সুন্দর কাজে লাগিয়েছেন ১২৩ সংখ্যক পদে। রাধার অগ্নিতুল্য শিখাময়ী মান মনরূপ ভাণ্ডারে সংক্রমিত হয়ে হৃদয়ে নিদারুণ জ্বালা সৃষ্টি করেছে —

'আপন মান পাবক ভএ পইসল লুল এ মনভাণ্ডার।'

রাধা কৃষ্ণের প্রথম মিলনের রূপাঙ্কনে কবি পদ্মফুলের ওপর ভ্রমরের লুব্ধ কেলিবিলাসের চিত্র এনেছেন। রাধার অনভিজ্ঞ চেতনায় দ্বিধা ভয়ের সঞ্চার হয়েছে —

পিয়া সয়ঁ পহি লকি মেলী।
হোউ কমলকে অলি কেলী।।
তরতম তঞে কর দূরে। (২৭২)

পরকীয়া অভিসার গমন রাখার কুলরক্ষার পক্ষে সঙ্গত কিনা, আবার কৃষ্ণ-প্রেম স্মরণে তীব্র প্রেমার্তি—দুই বিরুদ্ধ দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত রাধার মানসিক বিক্ষেপটুকু উদঘাটিত করতে কবি চিন্তারূপ পঙ্কে নিমজ্জিত হস্তিনীকে রূপকায়িত করেছেন। রাধার অবস্থা —

অগমনে প্রেমকু গমনে কুল জাএত
চিন্তা পঙ্ক লাগলি করিণী।' (৩১৭) —

এখানে হস্তিনীর বিশালতা রাধার ব্যাকুল প্রেমাভিসারে আরোপিত। কিন্তু কুলরক্ষা বা কুল ত্যাগের দ্বিধাগ্রস্থ জটিল চিন্তাজাল এমনই পঙ্কিল যে রাধা অসহায়, —কোন খেই পাচ্ছেন না। তাঁর হস্তিনী সদৃশ দুর্দমনীয় ইচ্ছাও চিন্তাজালের পঙ্কে নিমজ্জিত। কবির মৌলিক সৃষ্টি ক্ষমতা এখানে লক্ষণীয়রূপ লাভ করেছে।

রাধার পক্ষে অভিসার গুরুতর হয়ে দেখা দিয়েছে। অভিসারের পথ অত্যন্ত দূর। রাধার মনে নেমে এসেছে হতোদ্যম উদ্বেলতা। অভিসারের দূর পথের দুরধিগম্যতায় রাধার অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে অন্ধকার গভীর রজনীর ছায়াচিত্র—যা তাঁকে উদ্যমহীন করেছে —

'লহুক এ কহলহ গুরু বড় ভাগ।
অন্তরভর রজনি দূর অভিসার।।' (৩২২)

এই চিত্রাঙ্কণে বিদ্যাপতি অপূর্ব কাব্যব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। এখানে রজনীর নীরন্ধ্র অন্ধকার রাধার অন্তরের ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে উদ্ভাটিত করেছে। অভিসারের সুন্দর চিত্রপ্রতীক ব্যবহার করেছেন কবি ২০৯ সংখ্যক পদে। এখানে রাধার অভিসার ব্যাপারটি তাঁর মনের বিস্তৃত দুরন্ত নদীর সঙ্গে তুলনীত। বিস্তীর্ণ দুরন্ত নদী পার হওয়া আর রাধার এপার থেকে ওপারে অর্থাৎ অভিসার করে কৃষ্ণ প্রেমের কাছে পৌঁছানো একই কথা—বিশাল চওড়া নদী পার হওয়া যেমন দুঃসাধ্য তেমনি কৃষ্ণপ্রেম লাভও দুঃসাধ্য। রাধার অভিসার ইচ্ছা মনের বিস্তৃত নদী পার হয়ে কৃষ্ণ-সান্নিধ্যে যেতে পারছে না। —

'সুন্দরি কওন পুরুষ ধন জ তোর হরল মন
জসু লোভে চলু অভিসার।।
আতর দুতর নরি সে কইসে জএবহতরি —

আরতি ন করিতা কাপ।' (২০৯)

বেশ কিছু পদে বিদ্যাপতি নদী বা সমুদ্রকে প্রতীক রূপে ব্যবহার করেছেন। ৪৯১ সংখ্যক পদে দেখি কৃষ্ণ কর্তৃক দীর্ঘ ও বলপ্রযুক্ত মিলনে পীড়িতা রাধা অত্যন্ত কাতর। এই ক্লান্তি কর সম্ভোগে রাধা ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন —

'সমুদ্র ওই সন নিসি ন পারি এ ঊর,
কখন উগত মোর হিত ভএ সুর।।' — অর্থাৎ দীর্ঘরাত্রি যেন সমুদ্রের মতন অসীম—শেষ হতে চায় না, কৃষ্ণের সম্ভোগ লালসাও ক্লান্তিহীন। রাধা ব্যাকুল হয়ে তাই সূর্যোদয় চাইছেন। অসীম সমুদ্রের সঙ্গে দীর্ঘ রাত্রির চিত্র কল্পনায় কবির অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। নিসর্গ প্রকৃতিকে সুন্দর ভাবে আরোপ করেছেন কবি ৪৯৫ সংখ্যক পদে। রাধার ঘন চিকুরস্থিত কুসুম বিপরীত মিলনের ফলে মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। যেন অন্ধকাররূপ কেশভার মিলনরূপ পূজাশেষে নক্ষত্ররূপ কুসুমগুলি ছড়িয়ে দিয়েছে। এই চমৎকার রূপচিত্রটিতে বিদ্যাপতির সৌন্দর্য সৃষ্টির পরিচয় ফুটে উঠেছে। আবার রজনী প্রেক্ষাপটে উদ্ভাসিত তারকাকুঞ্জ রাধার আলুলায়িত ঘনকেশে খোদিত কুসুমাবলীর সাদৃশ্য চিত্রে তাঁকে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে —

'কেশ কুসুম ছিরি আ এল পূজি।
তারা এঁ তিমির ছাড়ি হলু পূজি।।' — এখানে মিলনের মধ্যে পূজার পবিত্র ভাবটিকেও কবি উপস্থিত করেছেন।

রাধা বিরহের নিম্নোক্ত পদটিতে কবির বাস্তব জড় জগতের নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার পরিচয় ফুটেছে। রাধার ক্ষণে 'মাধব' আর ক্ষণে 'রাধা' ভাব প্রাপ্তিকে কবি উপমার সাহায্যে চিত্রায়িত করেছেন। দুই প্রান্ত প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত কীটের উভয় সংকটকালীন দুরবস্থার সঙ্গে রাধার ভাবটি তুলনীত। রাধার উভয় সংকটকালীন দুঃসহ যন্ত্রণাকে কবি অসামান্য চিত্রে তুলে ধরেছেন —

'দুহু দিশে দারুদহনে জৈসে দগধই
আকুল কীট পরান।
ঐ সন বল্লভ হেরি সুধামুখি
কবি বিদ্যাপতি ভান।। (৭৫১)

বিরহিনী রাধার মানসিক চিন্তাচ্ছন্নতার রূপকল্প নির্মিত হয়েছে জালবদ্ধ হরিণীর রূপকে। রাধার তীব্র মিলনাকাঙ্ক্ষা আর সামাজিক সীমাবদ্ধতা তাঁকে চিন্তারূপ জালে বদ্ধ হরিণীর মতো অসহায় করেছে —

'চিন্তা জাল পড়লি হরিণী সনি
কি করব বিরহিনি নারী।।' (৫১৭)

রাধা কৃষ্ণের মিলনের চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে তরু ও লতিকার সহাবস্থানের নিবিড়তা—

'ললিত লতা জনি তরু মিলতী।
তহ্নি পিঅ কণ্ঠ গহ এ জুবতী।।' (২০৮)

প্রগাঢ় আলিঙ্গনের রূপচিত্রনেও তরুবর লতিকার আশ্লেষণ ভঙ্গিমা গ্রহণ করেছেন কবি—

'তরুঅর বলি ধর ডারে জাঁতি।
সখি গাঢ় আলিঙ্গন তেহি ভাঁতি।।' (৪৭৭)

তবে এই চিত্রাঙ্কনে কবি কালিদাসের কুমারসম্ভব[৪১] দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হয়েছেন —

'লতাবধূভ্যস্তর বোহপ্যবাপুর্বিনম্র শাখাভুজ বন্ধনানি।।'

ঋতু চেতনা নিসর্গ, বা প্রকৃতি চিত্রোপস্থাপনায় অনেক পদে বিদ্যাপতির ঋতু সচেতনার পরিচয়ও পাওয়া যায়। নায়ক নায়িকার সৌন্দর্য চিত্রাঙ্কনের মতো প্রকৃতি সৌন্দর্য অঙ্কনে ও তাঁর প্রযত্ন নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতির নিবিড় রূপৈশ্বর্য বর্ষা, বসন্ত প্রভৃতি ঋতু মাধ্যমে তাঁর হাতে অসামান্য পরিমণ্ডল অর্জন করেছে।

ঋতু বসন্তের মাসে বিরহিনী রাধার মানসপট কবি তুলে ধরছেন উপমার চমৎকার চিত্রে—

'বিরহি বিপদ লাগি।
কেসু উপজল আগি।।'[৪২] (২১৮)

অর্থাৎ বিরহিনীকে বিপদগ্রস্ত করতে বসন্ত বিধাতা আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন কিংশুক ফুলে। এখানে বসন্ত ঋতুকে কবি বিশেষভাবে ব্যঞ্জনা দান করেছেন। বিরহিনীর অস্থির উন্মত্ততা বসন্তের ঋতু পটে চঞ্চল ভ্রমরের পুষ্পে পুষ্পে বিচরণের ইঙ্গিতে এক বাস্তব রূপসত্তায় শিল্প-সচেতনা লাভ করেছে এই পদটিতে —

'ফিরি ফিরি ভমরা উনমত বল।
কানন কানন কেসু ফুল।।
মোহি ভান লাগল কহঁও কাহি।
রিতু পতি বেক তাএ অসক সাহি।।' (২১৭)

জ্যোৎস্নাবিধৌত বসন্ত ঋতুতে প্রকৃতির অপূর্ব মিলনের অসামান্য নিশীথ চিত্রপট বিদ্যাপতি অঙ্কিত করেছেন নিম্নোক্ত পদে —

'লতা তুরু অর মণ্ডপজীতি নিরমল সসধর ধবলি এ ভীতি।।
পউঅঁ নাল অইপন ভলভেল রাত পরীহন পল্লব দেল।।
দেখহ মাই হে মন চিত লায় বসন্ত বিবাহ কাননথলি আয়।।' (২১৯)

লতা দ্বারা আচ্ছন্ন তরুবর যেন মণ্ডপকে জয় করেছে। নির্মল চন্দ্র উদয়ে চারিদিক জ্যোৎস্না উজ্জ্বল। পদ্মের নালে হয়েছে আলপনা, পল্লব যেন নিশীথ বস্ত্র দান করেছে, রাধা সখিকে বলেছেন যে বনস্থলীতে যেন বসন্তের বিবাহোৎসব লেগেছে। প্রকৃতির বিবাহ বর্ণনা করেছেন কবি এই ভাবে—

'মধুকরি রমনী মঙ্গল গাব দুজবর কোকিল মন্ত্রপঢ়াব।।
করু মকরন্দ হথোদক নীর বিধু বরি আতী ধীরে সমীর।।
কণক কিংসুক মুতি তোরণতুল লাবাবিথরল বেলিক ফুল।।
কেসর কুসুম করু সিঁদুর দান।।' (ওই) — অর্থাৎ এই বিবাহে, ভ্রমরীর গুঞ্জন যেন হুলুধ্বনি, কোকিলের কুহুরব যেন মন্ত্রপাঠ করাচ্ছে পুরোহিত রূপে। মধু যেন হস্তোদক নীর করল, চন্দ্র আর বসন্তের মৃদু সমীর হল বরযাত্রী। কণক বনের কিংশুক ফুলের গাছে নির্মিত হল তোরণদ্বার, আর বেলফুল বিকীরণ করল স্নিগ্ধ লজ্জাবেশ কিংশুক ফুল দান করল সিঁদুর। বিদ্যাপতি এখানে বসন্তের খুঁটিনাটি প্রকাশকে চমৎকার রূপসজ্জা দিয়েছেন। আর একটি পদে দেখা যায়, বসন্ত প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্তি মিলনের প্রেক্ষাপটে রাধার অন্তর্বিরহের তীব্র আর্তি —

'চৌদিস ভমর ভম কুসুমে কুসুমে রম

নীরসি মাজরি পিবই।
মন্দ পবন বহ পিক কুহু কুহু কহ
সুনি বিরহিনী কৈসে জীবই।।' (১৬৩)

এখানে দেখি, চারিদিকে ভ্রমর ভ্রমণ করছে এবং ফুলে ফুলে মধুপান করে বেড়াচ্ছে। ধীর বাতাস বইছে, কুহু কুহু রবে কোকিলের মিষ্ট গান শ্রুত হচ্ছে। বসন্তের এই মিলন প্রেক্ষাপটে রাধার ভাগ্যে বিরহের যন্ত্রণা ভোগ চলছে। ফলে তাঁর প্রাণ সংশয় দেখা দিয়েছে। একদিকে নিসর্গের চিত্র, অন্যদিকে বিরহের অন্তর্জ্বালা—কবি এই দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন উপরোক্ত পদে। বিরহের তীব্র জ্বালায় একদা অমৃত তুল্য প্রেম রাধার কাছে হয়েছে জ্বলন্ত অঙ্গারের দহন তুল্য —

'কে বেলি পেম অমিঞকে ধার।
অনুভাব বুঝি অ গরউ অঙ্গার।।' (৩৬৬)

বসন্তের মতো বর্ষার চিত্রকল্প উপস্থাপনের মধ্য দিয়েও কবি বিচিত্র সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন বহু পদে —

'ঘন ঘন গরজয়ে ঘন মেহ বরিখয়ে দশদিশ নাহি পরকাসা।
পথ বিপথহুঁ, চিহ্নয়ে না পারিয়ে কোন পুরয়ে নিজ আসা।' (১০৬)

এখানে বর্ষার প্রেক্ষাপটে অভিসারিণী রাধা তাঁর কান্ত সমীপে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল। অথচ পুনঃ পুনঃ মেঘগর্জন আর মুষল ধারে বৃষ্টির ফলে অভিসার গমন পথ চেনাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। দশদিকেই দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে গেছে। অতএব রাধার মনোবাঞ্ছা কি পূর্ণ হবে? রাধার বর্ষায় অভিসার আর মনের ইপ্সিত আকাঙ্ক্ষা উপরোক্ত পদটিতে সুন্দর চিত্রে উদ্ভাসিত হয়েছে।

রাধার তীব্র অভিসার-কামনা সূচীভেদ্য অন্ধকার, প্রতিকূল প্রকৃতিকেও পরাজিত করে। নিজ কুচ যুগল রূপ ভেলার মাধ্যমে রাধা দুর্বার যমুনা পার হয়ে চলেছেন কৃষ্ণ সমীপে। ঘোর অন্ধকার রাত্রি। আকাশে মেঘ গর্জন। এত অন্ধকার যে রত্ন লোভাতুর চোর ও ঘরের বার হয় না। নিজের দেহকেই দেখা যায় না, এমন অন্ধকার অভিসারে বেরিয়েছেন। কবি এর বর্ণনা দিয়েছেন—

গগন গরজ ঘন জামিনি ঘোর রতন হুঁ লাগি ন সঞ্চর চোর।
এ হনা তেজি অএলাহুঁ নিঅ গেহ অপনহুন দেখিঅ অপনুক দেহ।।
... ...
সুসহ জমুনা নরি এ লিহ্ ভাঁগি কুচকুচে তরলতরানিতঁ লাগি।।' (১২৮)

বর্ষার তিমিরাভিসারে নিম্নোক্ত চিত্রে রাধার মন-যন্ত্রণার তীব্র প্রকাশ ঘটেছে। সর্পসঙ্কুল পথ ঘাট গভীর গাঢ় অন্ধকার। ভীষণ নিশাচর প্রাণী পথে বিচরণশীল, মেঘে খেলছে বিদ্যুৎ ঝলক, সখিদের বিস্মিত করে রাধা চলেছেন দুর্গম অভিসারে।

'নিসি নিসিঅর ভম ভীম ভুজঙ্গম
জলধর বিজুরী উজোর।
তরুণ তিমির নিসি তই অও চললি জাসি
বড় সখি সাহস তোর।' (২০৯)

রাত্রির গভীরতার ও তীব্রতা বোঝাতে কবি ব্যবহার করেছেন 'তরুণ' শব্দটিকে।

আর একটি পদে দেখি, ঘন বর্ষণ ও গাঢ় মেঘে আচ্ছন্নতার ফলে দিবসেই দেখা দিয়েছে অকাল-আঁধার, রাধা অভিসার মগ্নতায় একে রাত্রিকাল বলেই মনে করেছেন —

'জলদ বরিস ঘন দিবস অন্ধার।
রয়নি ভরমে হম সাজু অভিসার।।
আসুর করমে সফল ভেল কাজ।
জল দহি রাখল দুহু দিস লাজ।। (৩৩৩)

রাধার এই ভ্রমাত্মক বর্ষাভিসার অবশ্য সফল হয়েছে। কারণ তাঁর লজ্জাকে ঢেকে দিয়েছে গাঢ় মেঘ। এখানেও বর্ষা প্রকৃতির একটি সচেতন উপস্থিত লক্ষণীয়। বর্ষাঋতুর প্রবল প্রাধান্য বিদ্যাপতির অভিসারের পদগুলিতে লক্ষিত হয় —

রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিস পর এ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন
সংসঅ পড় অভিসার। (১০৪)

এখানে দেখি, রাত্রির প্রগাঢ় প্রসারতা যেন কৃষ্ণকজ্জ্বল বমন করে পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেছে। ভয়ংকর সর্পসংকুল পথ। দুর্বার গতিতে অবিরত ব্রজনির্ঘোষ হচ্ছে — রাধার অভিসারগামী মনও এই চিত্রের মতই ত্রস্ত কম্পিত। অবিরাম জলধারা যেন নেত্রপথে অধীর মেঘ গুচ্ছের নিরন্তর বৃষ্টি প্রদানের ইঙ্গিতবাহী। রাধার সংশয়ান্বিত প্রশ্ন, অভিসার বুঝি বিফলে যায়। বিদ্যাপতি অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে দুর্বার বর্ষার প্রেক্ষাপটকে রাধার অভিসারী মনের রহস্য উদঘাটনে ব্যবহার করেছেন।

বর্ষা ঋতুকে চিত্রপট ব্যবহার করে কবির অভিসার পর্যায়ের আরও অনেক পদ আছে। তাদের মধ্যে ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২ প্রভৃতি সংখ্যক পদ উল্লেখযোগ্য।

বর্ষা ঋতুকে রাধার বিরহ চেতনার পরিস্ফুটনেও ব্যবহার করেছেন বিদ্যাপতি। যেমন —

'গগন গরজ মেঘা উঠ এ ধরনি থেঘা
পচসর হিয় গেল সালি।' (১৭৮)

গগনে মেঘের গম্ভীর গর্জন শ্রুত হচ্ছে, রাধা ধরণীতে শায়িত, মদনের পঞ্চশরে তাঁর হৃদয় বিরহে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় একই ধরনের চিত্রকল্প ব্যবহৃত এই পদটিতে —

"বরিস এ লাগল গরজি পয়োধর
ধরনী দন্তুদি ভেলী।
সূন মন্দির পাউস কে জামিনি
কামিনী কী পরকারে।।" (৫১০)

বর্ষার মেঘ গর্জন ও বৃষ্টি ধারায় যেন ধরণী বিদীর্ণ হচ্ছে। রাধার মনেও বিরহ বিকারজনিত বিদীর্ণতা, তার শূন্য আলয়ে একাকী বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করছেন। ৫৩৭ সংখ্যক পদে কবি রাধার মুখে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, বর্ষা ঋতুর সময় বিরহিনীর পক্ষে দুঃসহ। জীবন নির্বাহ করাই কঠিন হয়ে পড়ে —

'কহব সমাদ বালভু, সখি মোর।
সবতহ সময় জলদ বড় ঘোর।।'

আলোচনা থেকে বলা যায়, চিত্রকল্প রচনায় কবি অনেকসময় তাঁর যুগপরিবেশ ছাড়িয়ে আজকের কালে পৌঁছেছিলেন।

গ্রন্থসূত্র

১. Dr. Jaykanta Misshra, —A History of Maithili Literature; (Vol.1), P-40.

২. Grienson, —Maithil Chrestomathy, P-13-14 (1881-'82)

৩. Dr. S. K. Chatterjee, —The Origin and Development of the Bengali Language (1985), Part-1, P-103.

৪. ড. সুকুমার সেন, —সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৩য় সংখ্যা, পৃ-১৪৩।

৫. ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, —শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে (১৩৮১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১২০।

৬. খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত।

৭. রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী (১৩৫৯ বং, ক.বি.) গ্রন্থ সংকলন থেকে গৃহিত। পার্শ্বস্থ সংখ্যা পদসংখ্যা সূচিত করে।

৮. ড. সুকুমার সেন, —পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।

৯. Dr. Subhadra Jha, —Formation of Maithili Language, P-85.

১০. ড. সুকুমার সেন, —ভাষার ইতিবৃত্ত (১০ম সং। কলিকাতা) পৃ. ৩৩১।

১১. Dr. Subhadra Jha, —The Songs of Vidyapati (Edited, 1954), No.61, P-62.

১২. খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমান বিহারী মজুমদার (মিত্র-মজুমদার) সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

১৩. ড. সুভদ্র ঝা সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৬।

১৪. মিত্র-মজুমদার সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

১৫. গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী, গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য ও রামপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, (৮ম সং, ১৩৭৭ বং), ১ম স্তবক, ৪র্থ শ্লোকে (পৃ.৩) আছে 'বৃত্তমক্ষর সংখ্যাত...' অর্থাৎ অক্ষর গণনা নিয়ম নিবদ্ধ ছন্দই বৃত্তছন্দ।

১৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১ম স্তবক, ৪র্থ শ্লোকে (পৃ.৩) আছে —' । জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ' অর্থাৎ, মাত্রা (কলা) সংখ্যা গণনা অনুসারী ছন্দ জাতি ছন্দ হয়।

১৭. 'প্রাকৃত ছন্দে লঘু-গুরুস্বর —এবং রুদ্ধদল-ধ্বনির বিপর্যয় লক্ষ্য করা যায়। এই ছন্দে গুরুস্বর এবং রুদ্ধদল সর্বক্ষেত্রে দ্বিমাত্রক বলে বিবেচিত হয় না, বরং হ্রস্ব উচ্চারণের প্রবণতাই অনুভূত হয়।' —আনন্দ মোহন বসু, —বাংলা পদাবলীর ছন্দ (১৯৬৮), পৃ. ১৫।

১৮. খৃষ্টীয় ১০ম থেকে ১২শ শতাব্দীতে রচিত।

১৯. 'কিন্তু বিদ্যাপতির এই প্রত্ন-কলাবৃত্তরীতি জয়দেবের গীতগোবিন্দের গীতগুলির ন্যায় 'শিষ্ট' রূপের নয়, চর্যাগীতির ন্যায় 'শিথিল' বন্ধ।' আনন্দমোহন বসু রচিত পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।

২০. 'লঘু গুরু একক নিয়ম নহি জেহা। পতা পতা লেকখউ উত্তমরেহা।।' — অর্থাৎ, লঘু গুরু, অক্ষর ব্যবহারে নিয়ম নেই, পড়ে ইচ্ছামতো লেখা লিখবে। —ড. ভোলাশঙ্কর ব্যাস সম্পাদিত (১ম খণ্ড, ১৯৫৯, প্রাকৃত টেক্সট সোসাইটি, বারাণসী-৫), প্রাকৃত পৈঙ্গলম্, সূত্র ১। ১২৯, পৃ. ১১৬।

২১. বৈষ্ণব দাসের (গোকুলানন্দ সেন) পদাবলী সংকলন 'পদকল্পতরু' (১৮শ শতক), — সতীশচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত (১৯৩১, ১ম খণ্ড), পৃ. ৮৮।

২২. মিত্র মজুমদার সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

২৩. 'সোরহমত্তং পাতাকুলতায়'। —পাদাকুলক ছন্দ ষোল মাত্রার। পূর্বোক্ত 'প্রাকৃত পৈঙ্গলম' গ্রন্থ, সূত্র ১। ১২৯, পৃ. ১১৬।

২৪. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলী (সংকলন, ১৩৮৪ বঃ), পৃ. ৭৭।

২৫. মিত্র মজুমদার সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

২৬. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯৭।

২৭. মিত্র মজুমদার সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

২৮. 'চউপইআ' তে সাতটি চতুস্কলগণের পর একটি গুরু বা দ্বিকলা শবব্দ থাকে অর্থাৎ ৪ × ৭ = ২৮ + ২ — মোট তিরিশ মাত্রায় পংক্তি রচিত হয়। এখানে শেষে তিন বা দুই মাত্রা কম করে, ৮।। ৮।। ১১ । বা ৮।। ৮।। ১২। মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদীর রূপ গড়ে উঠেছে।' —ড. নীলরতন সেন, —বাংলা ছন্দ-বিবর্তনের ধারা (১৯৮৩) পৃ. ১১।

২৯. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি জয়দেব ও শ্রী গীতগোবিন্দ (২য় সং, ১৩৫৭ বঃ) ৫ম সর্গ, গীত ৩ঃ ১১, পৃ. ৭১।

৩০. মিত্র মজুমদার সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৩১. পূর্বোক্ত পদকল্পতরু গ্রন্থ, পৃ. ২৪১।

৩২. মিত্র মজুমদার সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৩৩. হরেকৃষ্ণ মুখোঃ সম্পাদিত পূর্বোক্ত গীতগোবিন্দ গ্রন্থ, ১ম সর্গ, গীত নং ১৯, পৃ. ১১৫।

৩৪. মিত্র মজুমদার সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৩৫. শ্রীগুরুনাথ বিদ্যানিধির সম্পাদিত (১৩৭৭ বঃ) কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য, ৯ম সর্গ, শ্লোক নং ২৪।

৩৬. ওই, ১। ৪১, পৃ. ৩৪। ৩৫।

৩৭. ওই, ১। ৩৪, পৃ. ২৯।

৩৮. মিত্র মজুমদার সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৩৯. শ্রীশ্রী গীতা, ২য় অধ্যায়, শ্লোক নং ৬২।

৪০. মিত্র মজুমদার সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৪১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য় সর্গ, শ্লোক নং ৩৯।

৪২. মিত্র মজুমদার সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

চণ্ডীদাসের কাব্যভাষা

চণ্ডীদাসের ভাষা ব্যবহার

চৈতন্য পূর্ব বৈষ্ণব পদাবলীর প্রচলিত মুখ্য দুই ভাষারীতির একটি হোল বিদ্যাপতি সৃষ্ট কৃত্রিম ব্রজবুলি ও অপরটি চণ্ডীদাসের মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষারীতি। বিদ্যাপতির মৈথিল ও পশ্চিমা অবহট্ট তথা হিন্দী শব্দের প্রাধান্য স্পষ্ট। অপর পক্ষে, চণ্ডীদাস যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা প্রাক্ চৈতন্য মধ্যযুগের খাঁটি বাংলা ভাষা। তিনি তাঁর কাব্যে কাব্যভাষার কাঠামো সৃষ্টিতে প্রায় সবটাই বাংলাদেশের বহু পরিচিত শব্দাবলীই গ্রহণ করেছেন। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কৃত অলংকারিক রীতি অনুযায়ী ভাষার বহিরঙ্গ প্রসাধনে তাঁর আগ্রহ বিশেষ লক্ষিত হয়নি। বরং, বহুল প্রচলিত ও পরিচিত শব্দ কল্পের সাহায্যে বিষয়কে যথাসম্ভব সহজ-সরল করে উপস্থাপনা করার প্রবণতা কবিভাষায় লক্ষিত হয়। তিনি সংক্ষিপ্ততম প্রয়াসে এবং অসাধারণ শব্দ সংহতির মাধ্যমে বিষয়বস্তুর বর্ণনা দিয়েছেন। অর্থাৎ, ভাষার ওজন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে তিনি নিজে বলেছেন কম, পাঠককে ভাবিয়েছেন, বলিয়েছেন বেশি। ভাবুক চিত্তের উপযোগী ভাষা ব্যবহার করেই চণ্ডীদাস সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। বাঙ্গালীর অন্তরের প্রিয় বচনগুলিকেই তিনি নৈপুণ্য সহকারে ভাবোপযোগী করে তুলে ধরেছেন। তাই তাঁকে বাংলা 'কবিভাষার জনক'[১] আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আরও বলা যায়, চণ্ডীদাসের কবি ভাষায় 'শব্দ সম্পদে বাংলার স্বকীয় স্নেহ, অনুযোগ, সৌন্দর্যের ধারাস্নান, সুখ-দুঃখ নিঙড়ানো প্রেমের আর্তি, লোক চেতনার বিভিন্ন প্রকাশ, পদাবলীর একটি নিজস্ব প্রকাশরীতির পরিচয় বহন করছে।'[২]

এবং তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে চণ্ডীদাসের ভাষারীতির সুপ্ত সৌন্দর্য। তাঁর কাব্য ভাষার মূল সম্পদ হল ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে আবেগ সঞ্চার এবং ভাষাভিত্তিক মাধুর্যযাগ। প্রথমে আলোচিত হচ্ছে তাঁর ব্যবহৃত প্রিয় শব্দাবলীর বিশেষ প্রয়োগ সম্পর্কে।

রাধাকৃষ্ণের পিরীতি সর্বস্ব বৈষ্ণব পদাবলীতে তিনি 'পিরীতি' শব্দটিকেই ব্যবহার করেছেন অসংখ্য ভাবভঙ্গিতে। পিরীতি শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বিভিন্ন বর্ণনাগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত পদটি উল্লেখ্য। যথা —

বিহি একচিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমান কৈল পি।
রসের সায়র মন্থন করিতে
তাহে উপজিল রি।।
পুনয়ে মথিয়া অমিয়া হইল
তাহে ভিয়ায়িল তি।
সকল সুখের এ তিন আখর
তুলনা দিব যে কি।।[৩] (১৪১)

রাধা, কৃষ্ণের পিরীতিকে 'চন্দনের রীতি' (১৮১) তুল্য অর্থাৎ, চন্দন যেমন ঘর্ষণে গন্ধ সৃষ্টি করে, তেমনি পিরীতির সংস্পর্শে সৃষ্টি হয় সুখ, জ্ঞান করেছেন। আবার পিরীতির জ্বালায় জ্বলে

তাকে- মৃত্যু বা মিরিতি (১৩২) সমান বোধ করেছেন। পিরীতির বিচিত্র বিশেষণ চণ্ডীদাস লোক অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এনেছেন। পিরীতিকে রাধা 'মালা' (৮৮) গেঁথে গলায় পরেছেন, কিন্তু পিরীতির মালা তাঁর গলায় শুধু জ্বালা উৎপন্ন করেছে। 'পিরীতির বিষে' রাধা (২১৭) জ্বলে পুড়ে মরেছেন। বিরহে আকুল রাধা 'পীরিতি ঝুলিটি কাঁধেতে করিয়া পীরিতি নগরে' (৯৩) ফিরে ফিরে বেড়াচ্ছেন ভিখারিনী প্রায় হয়ে। পোড়া পিরীতি তাঁর কাছে 'পাপ' (১০২) তুল্য বোধ হয়েছে। 'পিরিতি-বন্ধন রাধাকে ভীষণ ভাবে আশকিত (১৪১) করেছে। কৃষ্ণকে রাধা 'পিরীতি রসের নাগর' (১০৭) মনে করেছেন। 'পিরিতি'-রূপ 'অকুরে' (১৪৩), (১৪৪) অনেক আকুতির নয়ন জল সেচন করেছেন রাধা। কিন্তু এত প্রযত্নের পিরীতি 'কপট' (১৪২) এবং 'দুঃখময়' (ওই) হয়েছে। তা সত্ত্বেও, পিরীতির বিচ্ছেদে রাধা বুকে শেলের (১৩২) আঘাত পেয়েছেন। প্রিয়র পিরীতি বিহনে রাধার 'বিয়াধি' বা ব্যাধি (১৩৩, ৯৯ ইত্যাদি) সৃষ্টি হয়েছে। রাধা 'সুখের লাগিয়া শ্যামর-ধুয়ার' সঙ্গে (১৩২) পিরীতি করেছেন। এবং সেই পিরীতি 'রসের স্বরূপ' মূর্তি ধারণ (৯৪) করে তাঁর 'জাতিকুল' (ওই) পর্যন্ত হরণ করেছে। কিন্তু সেই 'আনন্দ পাথার' রূপ (৩৭) পিরীতি রাধাকে 'পাবক' (৭৯) হয়ে দগ্ধ করেছে। 'বিরহের ব্যাধি' হয়ে (৮৫) কালার পিরীতি রাধাকে যন্ত্রণা দিয়েছে। দৃশ্যত অমৃতময় পিরীতি আসলে 'গরল' (৮৬) হয়ে দেখা দিয়েছে রাধার কাছে। অথচ এই 'পিরীতি আঠা'কে (৪০) রাধা ত্যাগ করতে পারেন নি। তা 'পাষাণের লেখা'র মতো (৪৩) তাঁর হৃদয়ে খোদিত হয়ে গেছে। এবং তিনি গর্বের সঙ্গে বলেছেন, 'পিরিতি-সাগরে যেবা না সাঁতারে কি ছার জীবন তার' (১২৩)। পিরীতিকে বিচিত্র ভাষাঙ্গিকে কবি ব্যবহার করেছেন তাঁর পদাবলীতে। তবে ১৯৮ সংখ্যক পদটিকে পিরীতি সর্বাত্মক পদ রূপে আখ্যা করা চলে। পিরীতি শব্দের বিচিত্র প্রয়োগে এই পদটি বিশিষ্টতা লাভ করেছে। এখানে রাধার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে কবিরও পিরীতি সম্পর্কিত সাঙ্গীকৃত ভাব ভাবনা সরল ভাষাঙ্গিকে কিন্তু সম্পৃক্ত ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে —

পিরিতি নগরে বসতি করিব
পিরিতে বাঁধিব ঘর।
পিরিতি দেখিয়া পড়সি করিব
সকলি লাগিছে পর।।
পিরিতি দোয়ারে কবাট লাগাব
পিরিতে গোঁয়াব কাল।
পিরিতি আসকে সদাই থাকিব
পিরিতে বাঁধিব ঢাল।।
পিরিতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরিতি শিয়র মাথে।
পিরিতি বালিসে আলিস ছাড়িব
রহিব পিরিতি সাথে।।
পিরিতি সায়রে সিনান করিব
পিরিতি অঞ্জন নিব।
পিরিতি ধরম পিরিতি করম

পিরিতে পরান দিব।।
পিরিতি বেসর নাসা এ পরিব
হেরিব নয়ন কোনে।
পিরিতি পাঁজরে পিরিতি রাখিব
দ্বিজ চণ্ডী দাস ভনে।।

এখানে পিরীতি হয়েছে রাধার পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও বোধ স্বরূপ। তাঁর বাসস্থানই হবে পিরীতি নগরে। পিরীতি তাঁর উপলব্ধি অনুভূতিতে হয়েছে দোয়ার (দরজা), আসক (প্রেম), পালক, বালিস, সায়র, কাজল, ধর্ম, কর্ম, বেসর (অলংকার) ও পাঁজর। পিরীতিতেই তিনি কাল কাটাবেন, পিরীতিই তাঁর জগৎ জীবন সাথী।

পিরীতির তীব্র আসক্তিতে রাধা কখনো অনির্বচনীয় সুখ পেয়েছেন, কখনো জীবন সংকটে ভুগেছেন। দরিদ্রের হেমতুল্য কালার পিরীতি (৬০) রাধার কাছে বিচিত্র ঐশ্বর্যে মণ্ডিত। কালার পিরীতির প্রসঙ্গে কবি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার লৌকিক সংস্কার থেকে। কালুর পিরীতি 'গুড়' এর (১৮৭) মতো এখানে যুগপৎ মিষ্টত্ব ও গাঢ়ত্বের ইঙ্গিত। সর্বোপরি প্রযুক্ত হয়েছে প্রেমের দেহজ আশ্লেষ। —বলা যায় যে, পিরীতির প্রতি রাধার আকর্ষণ আসক্তি যেমন সন্দেহাতীত, কবি নিজেও এই শব্দটির প্রতি বিশেষ দুর্বল ছিলেন বলে মনে হয়।

চণ্ডীদাসের পদাবলীত আরও কিছু শব্দের পৌনঃপুনিক উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এই শব্দগুলিও চণ্ডীদাসের মনোভূমিতে বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকবে। এবং এগুলি থেকে তাঁর মানস প্রবণতার ও ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলে মনে হয়। এই শব্দগুলি প্রায় আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে প্রতীকি ব্যঞ্জনার ইঙ্গিতবহন করে। যেমন 'বাঁশী' শব্দটি। কানের ভিতর দিয়ে রাধার মর্মে শ্যাম নামকে চিরস্থায়ী করে পৌঁছে দিয়েছে বাঁশীর নিঃস্বন। রাধা নিঃসঙ্কোচে কবির মাধ্যমে স্বীকারোক্তি করেছেন যে, 'কানু-সরবস বাঁশী' (৩৯)। কানুর বাঁশী শুনে সতী ভোলে নিজপতি মুনি ভোলে মন' (৪১)। ১৩৭ সংখ্যক পদটিতে বাঁশীর বিচিত্র প্রভাব সম্পর্কে রাধা বলেছেন —

'সখি হে, বংশী দংশিল মোর কানে।
ডাকিয়া চেতন হরে পরনি না রহে ধড়ে
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে।।
কালার লাগিয়া আমি হব বনবাসী।
কালা নিলে জাতি কুল প্রাণ নিলে বাঁশী।।
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সভারি সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল।।
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর সুধা উগার গরল।।

এবং রাধা তাই মনে প্রাণে চান বাঁশীর গুষ্ঠি শুদ্ধ নাশ করতে —

যে ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগ গাও।
ডালে মুলে উপড়িয়া সাগরে ভাসাও।

এছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত শব্দের প্রতি কবির তীব্র প্রবণতা লক্ষণীয় তা হল - কদমগাছ, ত্রিভঙ্গ, ভাঙ্গিয়া, গুননিধি (কৃষ্ণ) চিকন কালা (কৃষ্ণ), রসিক নাগর (কৃষ্ণ), রসবতী (রাধা)

মোহিনী, কানু-পরিবাদ, অবলা (রাধা), কুলটা (রাধা), ননদী কাঁটা, কলঙ্ক - কলসী, নয়ন -কোন, বিরহ - আগুন, অভাগিনী (রাধা), পাঁজর, শয়নে স্বপনে, আসিয়া, লোকশ্চরচা, চাঁদ মুখ ইত্যাদি। প্রায় পদেই উপরোক্ত শব্দাবলীর সাক্ষাৎ পাই।

চণ্ডীদাস তাঁর পদাবলীর মধ্যে দিয়ে বহু সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রৌঢ়োক্তি বা প্রবচন প্রয়োগ করেছেন। তীব্র অনুরাগ প্রকাশে রাধার কাছে 'কানু হৈল জপমালা' (১৩)। কৃষ্ণের বাঁশীর তীব্র আকর্ষণে 'পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে' (৪১) কৃষ্ণের প্রতি পিরীতির আসক্তি বোঝাতে 'জল, বিনু মীন, যেন কবহুঁ না জী য়ে' (১২৮)। পিরীতির প্রতি আক্ষেপবশত রাধা বলেছেন 'পরবস পিরিতি আঁধার ঘরে সাপ' (৪৪) পিরীতির স্বরূপ উদ্ঘাটনে রাধার বিশ্লেষণ 'গেড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল' (৪৮)। বিরহের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে 'পাষাণেতে দেহ কোল পাষাণ মিলায়' (২৩৩)।, বিরহে রাধা নিজেকে বিনাশ করতে উদ্যত হলে কবি সান্ত্বনা দেন 'শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা' (১৩০)? রাধার মনে সংশয়ের দ্বন্দ্ব 'সুজনের পিরিতি হৈলে কভু নাহি ছুটে' (২১)। কিংবা, একদিকে বিরহ জ্বালা অন্যদিকে বেঁচে থাকার অভীপসা 'নবীন পাউসের মীন মরন না জানে' (২২০)। লোক অভিজ্ঞতা ও পারিবারিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ওই প্রবচনগুলি কবি অত্যন্ত অনায়াস সাফল্যে কাজে লাগিয়েছেন - রাধার ঘরে ও জ্বালা, বাইরেও জ্বালা। তাই সখিকে বলেছেন 'গরল সমান লাগে বচন হিয়ার' (১৮৪)। একদিকে কুল কলঙ্ক, অন্যদিকে কানুপ্রেম রাধাকে মরণ যন্ত্রণা দিচ্ছে। কবি তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন 'পরের বচনে কি আপন পর হয়' (১৯৯)। আবার অন্যত্র 'শাশুড়ি ক্ষুরের ধার ননদিনী জ্বালা' (১৫০)। আসলে রাধাকৃষ্ণ প্রণয় জনিত সামাজিক অনুশাসন তাঁদের অবৈধ পরকীয়া প্রেম সে যুগের সমাজে রীতি সিদ্ধ ছিল না। ঘরে বাইরে নিজ জন—পরজনের দ্বারা তা নিন্দিত সমালোচিত হত। চণ্ডীদাসের নিজের জীবনেও রজকিনী রামী প্রসঙ্গ এবং তাঁদের প্রেম অসামাজিক রূপে গণ্য হয়ে কঠোর ভাবে ধিকৃত হয়েছিল। তাই সামাজিক অনুশাসনকে, তন্নিষ্ঠ প্রেমের যৌক্তিকতায় ও মানসিক পবিত্রতার জোরে, লঙ্ঘন করে, কবি হৃদয়-উত্তরণের প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর পদাবলীতে। হৃদয়ের প্রেমকে মর্যাদা দিতে তাই কবি রাধার মুখে বসিয়েছেন বিদ্রোহের ভাষা। সামাজিক সংস্কার বন্ধন থেকে মুক্তিকামী প্রেমের ডাক দিয়েছেন তিনি। কানুপ্রেমে উন্মাদিনী রাই মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন 'উ-স্মত হৈয়া রতন মাঙ্গিব তেজি কুল - ভয় লাজ' (১২)। মনের ইচ্ছাকেই বড় করেছেন রাধা - 'পুরুক মনের সাধ ধরম যাউক দূরে নিরবধিপ্রাণমোর কানু লাগি ঝুরে' (২১)। রাধা উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করেন—'উরে কর ঘাতি কহিব সভাতে তুলি মোর প্রাণপতি যা বিনে যাহার না রহে জীবন সেই তার কুলজাতি।।' (২২) প্রেমের স্বীকৃতি দিতে কুল মান ভয় লাজকে রাধা জয় করতে চেয়েছেন—'কুল তেয়াগিয়া ধরম ছাড়িয়া লহব কলঙ্কের ডালা।' (২৬) প্রেমের দীপ্ত গৌরব, মনের অত্যন্তিক আকাঙ্খাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রেমের ধর্ম লৌকিক সমাজ ধর্ম সংস্কার কে অগ্রাহ্য করার সাহস পেয়েছে—'দূরে গেল ধর্ম, কর্ম গুরু গরবিতে অবশ করিল মোরে কানুর পিরিতে।' (২৮) এই ধরণের ভাষা ব্যবহার ও শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমেই চণ্ডীদাসের, প্রেমে দৃঢ়, সংকল্প নিষ্ঠ মনের ছবিটি সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে। রাধার মাধ্যমে যেমন, তেমনি কৃষ্ণের উক্তিতেও কবিআত্মভাবনা প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছেন। এবং প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর প্রিয় লৌকিক অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করেছেন। রাধার বিরহে আকুল কৃষ্ণ বড়াইকে বলেছেন —

'হাথ দিঞা দেখ বড়াই মোর কলেবরে।

ধান দিলে খই হয় বিরহ অনলে।।
জিহ্বা খণ্ড খণ্ড হৈল রাধা রাধাবলি।
তাহার বিচ্ছেদে মোর বুকে হৈল শেলি।।' (১৪৭)

সামাজিক অনুশাসন জনিত বিরহ বিচ্ছেদে কৃষ্ণের প্রচ্ছন্নতায় কবি ও যেন একান্ত অভিমানে মৃত্যু বরণ করতে চেয়েছেন। তাঁর অভিমান হত কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠেছে মৃত্যু, মদির ধূসর কাব্য ভাষা, সুর হয়েছে বেদনা ঘন, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে দায়িতাকে পাবার ব্যঞ্জনা অভিব্যক্ত হয়েছে —

'মরিলে পোড়াইও বড়াই যমুনার কুলে।
যে ঘাটে আইসে রাধা বিহানে বিকালে।।
মরিবার বেলে বড়াই সোঙারিহ রাধা।
জনমে জনমে যেন মিলায় বিধাতা।।' (৯)

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে চণ্ডীদাসের বিশেষ প্রবণতা ও মনোভঙ্গির পরিচয় উল্লেখিত হোল এখন, তাঁর ভাষাকে বাংলার ধ্বনি তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি ভাবে প্রভাবিত করেছে তার আলোচনা করা যায়। ধ্বনি তাত্ত্বিক পদ্ধতির মধ্যে, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির প্রয়োগ তাঁর ভাষায় ছন্দসমতা রক্ষায় ও শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যেমন —

'যাহার সহিত | যাহার পিরিতি | সেই সে মরম জানে।
লোকচরচায় | ফিরিয়া না চায় | সদাই অন্তরে টানে।।' (৩৩)

এখানে 'মরম' ও 'চরচায়' স্বরভক্তি উচ্চারণে মিশ্রবৃত্তে যথাক্রমে তিন ও চারমাত্রা রূপে ছন্দোসাম্য রক্ষা করেছে, মূল রূপ থাকলে মর্ম ও চর্চায় মাত্রা বিভাগ হত মিশ্রবৃত্তে যথাক্রমে দুই অথবা তিন। মূলতঃ নিম্নোক্ত শব্দগুলি স্বরভক্তি রূপে ব্যবহৃত হয়ে পদাবলীতে ছন্দনির্ণয়ে মাত্রা সমতা রক্ষা করতে সাহায্য করেছে। যথা—ধৈরজ (১), মুরছি (৩), মরম (৪) দরপন (১০), উনমত (১২), বিরিখ (বৃক্ষ), (৭২), পরতীত (১৮৬), পরমাদ (৩৪), মুরতি (৯০), অদভুত (১৮২), মরুখের (১৮০), শবদ (১৭৯), সরবস (৩৯), পালটিয়া (৪৬), পরান (৫৫), বরন (৬৯), রতন, যতন (১৩১), দুরুজন (১৩২), সিনান, ধরম, করম (১৯৮), মুকুতা, গোপত, বেকত (২১৫) প্রভৃতি।

অপিনিহিতির ব্যবহার করেও কোন কোন ক্ষেত্রে ছন্দোনির্মাণে মাত্রা সমতার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যথা —

'পিরিতিনগরে বসতি কর‍্যাছ পর‍্যাছ পিরিতি বাস' (১১১)। 'কর‍্যাছ', 'পর‍্যাছ' শব্দে তিন মাত্রা ধরা হয়েছে মিশ্রবৃত্ত ছন্দের রীতি অনুযায়ী। এছাড়া ব্যবহৃত হয়েছে 'হল্য' (১১২), 'হয়্যা' (১০৪), 'বেড়ায়্যা' (৪০), 'আস্যা', ছাড়্যাছি' (২৩), 'বাধ্যাছি' (২২), উড়্যা, (২০৩), 'সাধ্যা', 'মাগ্যা', (২১১), লয়্যাছি' (১৯২) প্রভৃতি।

স্বরসঙ্গতির সাহায্যে অনেক স্থলে শ্রুতি মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন কবি। যথা—'কেনে', (৮৯), 'ধুয়ায়া' (৪০), নিতি (৪৩, ১৫০ প্রভৃতি), মিলল (৪৫), 'নিশি নিশি (৫০), 'বিনি' (৩৪), দুরুজন (১৬২), আভাগিনী (১৮১) ইত্যাদি।

যুক্তবর্ণের একটি লোপ পেলেও পূর্ববর্ণ দীর্ঘ হয়নি, ফলে ছন্দের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রক্ষার সুবিধা হয়েছে। যথা—হিলোলে (১), 'নিরিখনে' (৬), 'চিত' (৯), 'সরবস' (৩৯), 'নিঠুর' (১১৮) , অনেকক্ষেত্রে শব্দ দীর্ঘ স্বরবর্ণে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং শ্রুতি মাধুর্য গুণে ও পদাবলী পাঠের

বিশেষ সহায়ক হয়েছে। যথা—'আজু' (১), 'শয়ান' (১২) 'সনে' (৬), 'নয়ান' (১৭৯), 'আনন' (১৬৩) ইত্যাদি।

শব্দরূপের প্রয়োগেও চণ্ডীদাসের বিশেষ মানসিকতা পরিস্ফুট। অনেক স্থলেই, বিশেষত ক্রিয়াপদে, 'ঞ', 'ঙ' প্রভৃতি ব্যঞ্জন যোগে শব্দকে আনুনাসিক করেছেন। যেমন—তিয়াগিঞা, বলাইঞা (১), নিরামিঞা (৯), নিবারিঞা (২১৩), মল্যাঙ (১৩১), দেঙ, যাঙ (২০৩) প্রভৃতি। ক্রিয়ার সাধারণ বর্তমান রূপদিতে ছন্দের মাত্রা সমতার প্রয়োজনে এসেছে 'য়ে এ, ইয়ে, অ' প্রভৃতি প্রত্যয়। যথা—থাকয়ে (থাকে), 'দেখয়ে' (দেখে) (৬), 'আছয়ে' (আছে) (৪), 'গাঙ' (গায়) (৮), 'হএ' (হয়), 'খাওই (খায়) (১১), যাঙ' (যায়) (৮), 'করয়ে' (করে) (১৬), 'পাইয়ে' (পাই) (৭১), 'বাঢ়য়ে' (বাড়ে) (১২৭) প্রভৃতি।

উত্তম পুরুষের অতীত কালের ক্রিয়াপদগুলিতে সাধারণত 'লু, লুঁ' প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহার এইরকম—'আইলু' 'দিল' (১১), 'কহিলু' (১৩), 'বেচিলুঁ', 'সপিলুঁ' (১৪), 'মজিলু' 'ভজিলুঁ' (১৫), 'পালুঁ' 'মলুঁ', (২৫), 'গোঙালুঁ' (২৯), 'ঘুচাইলুঁ (৮০), 'খাইলুঁ' (১৪০), 'তেজিলুঁ' (১৬২) , 'গিছিলুঁ' (২০৭) ইত্যাদি।

সাধারণ ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার রূপে 'এক' 'য়েক' প্রত্যয় যুক্ত —'উঠিবেক', 'যাইবেক' (২), সহিবেক' (২৫) প্রভৃতি।

শব্দদ্বৈত বা যুগ্ম শব্দ ব্যবহার করেছেন কবি অনেক স্থলে—'ফিরি', 'ঘিরি' 'ধীরি ধীরি' (২১২), 'বাড়ী বাড়ী' (২১১), 'হিয়ার হিয়ার' (২০৫), 'কলসে কলসে' (২০৩), 'সঙরি সঙরি' (১৮৪), 'কুহ কুহ' (১৬১), 'নয়নে নয়নে' (১৫৭), 'মরি মরি' (১৫০), 'খণ্ড খণ্ড' (১৪৭), 'জর জর' (১৪২), 'গনি গনি' (১৪০), 'শুন শুন' (৮২), 'দূরে দূরে ' (৬৭), 'নিতি নিতি' (৯), 'সঘনে সঘনে' (৩২), 'ডুবু ডুবু' (৮৬), অনে খেনে (১১৩) প্রভৃতি।

ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারাত্মক শব্দ ব্যবহার করে কবি পদে ধ্বনি ঝংকার সৃষ্টি করেছেন—'ছল ছল' (১, ৬৮, ২০৫) ইত্যাদি, 'ছটপটি' (২০৩), 'লটপটি' (১৮৫), 'ছটফট' (১৫৮, ৭৮ ইত্যাদি) , 'আনচান' (১৫১), থরথর (৭০), 'ডুবুডুবু' (৮৬), 'দগদগ' (৮১), 'ঢুলঢুল' (৬৯), 'দগদগি' (২৫, ৭২, ৩৯, ৬৬, ১০৬) ইত্যাদি, 'ধড়ফড়' (৪০), 'ঢুলঢুল' (৫২, ৬৯) ইত্যাদি, 'আনছান' (৫৭), 'ঝলমল' (৬০), 'কুটকুট' (৯৬) প্রভৃতি।

চণ্ডীদাস তাঁর পদাবলীকে লোকসমাজে জনপ্রিয় করতে বহু গ্রাম্য বা কথ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিশেষ্য, অব্যয়, ক্রিয়া, বিশেষণ নির্বিশেষে কাব্য ভাষায় এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন—ছার (১৮৫), হল্য (১৮৫), খালো)১৮৪), কর‍্যাছি (৬৫), মল্যাঙ (১৩১), হয়্যা (১৬), লয়্যা (২১), খ্যাতে (২৭), ভাঁড়াইলে (৫৪), মলুঁ মলুঁ (১৩১), পোহাইয়া (৬১), দ্ড়াইনু (৬৩), জানিতাঙ (৬৫), নিঙ্গাঁড়ি (৬৯), খালু (৭৬), সম্ভাইল (৮১), খোদাইয়া (৮৬), ঝাঁটিয়া (৬১, ৬২), কৈনু (৭৬), বিষ মাথা দেয় খোঁটা (৬৪), মুড়াব (১৩২), ধুসিয়াদিন (১১৬), ঝাঁপ দিয়া (১০৮), টীট ঢঙ্গেতে (১০৮), গুলিয়া দেহ (১১৯), চাটুবোলে (৪৬), ডাহিনী (১৮১), ঠাঞি (১৮৬), বাউরী (৩৯), বৌটা (৬০), সোধায় (৪৯), হাঁড়ি-ঢাকুনি (২১১) প্রভৃতি।

চণ্ডীদাস তাঁর ভাষা রীতিতে গ্রাম বাংলার বাচন গত সরলতাকে আশ্রয় করেছেন। ফলে বাক্যরীতির মধ্যে একটা অনায়াস ও নিঃসঙ্কোচ শব্দ প্রয়োগ লক্ষণীয় এবং ফলে তাঁর পদরচনায় সংস্কৃত আলঙ্কারিক শাস্ত্রোজ্ঞ-আড়ম্বর বহুল ভাষা ও তৎসম শব্দের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় না।

তিনি কত সহজে ও সাধারণ ভাষায় যে হৃদয়ের মূল ভাবটির অভিব্যক্তি ঘটাতেন তার কিছু দৃষ্টান্ত আলোচনা করা গেল—

রাধা রাতদিনই কানুকে ভুলতে পারছেন না। সর্বদাই তাঁর মন উচাটন হয়ে ঘুরে বেড়াতে চাইছে। এর কারণ হিসাবে রাধা বলেছেন—'সতত হৃদয়ে আমার (রাধার) পরাণ কানুর-চরণেধান্ধা।' (১৮০)। সুতরাং, কানুপ্রসঙ্গ ভোলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। রাধা গোকুল নগরে গোপেদের মধ্যে বহুদিন রয়েছেন। ঘরের বধূ বলে তিনি, কানু গোরা কি কালা, তাই জানেন না। অথচ, শাশুড়ি, ননদীরা তা বিশ্বাস করতে চায় না। রাধা যতই সাধ্বী সাজুন না কেন—'লোক মুখে শুনি ইহা বলে নাকি কানু মনে রাধা আছে'। (৫৪) এই অংশটির সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের এই অংশটির বেশ মিল আছে—রাধা অভিযোগ করেছেন যে, 'সব গোপীগনে মোরে/কলঙ্ক তুলিয়া দিল/রাধিকা কাহ্নাইর সঙ্গে আছে।'[৪]

কানুর সঙ্গে পিরীতি করে রাধা প্রাণে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। কলঙ্ক কলসী নিয়ে তিনি সমুদ্রে ভেসে যেতে চাইছেন, অথচ যার জন্য এই অবস্থা তাঁর, সেই কানুর ব্যবহারও তাঁর কাছে ভালো লাগছে না। তাই তিনি দুঃখে বলেছেন—

'ছেদন করিয়া দেহ পিরিতের ডুবি (দড়ি)'।(৬৫)[৫]

রাধার পক্ষে প্রাণ ধারণ করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ তার দয়িত তাঁর সামনে দিয়েই অন্য নারীর বাড়ি যাচ্ছেন। নারীর স্বাভাবিক ঈর্ষাবোধে রাধার মনের ক্রোধ গিয়ে পড়েছে সেই অন্য নারীর ওপরে। রাধা প্রায় অভিশাপ দিয়ে বলেছেন 'আমার অন্তর যেমতি করিছে তেমতি হউক সে'। (৫৯)

বিরহিনী রাধা আর দুঃখ সইতে পারছেন না। দুঃখ থেকেই তাঁর মনে এসেছে নিজের প্রতি ক্ষোভ। কানুর ছলনাময় প্রেমকে তিনি বুঝতে পারেন নি। নিজেকেই দায়ী করে রাধা স্বীকার করেছেন যে—'হাতের কালি গালে দিলু মাখি নিলু চুন।' (৭৬)

এরকম অজস্র বাক্য চণ্ডীদাসের পদাবলী থেকে চয়ন করা যেতে পারে। পল্লীর লোক সমাজের সরল বাচন ভঙ্গি এইসব পংক্তিকে জোরাল আবেদন সমৃদ্ধ করেছে। কয়েকটি উল্লেখ্য পংক্তি— 'পাখী হঞা উড়্যা যাও পাখা নে দেয় বিধি' (২০৩), 'ঘর-দুয়ারে আগুন দিয়া যাব দূর দেশে' (১৮০), 'কুল তেয়াগিয়া ধরম ছাড়িয়া লইব কলঙ্কের ডালা। মাথায় করিয়া দেশে দেশে যাব মাগিয়া খাইব ঘরে।' (২৬) এখানে সাধু ক্রিয়া পদের সঙ্গে চলিত ক্রিয়ার মিশ্রন ঘটে গেছে। ' তেয়াগিয়া, ছাড়িয়া, লইব, করিয়া, মাগিয়া'—সাধুক্রিয়া, এর সঙ্গে 'যাব' ক্রিয়াটি চলিত ভাষার রূপ। ২৭ নং পদে দেখি—'খাইতে যদি বসি তবে খ্যাতে কেনে নারি গো'।—এখানে ও 'খাইতে' সাধুক্রিয়ার সঙ্গে 'খ্যাতে' চলিত ক্রিয়া এক সঙ্গে থেকে গেছে। কত অনায়াস ভঙ্গিতেই রাধা কানুর প্রেমকে আশ্রয় করে ত্যাগ করেছেন—'ধরম করম সরম ভরম সকলি করিনু নাশ' (৯৩)। এখানে 'ধরম, করম, ভরম' প্রভৃতি শব্দের স্বরভঙ্গি প্রয়োগ বাক্যটিকে অদ্ভুত শ্রুতিমধুরতা দান করেছে।

আলোচনা থেকে দেখা গেল যে কবির বিশিষ্ট মনোভঙ্গি হচ্ছে দেশজ-লোকায়ত ভাষার প্রতি প্রবণতা। তিনি মূলত জোর দিয়েছেন শব্দের অর্ন্তশক্তির সাহায্যে ভাবরস উদ্ঘাটনে।

ছন্দোরীতি : চণ্ডীদাস

ছন্দের বৈচিত্র্য সম্পাদনে বিদ্যাপতি যেমন মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত রীতিকেই মূলত ব্যবহার করেছেন তাঁর বৈষ্ণব পদাবলীতে, চণ্ডীদাস তেমনি, কলামাত্রিক ছন্দেরই অপর রূপ অক্ষর বৃত্ত

বা মিশ্রবৃত্ত ছন্দোরীতির সাহায্যেই প্রধানত পদ রচনা করেছেন। তবে প্রাচীন উচ্চারণের (স্বরবর্ণ) দীর্ঘত্ব--হ্রস্বত্ব অনুযায়ী বা যুক্তাক্ষরের বিশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ প্রবণতা এবং সর্বোপরি পদাবলীর সঙ্গীতিক ফলশ্রুতির জন্য চণ্ডীদাসের পদাবলীতে কখনো কখনো কলাবৃত্তের বা লৌকিক দলবৃত্তের ছন্দোভঙ্গীও এসে পড়েছে। বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যেও এরকম ছন্দোরীতির নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

চণ্ডীদাসের মুখ্য ছন্দোরীতি অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত। এই রীতির বিভিন্ন বন্ধ কবি তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। প্রথমে পয়ার বা দ্বিপদী বন্ধের দৃষ্টান্ত —

বলে বা না বলে কেন।। গৃহে গুরুজন। ৮।।৬।
ছাড়িতে নারিব আমি ।। সেই শ্যামধন।।
সে রূপ লাবনি মোর।। হিয়ায় লাগিয়াছে।
পাঁজর কাটিয়া কেহ ।। লয়্যা যায়-পাছে।। (২৭)

এখানে ছন্দো বিভাগ আট - ছয় (৮।। ৬।) বা পয়ার বন্ধ। তৃতীয় পংক্তির 'হিয়ায়'কে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে দু-মাত্রা ধরতে হবে।

পয়ার বন্ধের সঙ্গে দীর্ঘ ত্রিপদীর মিশ্রণ চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যে করেছেন। যথা—

কালা গরলের জ্বালা।। আর তাহে অবলা।। ৮।।৮।।
তাহে মুক্তি কুলের বৌহারী, ১০।
অন্তরে মরম বেথা কাহারে কইব কথা
গাপতে গুমরি মরি মরি।।
তরল বাঁশের বাঁশী।। নামে বেড়া জাল। ৮।।৬।
সভারি সুলভ বাঁশী।। রাধার হৈল কাল।। (১৩৭) সংখ্যক

এখানে প্রথমে দেখি আট - আট - দশ (৮।। ৮।। ১০।) মাত্রার ত্রিপদী মিশ্রবৃত্ত এবং পরে দেখছি আট - ছয় (৮।। ৬।) মাত্রার দ্বিপদী পয়ার বন্ধ। তবে প্রথম ক্ষেত্রে 'অবলা'কে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে চারমাত্রা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'রাধার হৈল কাল'কে আট মাত্রায় ক্রমে পাঠ করা যায় না। 'হৈল' বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে হবে 'হইল'।

একপদী বন্ধের সাথে দ্বিপদী বন্ধের সহাবস্থানও চণ্ডীদাসের পদে বর্তমান। যেমন —

ভাদরে দে খিলু নঠ। চাঁদে। ৪।৪।২।
সেই হে তো। উ ঠে মো র।। কা নু পরি বাদে।। ৮।।৬।।
এতেক যুবতি। আছয়ে গোকুলে। ৬।৬।
কলঙ্ক কে বলে লেখা।। মোর সে কপালে।।৮।।৬।(১৯৯)

প্রথম পংক্তি একপদী, ছন্দবিভাগ—চার - চার - দুই (৪। ৪। ২।), বা অন্যত্র ছয় - ছয় (৬।৬।) দ্বিতীয় পর্যায়ে ছন্দোবিভাগ দ্বিপদী পয়ার বন্ধ, আট - ছয় (৮।। ৬।) পদ ভাগে।

পয়ার ছন্দের মধ্যে অর্থাৎ ৮।। ৬। ছন্দোবন্ধের মাঝে কখনো কখনো ছয় - আট (৬। ৮।) মাত্রাভাগে এসে পড়েছে। এতে ছন্দে এসেছে বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব। যথা —

আমি যাই যাই বলি।। বলে তিন বোল। ৮।।৬।
কত না চুম্বন দেই।। কত দেই কোল।।[৬] (৬৭১)

আবার ওই একই পদে নিম্নোক্ত ছন্দের স্বচ্ছন্দ বিহারে উল্লেখ্য। যথা—

নি গু ঢ় পিরিতি।। পি য়ার আ র তি ব হু। ৬।।৮।
চণ্ডীদাস কহে।। হিয়ার মাঝারে রহু।। (ওই)

পংক্তি শেষে গানের সুরের রেশ ধরে রাখার জন্য বা গানের ধুয়া ধরার জন্য চণ্ডীদাসের বহুপদে অতিপর্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এতে মূলছন্দের সাথে একটা অতিরিক্ত তরঙ্গ দোলাও সৃষ্টি হয়েছে। যথা —

পা শ রি তে চাহি তারে।। পাশরা না যায়। গো। (৮।।৬।২)
না দেখি তাহার রূপ।। মন কেন টানে। গো।।
শয়ণে সুতিঞা থাকি।। ননদিনী সনে। গো।
ভরমে তাহার নাম।। জিহ্বা কেন বলে। গো।।[৭] (২৭)

চণ্ডীদাস ব্যবহৃত মিশ্রবৃত্তের ত্রিপদী বন্ধগুলির অন্যতম হল ছয় - ছয় - আট (৬।।৬।।৮।) বন্ধ বৈচিত্র্য —

নিতুই নৌতুন।। পিরিতি দুঁ জন।। ৬।।৬।।
তিলে তিলে বাড়ি যায়। ৮।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাঢ়য়
পরিণামে নাহি যায়।। (১২৭)

এখানে প্রযুক্ত হয়েছে ত্রিপদীর লঘুবন্ধ (৬।। ৬।। ৮।) পদমাত্রাভাগে। ত্রিপদীর অন্যরূপ বন্ধ ও বিদ্যমান। যথা —

য মু না - সি নানে যাই।। আঁ খি মে লি না হি চা হি ৮।।৮।।
ত রু য়া কদম তলা পা নে। ১০।
যথা তথা বসি থাকি বাঁশীটি শুনিয়ে যদি
দুটি হাত দিয়া থাকি কানে।। (২০২ নং পদ)

এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ত্রিপদীর দীর্ঘবন্ধ, আট - আট - দশ (৮।।৮।। ১০।) পদমাত্রা ভাগ।

কোন কোন পদে ত্রিপদীর লঘুবন্ধ ও দীর্ঘবন্ধ, যথাক্রমে ছয় - ছয় - আট (৬।।৬।।৮।) ও আট - আট - দশ (৮।।৮।। ১০।), একই পদে প্রযুক্ত হয়েছে। ফলে পদপাঠে বৈচিত্র্য এসেছে। যথা —

ব র ন দে খি নু শ্যা ম।। জি নি য়া তো কো টি কাম ৮।।৮।।
ব দন জি ত ল কো টি শ শী। ১০।
ভাঙ ধনুভঙ্গি ঠাম নয়ন কোণে পুরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি।। (১২৭)

এই অংশের পদমাত্রাভাগ দেখা গেল আট - আট - দশ (৮।। ৮।। ১০।) এই দীর্ঘ বন্ধের ত্রিপদীতে অথচ, এর কিছু পরেই দেখি —

বড় কারি গরে।। কু ন্দি লে তা হা রে।। ৬।।৬।।
প্রত্যঙ্গ ম দ ন শরে। ৮।
যুবতী ধরম ধৈর্য্য ভুজঙ্গম
দমন করিবার তরে।। (ওই)

এখানে মাত্রা বিভাগ ছয় - ছয় - আট (৬।।৬।।৮।) রূপে। সম্ভবত গানের সুরে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যই এইরকম বিভিন্নতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

৫৭

চণ্ডীদাসের পদেও মিশ্রবৃত্ত একপদী ও ত্রিপদীর একত্র অবস্থান লক্ষিত হয়। যথা —

সই) জাতি জীবন। কালা। ২) ৬। ২।
তোমরা আমারে।। যেবল সেবল।। ৬।।৬।।
কালিয়া গলার মালা।। ৮।(১৫)

প্রথম পংক্তিতে দেখি দু-মাত্রার অতিপর্ব সহ মাত্রাভাগ হয়েছে (২) ৬।২) দুই) ছয় - দুই বিভাগে। আবার পরবর্তী অংশে মাত্রা ভাগ ছয় - ছয় - আট (৬।। ৬।। ৮) এই লঘু ত্রিপদী বন্ধ।

লক্ষণীয় যে, প্রথম পংক্তিতে 'জাতি' শব্দের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে তিন মাত্রা ধরা হয়েছে ছন্দোসাম্য রক্ষার্থে। এর পরে আবার একপদী অংশে মাত্রা পরিবর্তন করা হয়েছে। যথা —

সই, জা তি জীবন ধ ন। কা নু। ২) ৮। ২।
সঙ্গে র স ঙ্গি নী হ ই এ্যা র হি ব ৬।।৬।।
শুনিব (চান্দ) মুখের বেনু।। (ওই) ৮।

একপদী অংশে মাত্রা বিভাগ দুই - আট - দুই (২) ৮। ২।) অতিপর্বের ব্যবহার ছাড়াও কোন কোন পদে উপরোক্ত রীতি গৃহীত হয়েছে। যেমন —

(স ই) ক হি ও তা হা র। পাশে। (২) ৬। ২।
যা হা রে ছু ই লে সি নান ক রি য়ে
সে মোরে দে খিয়া হা সে।। ৮।
কার শিরে হাত। দিয়া।৬। ২।
কদম্ব তলাতে কারে কি বলিলা ৬।। ৬।।
যমুনার জল ছুঞা।। (১৫৬) ৮।

এখানে একপদীর মাত্রাভাগ প্রধানত (৬।২) ছয় - দুই ভাগে এবং ত্রিপদীর মাত্রা বিভাগ ছয় - ছয় - আট (৬।। ৬।। ৮।) লঘু বন্ধ রূপে।

অতিপর্ব যোগ করে ছন্দে মাত্রা সমতা রক্ষার দৃষ্টান্ত ও চণ্ডীদাসের পদে পাওয়া যায়। যথা—

চাঁ দ হে রি তে মোরে তা প বা ঢ় য়ে। গো (৮।। ৬। ২)
বিষ লা গে ম ল য়ে রি বাত। (১০)
সরস চন্দন ঘন আগুন লাগয়ে। গো (৮।। ৬। ২)
ফুল হেরি ফুল শরা ঘাত।। (১৬১) ১০।

এখানে মিশ্রবৃত্তের দীর্ঘ ত্রিপদী বন্ধে আট - আট - দশ (৮।। ৮।। ১০।) মাত্রা বিভাগ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে দ্বিতীয় পদ ভাগে ছয় ও দুই মাত্রায় অতিপর্ব যোগে (৬। ২) মোট আট (৮।) মাত্রা হয়েছে। তাই পদভাগ হয়েছে ৮।। ৬। ২) (৮) ১০। এইভাবে। প্রথম পংক্তিতে 'চাঁদ' ও 'তাপ শব্দে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ করে তিন মাত্রা ধরা হয়েছে।

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে কলাবৃত্ত ছন্দের পদ কদাচিৎ চোখে পড়ে। কলাবৃত্ত একপদীবন্ধ তাঁর কাব্যে এই রকম —

সে যে) না গ র গু ণে র। ধাম। ২) ৬। ২।
জপয়ে তু হারি। নাম।। ৬। ২।

শুনিতে তুহারি। বাত।
পুলক ভরল। গাত।। (১৬৭ সংখ্যক)

এখানে মাত্রা বিভাগ, দুই - ছয় - দুই (২) ৬। ২।)। প্রথমে দু মাত্রার অতিপর্ব থাকলেও পরবর্তী কালে মাত্রা বিভাগ বিভাগ ছয় - দুই (৬। ২।) ভাগে। মোট দশ (১০) ও আট (৮) মাত্রার এই একপদী বন্ধটি কলাবৃত্তের বিরল দৃষ্টান্ত।

একপদী কলাবৃত্তের আর একটি মাত্রা ভাগ দেখা যায় ছয় - পাঁচ (৬। ৫।) বন্ধে। মোট এগার (১১) মাত্রার এ জাতীয় ছন্দকে বলা হয় - একাবলী। দৃষ্টান্ত —

এ ধনি এ ধনি। বচন শুন। ৬।৫।
নিদান দেখিয়া। আইনু পুন।। ৬।৫।
দেখিতে - দেখিতে। বাঢ়ল ব্যাধি।
যত তত করি। না হএ সুধি (১১)

সর্বত্র অবশ্য এই মাত্রা ভাগ রক্ষিত হয়নি। সেক্ষেত্রে রুদ্ধ দলের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ব্যবহার করে ছন্দোসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। যথা —

না বান্ধে চিকুর। না পরে চীর। ৬।৫।

এখানে 'বান্ধে'কে 'বাঁধে' এই সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে দু-মাত্রা ধরে ছন্দ গণনা করতে হবে। আবার, ছন্দোসাম্য রক্ষার জন্য অনেক স্থলে দীর্ঘায়িত উচ্চারণে বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে মাত্রা সংখ্যা বাড়াতে হয়েছে। যথা —

আছ এ শ্বাস। না রহে জীব। ৬।৫।

এ ক্ষেত্রে 'শ্বাস'কে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে তিন মাত্রা ধরা হয়েছে।

একই পদে কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত—দুই রীতির ছন্দোব্যবহার দেখা যায় চণ্ডীদাসের পদে। যথা—

পথে জড়া জড়ি দেখিনু না গরী ৬।।৬।।
সখীর সহিতে যায়। ৮।
সকল অঙ্গ মদন রঙ্গ
হসিত বদনে যায়।। ৮।৮

এখানে কলাবৃত্ত রীতির ত্রিপদী বন্ধের লঘু রূপটি ছয় - ছয় আট (৬।। ৬।। ৮।) লক্ষিত হয়। অথচ একই পদে নিম্নোক্ত অংশে দেখি —

চণ্ডী দাসে কয় যদি দান হয়ে ৬।।৬।।
কি জানি মা গি বা তায়।
ছটার ঝলকে পরানে চমকে
তিমিরে লাগয়ে ভয়।। (ওই)

এখানে মিশ্রবৃত্তের লঘু ত্রিপদী বন্ধ - ছয় - ছয় আট (৬।। ৬।। ৮।) ব্যবহৃত। কোন কোন দীর্ঘ ত্রিপদী বন্ধে (৮।। ৮।। ১০।) কলাবৃত্তের মাত্রা গণনা রীতি অনুসারে অপ্রান্তিক রুদ্ধদলে দু-মাত্রা ধরা হয়েছে। যথা —

ধরি না পি তি নী বেশ।। মহলে যে পরবেশ ৮।।৮।।
যেখা নে বসি এঞা আছে রাই। ১০।

হাতে দেই দরপনি ধোচল নখরঞ্জনী ৮।।৮।।
বোলে বৈস দেই কামাই। ১০।

এখানে 'নখরঞ্জনী', 'বৈস', অপ্রান্তিক রূপদল দুইমাত্রা গণ্য হয়েছে। (২০৯) সংখ্যক।[৯]

চণ্ডীদাস তৎকালে লোকায়ত সমাজে প্রচলিত লৌকিক ছন্দকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেননি। বিক্ষিপ্ত ভাবে কোন কোন পদে তাই দল সংখ্যাতে মাত্রা গণনার সাপেক্ষে অর্থাৎ দল একক ধরে মাত্রা গণনা করে দলবৃত্ত ছন্দোরীতি (প্রাকৃত ছন্দ) এসে পড়েছে। যথা--১৮০ সংখ্যক পদে—

ধা তা কা তা। বি ধা তা র বি। ধা নে দি লা ম। ছা ই। ৪।৪।৪।১।
জ নম হৈতে। এ কা কে লে। দো সর দি লে। না ই।। ৪।৪।৪।১।

এখানে ছন্দোভাগ—৪।৪।৪।১। এই দলবৃত্ত রীতিতে অবশ্য পরের অংশে আবার মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী পয়ার চলে এসেছে মোট - ছয় (৮।।৬।।) পদ বিভাগে।

না দিলে রসিক মূঢ়।। মুরুখের মনে। ৮।।৬।।
এ মতি আছিল তোর।। এ পাপ বিধানে।। ৮।।৬।। (ওই)

চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে প্রাক্ চৈতন্য যুগের বাংলা মিশ্রবৃত্ত রীতির ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেল। যেহেতু তিনি ছিলেন আত্মতন্ময় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কবি তাই সম্ভবত পদরচনায় একই ফর্ম (form) সর্বদা অনুসরণ করেননি একই পদে। তাই বহু পদেই একাধিক ছন্দোবন্ধ ব্যবহৃত। তাঁর ভাবুক শিল্পী সত্তার পরিচয়ও ছন্দোরীতির এই বন্ধ-বৈচিত্র্য ও রীতি-বৈচিত্র্য থেকে পরিদৃষ্ট হয়।

চণ্ডীদাসের অলংকার ব্যবহার

একান্তভাবে মগ্ন সাধক কবি বলেই হয়তো, বা স্বতস্ফূর্ত প্রাণাবেগই চণ্ডীদাসের কাব্যনিয়ামক হওয়ায়, প্রতিবিম্ব কল্পনার অনুরঞ্জন তথা বহিরঙ্গ অলংকৃতি তাঁর কাব্যে প্রায় নেই। বরং যা আছে, তা কাব্যভাষার সঙ্গে আত্ম-স্বাভাবের মিলিত উপস্থাপনা। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কবিতার অন্তরঙ্গ ভাবজগত সম্পর্কে তাঁর মত প্রকাশে যতটা অনুভূতি পরিস্ফুট, কবিতার অবয়ব কারুকৃতি সম্পর্কে ততটা নয়। অর্থাৎ তাঁর কাব্যভাষা সম্পর্কে আত্ম-সচেতনতা সতর্কিত নয়। কাব্যভাষাকে স্বভাবসিদ্ধ শব্দ মালাতেই ভাববাহী করার অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও ক্ষমতা তাঁর থাকায়, তিনি বহির্জগতের কাব্যানুকরণের বিশেষ মনযোগী হয়নি। 'কাব্যংগ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ'[১০] অর্থাৎ, অলংকারই কাব্য, আচার্য বামনের এই মত যেমন তিনি সর্বদা রক্ষা করেননি, তেমনি, 'সৌন্দর্য্যম, অলংকারঃ',[১১] বা অলংকারই কাব্যের সৌন্দর্য—একথাও অনুসরণ করেননি। তথাপি, তাঁর কাব্যেও অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে যথোপযুক্ত গাম্ভীর্য সহকারে। প্রথমে শব্দালংকার ব্যবহারের আলোচনা করা যাচ্ছে। যথা —

'চান্দ ঝলমল দিক নিরমল পিককুল তারা বোলে।' (৬০ সংখ্যক) [১২]

এখানে অলংকার ধ্বনি অনুপ্রাস। 'ল, স' প্রভৃতি কোমল ব্যঞ্জনের ধ্বনি অনুপ্রাসে ও 'নিরমল'-এর স্বরভক্তি জনিত ধ্বনিবিস্তারে রাধার বিষণ্ণ হৃদয়ক্ষেপটি ভাষাবদ্ধ করেছেন কবি।

পদান্ত মিলের প্রথাসিদ্ধ ব্যবহারের মাধ্যমেও অন্ত্যানুপ্রাসের ধ্বনিঝংকার শ্রুত হয় অনেক পদে। যথা —

সকল অঙ্গ। মনের রঙ্গ। হসিত বদনে চায়। (১৭১)

অথবা,

বিরহ আগুন। দহকে দ্বিগুন। সহন নাহিক যায়। (১৫৩)

কিছু কিছু পদে আদ্যানুপ্রাসের ব্যবহারও লক্ষিত হয়। যেমন —

পরাণ অধিক। নয়ান পুতলি। তিলেকে বসিয়ে হারা। (১৭৫) তবে, উপরোক্ত শব্দালংকার গুলিতে সর্বদাই যেন ধ্বনিসংযম প্রয়াস পরিস্ফুট হয়েছে।

অর্থালংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও চণ্ডীদাস প্রথানুগ সংস্কৃত কাব্যালংকার শাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার চেয়ে, বা অনুকরণের চেয়ে স্বীকরণ করে স্বেচ্ছা প্রকাশে আগ্রহী হয়েছেন। বিশেষ করে উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি অনেকসময় রূপমুগ্ধ গভীরতার কবিকৃতি দেখিয়েছেন। যেমন —

কাহারে কহিব মনের আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে।
যেমন কৃষ্ণর বাউল হইয়া অঙ্কুশ ভাঙ্গিয়া ছুটে।। (৩৫)

এখানে কৃষ্ণ বিরহ বেদনা স্মরণ হেতু রাধার মানসিক সঙ্গলিপ্সাকে কবি আচ্ছাদিত কামনা গভীর তীব্র জ্বালার অনুষঙ্গে উপমিত করেছেন। যেমন করে রিপুতাড়িত হস্তী দ্বিগ্বিদিক জ্ঞানরহিতাবস্থায় অঙ্কুশ ভেঙেও ছুটে চলে, তেমনিই রাধার কৃষ্ণ-সঙ্গ লাভের উন্মত্ত আকাঙ্খা।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের নিম্নোক্ত পদাংশে প্রথাগত উপমান আশ্রয় করেই চণ্ডীদাস আপন প্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের চোখে শ্রীরাধার দেহলাবণ্য স্বর্ণবর্ণদীপ্ত তুল্য। তাঁর পরিহিত নীল বস্ত্রভাণ্ডার ভেদ করে রূপ উথলে উঠছে যখন তিনি যাচ্ছেন। এবং —

বসন ভেদিয়া। রূপ উঠে গিয়া। যেমন তড়িৎ দেখি।[১৩]

অর্থাৎ নীল শাড়ি ভেদ করে রাধার শরীর বিদ্যুৎদামের মতো প্রতিভাত হচ্ছে কৃষ্ণের চোখে। রাধার শরীর তড়িতের মতো—এই উপমা প্রয়োগটি সার্থক করতে কবি রাধার অঙ্গে দিয়েছেন মেঘ সাজুয্যে নীল শাড়ি। মেঘের বুক বিদীর্ণ করে যেমন বিদ্যুৎ, ঝলসে ওঠে, রাধার শরীর ও নীল শাড়ি ভেদ করে প্রতীয়মান হচ্ছে।

উপমা অলংকার কখনো কখনো কবির ব্যক্তিগত জীবনের সাথে একাত্মতা লাভ করেছে। এবং এসবক্ষেত্রে কবির ব্যক্তি জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে বলে মনে হয়। যেমন —

পোড়া কড়ির সমান করিনু নিজ দেহা। (ওই, পৃ. ৬২)

এখানে উপমার আড়ালে কবির সতর্ক প্রয়াসে স্পষ্ট হয় ব্যক্তি জীবনের প্রেম সাধনার কৃচ্ছসাধন। রাধার দেহও পোড়া কড়ির মতো হয়েছে কৃষ্ণপ্রেমের সাধনায়। নিম্নোক্ত উপমাটিতেও কবির ব্যক্তি সত্তার ক্ষণিক উপস্থিতি এসে পড়ে। যথা —

ধীবর দেখিয়া যত মীনগণ যেমন তরাসে কাঁপে।
তেমতি আমার এক ঘর করনে বচন-গরলে কাঁপে।।[১৪] (৩৫)

স্পষ্টই বোঝা যায় উপমা অংকনে কবি লোকাভিজ্ঞতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এখানে। কবির নিজ জীবদ্দশাতেও দেখা যায় যে, রজকিনী রামীর সঙ্গে পরকীয়া প্রেম হেতু তিনি দণ্ডপ্রাপ্ত হন, সমাজে ভর্ৎসিত হন। রাধাও অবৈধ প্রেমে লিপ্ত। তাই পরকীয়া প্রেমের শাস্তিস্বরূপ কবি জীবন্ত উপমা প্রয়োগ করেছেন। ধীবরকে দেখে যেমন জলাশয়ের বদ্ধ মৎস্যরা ত্রাসে কম্পিত হৃদয় হয় তেমনি রাধাও সংসারের কূটবচন বিষে জর্জরিত হৃদয়। ধীবরের সঙ্গে বিষময় বনে ও অসহায় মীনগণের সঙ্গে সংসার ভীতা রাধার উপমা প্রদানে কবির মৌলিক চিন্তা পরিস্ফুট। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই ছায়াপাত ঘটেছে এখানে।

প্রথানুগ উপমা সৃষ্টির মধ্যেও অপূর্ব ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে অনেক স্থলে। যেমন রাধার

রূপ বর্ণনায় দেখি —

'তড়িৎ বরণী হরিণ নয়ণী দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।'[১৫]

এখানে রাধার অঙ্গ বিদ্যুৎ বর্ণের মতো এবং চোখ দুটি হরিণের মতোই চঞ্চল। উপমাটি 'র, ণ' প্রভৃতি ধ্বনিস্পন্দনে গতিশীলতা লাভ করেছে উপমানের সঙ্গে।

কৃষ্ণপ্রেমে রাধা এতই গরবিনী যে সংসার সমাজ তিনি থোড়াই পরোয়া করেন। এমনকি— 'পর্বতসমান কুলশীল তেয়াগিয়া'য় (ওই, পৃ.৫৯) তিনি কুণ্ঠিত নন। এখানে উপমেয় কুলশীল পর্বতের (উপমান) সঙ্গে তুলনীত। রাধা পর্বতসদৃশ অলঙ্ঘণীয় সুউচ্চ কুল (বংশ) ত্যাগ করেছেন কৃষ্ণসঙ্গ কামনায়। এখানেও রাধার অভীপ্সার সঙ্গে কবির ব্যক্তি জীবনের সংঘটনে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ফলে উপমাটিও জীবন্ত হয়েছে চিত্রের মতো।

অন্যান্য অর্থালংকারের মধ্যে সহোক্তি, অতিশয়োক্তি, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, রূপক প্রভৃতির ব্যবহারেও কবি দক্ষতা দেখিয়েছেন। যথা —

চলে নীল শাড়ি। নিঙাড়ি নিঙাড়ি। পরাণ সহিত মোর।[১৬]

এখানে অলংকার সহোক্তি। 'সহিত' শব্দযোগে কবি কৃষ্ণকে এবং নিজেকে একই মানস-ঐক্যে গ্রথিত করেছেন। 'নিঙাড়ি' শব্দটির উপর্যুপরি দুইবার ব্যবহারের ধ্বনি আবর্তনে একটা অতিরিক্ত ব্যাকুল যন্ত্রণা যেন যুক্ত হয়েছে। নিম্নোক্ত পদে অপহ্নুতি অলঙ্কারের সুপ্রযোগ করেছেন কবি। যথা —

ফাগ বিন্দু দেখি সিন্দুর বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ দাগ মিছাই ভাবহ।।[১৭] — এখানে কৃষ্ণ, নিজ অঙ্গে লিপ্ত প্রকৃত বস্তু সিন্দুর বিন্দু ও কঙ্কণচিহ্নকে রাধার কাছে অপ্রাকৃত ফাগ বিন্দু ও কণ্টক দাগ বলে অস্বীকার করছেন। নেতিবাচক কোন শব্দ না থাকায় অলঙ্কার হয়েছে গূঢ় অপহ্নুতি। অন্য নারী উপগত কৃষ্ণের নাগরিক ছলনা 'বিন্দু, সিন্দুর, কণ্টক, কঙ্কণ' প্রভৃতি যুক্তধ্বনি ব্যঞ্জনের অনুরণনে আরও তির্যক ও নেতিবাচক হয়ে উঠেছে।

সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া ছুটিছে মরাল-কুল। (ওই, পৃষ্ঠা.৫৩)। রাধার সজল আঁখি দুটি দেখে সংশয় জাগে যেন তা মানস সরবর, এবং তা ভেবে মরালদল অনুসরণ করছে।

বিদ্যাপতির মতো স্বভাব সতর্ক না হলেও, চণ্ডীদাস অলঙ্কার নির্মাণে ক্ষমতা দেখিয়েছেন। কৃষ্ণের অনিন্দ্য দেহাঙ্কন করতে কবি উৎপ্রেক্ষা ও ব্যতিরেক অলঙ্কার প্রয়োগ করে বলেছেন —

অঞ্জন রঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন বসাইলরে চাঁদ নিঙাড়ি কৈল থেহা।।
থেহা নিঙাড়িয়া কেবা মুখানি বনাইল রে জবা নিঙাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিষফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়িল রে ভুজ জিনিয়া করি - শুণ্ড।। (ওই, পৃ.৫১)

কৃষ্ণের কাজল রঞ্জিত চোখ দুটি যেন খঞ্জন পক্ষী, তার মুখনির্মাণ করতে চন্দ্রনিসৃত জ্যোৎস্না পুঞ্জীভূত করে তাকে আবার নিষ্কাষিত করা হয়েছে। এবং জবা ফুল নিঙড়ে তাঁর গণ্ডদেশ নির্মিত হয়েছে। তাঁর ওষ্ঠ বিম্বফলের চেয়ে এবং বাহু হস্তীশুণ্ডাপেক্ষা উত্তম।

বিনা কারণে ফললাভ হলে বিরোধমূলক বিভাবনা অলঙ্কার হয়। নিম্নোক্ত পদটিতে এর প্রয়োগ করেছেন কবি চমৎকারভাবে, রাধা যতই মনে মনে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ এড়াতে চান, ততই তা তাঁর মনে পেয়ে বসে। কৃষ্ণের অবস্থান পরিহার করতে গিয়ে অজান্তে সেই পথেই যান। কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করবেন না ভাবলেও রাধার জিহ্বা ওই নামই উচ্চারণ করে। তাঁর নাসিকা বন্ধ

করলেও কৃষ্ণের গন্ধ উপস্থিত হয়, কৃষ্ণপ্রসঙ্গ শুনতে না চাইলেও কান যেন সেইকথাই শোনে এবং শেষ পর্যন্ত রাধার আক্ষেপ—

ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব।। (ওই, পৃ:৪৭)

রাধার সমস্ত ইন্দ্রিয় ক্রমেই কৃষ্ণ-অনুষঙ্গ উন্মুখ হয়ে পড়েছে তাঁর অনিচ্ছাতে। নিম্নোক্ত পদে কবি এনেছেন বিরোধাভাস অলঙ্কার। যথা —

রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে অমর করহ তুমি।[১৮] (১২৯)

এখানে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় সাগরে ডুব দিয়ে মৃত্যু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সাগর এখানে কৃষ্ণপ্রেমরস। সুতরাং তাৎপর্য অনুধাবনে বিরোধ দূর হয়। তদগুণ অলংকারের চমৎকার প্রয়োগ দেখি নিম্নোক্ত পদে। যথা —

সোঙরি সোঙরি তুহার নাম সোনার বরণ হইল শ্যাম।। (১১)।

রাধা বিরহে পতিত হয়ে কেবলি কৃষ্ণকে স্মরণ করতে করতে পরিণত হয়েছেন গৌরাঙ্গী থেকে কৃষ্ণাঙ্গীতে। 'স, ঙ, র' প্রভৃতি বর্ণের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে ভাষায় এসেছে কোমল মাধুর্য ভাব।

আগেই বলা হয়েছে যে, চণ্ডীদাস অনেক স্থলেই আত্ম-আবেগকে অধ্যাত্ম আকুলতায় মিলিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁর পদের সুরে আক্ষেপানুরাগ ও আত্মনিবেদনের আকাঙ্খা-প্রয়াস সমধিক। রাধার নিজেকে কৃষ্ণগত প্রাণ রূপে উৎসর্গ করা ও সেজন্য সমাজগত দুঃখবরণ যেন চণ্ডীদাসেরই আত্মচিত্র। পারস্পরিক তুলনার সমানধর্মীতায় বা অভেদাত্মক সাযুজ্য লাভের উপরোক্ত চিত্রগুলি অনেক পদেই ছড়িয়ে আছে। যেমন—রাধার গলায় তা 'ফাঁসী'র মতোই (৫১) আটকেছে, তাঁর বক্ষে 'শ্যামের শেল' (১৩১) ক্ষত হয়ে রয়েছে। 'দরিদ্রের হেম' (৬০) স্বরূপ পিরীতি ' সোনার পপিরি' (৬২)র মতোই দুর্মূল্য হয়ে দেখা দেয় রাধার কাছে। অবশ্য এধরণের প্রয়োগে পূর্বসূরীদেরই অনুসরণ স্পষ্ট। পিরীতির সুচরিত্র অঙ্কনে ব্যবহৃত হয়েছে 'মধু' (৫), 'রসের সায়র' (৯৬), 'রতন' (ওই) 'আনন্দ পাথার' (৩৭) 'চন্দনের' (১৪৩) রীতি প্রভৃতি প্রথানুগ অলঙ্করণ। রাধাকৃষ্ণের প্রেম সমাজে কলঙ্ক স্বরূপ গণ্য হয়েছে। সে কলঙ্ক রাধার কাছে কখনো 'জ্বালা' (৯৮) ময়, কখনো 'পানা'র ন্যায় মিষ্ট (৯৬), কখনো বা বহনযোগ্য 'কলসী' (৫৬)। কলঙ্ককে রাধা মাথায় করেছেন পুজোপকরণের 'ডালি' (৬৭) হিসেবে। সর্বোপরি কৃষ্ণকলঙ্ককে রাধা সুখ মেনে নিয়ে গলার 'হার'[১৯] রূপে পরিধান করেছেন। এসব ক্ষেত্রে দেখা গেল, কবি মাটির কাছাকাছি, লোকায়ত উপমা-রূপকই বেশি ব্যবহার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সার্বিক বর্ণোজ্জ্বল চিত্রোপস্থাপনায় বিশেষণের প্রয়োগও করেছেন। কখনো উপমা রূপকের ভিত্তিতে, কখনো বা স্থির চিত্র নির্মাণে। যথা—কৃষ্ণ দেখা দিয়েছেন—'কালোমানিকের মালা', বা 'গলার মালা'র[২০] (১৬) মতো। 'কালাকানু' (৩৫) কখনও 'রসের নাগর' (১৫৭) আবার কখনো যেন 'কালিয়া নাগ' (ওই)। 'রসিক নাগর' (৬০) হিসেবে রাধার মনে সৃষ্টি করেছেন 'রসের কূপ'(২৬)। তিনি রাধার 'নয়ান তারা' (১৭৫), নয়ান পুতলী' (ওই)। রাধার মনে তিনি 'পাখি' (৭৫) রূপ দুর্লভ-স্বাধীন। রাধার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্খায় কৃষ্ণ সেজেছেন 'মাল্যানী' (২১৮), 'চোর' (৬৯), এবং ভূতের ওঝা' (২)। এখানে কৃষ্ণের প্রাকৃত রূপাঙ্কনে কবির মৌলিকত্ব ও সাহস লক্ষণীয়। এধরণের বিশেষণের প্রয়োগেও কবিভাষা বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়েছে। রাধার রূপচিত্রের ক্ষেত্রে কবি বাহ্য সৌন্দর্য অন্বেষণ করেছেন

নিতান্ত গতানুগতিক ভাবে। রাধা হয়েছেন 'পরাণ পুতলী' (৫), 'সোনার নাতিনী' (ওই), অথবা 'কনক বরণ দরপণ' (১০) তাঁর বরণ-বিজুরী' (১৭৪) সদৃশ। আবার কৃষ্ণ বিরহিত রাধার দেহ 'পোড়া কড়ির সমান' (৭৬), তিনি প্রেমের ব্যর্থতায় 'বাউরী' পারা (৫) কখনো বা 'কাঠের পুতলী'র (১১) ন্যায় মানসিক ভাবে বিক্ষুব্ধ-কঠিন। কৃষ্ণবিরহে বিপর্যস্ত রাধাকে কবি 'বাউলী'[২১] সদৃশ করেছেন। উপরোক্ত অলঙ্কার প্রয়োগে কবি লোকায়ত-ঘরোয়া পরিবেশ থেকেই উপমা চয়ন করেছেন। কবির বাঙালিয়ানার পরিচয় পাই কৃষ্ণের রূপাঙ্কনে, যখন, নীল পাটের শাড়ি পরিহিত কোঁচা সম্বলিত কৃষ্ণ রমনী মনোহর হয়ে দেখা দেন—'নীল পাটের শাড়ি কোঁচার বলনি। রমনী রমন হইয়া বঞ্চিলা রমনি।।[২২] এখানে বহিরঙ্গ কৃষ্ণ রূপের সঙ্গে তাঁর অর্ন্তপরিচয়টুকু সুনিপুণ ভাবে চিহ্নিত হয়েছে। কবির আলঙ্কারিক বোধ যে সুক্ষ্ম ছিল তারও ইঙ্গিত এখানে পরিস্ফুট।

চণ্ডীদাসের চিত্রকল্প সৃষ্টি

কবিতার সৌন্দর্য নির্মিতি বা ভাবরস সৃষ্টি চিত্রকল্পের মাধ্যমেই যথার্থভাবে পরিস্ফুট হয়। পদাবলীর কবিভাষা নির্মাণে চণ্ডীদাসেরও এরকম বহু চিত্রকল্প-ব্যবহার দেখা যায়। সেখানে বর্ণনার মধ্যে দিয়ে জাগ্রত ছবির অনুসারী-পথ ধরে পাঠক খুঁজে পান কবির বক্তব্যও অন্তর্গত অর্থটি। রাধার রূপসৌন্দর্যে কৃষ্ণ মুগ্ধ। তাঁর দেহকে ঘিরে উপজিত প্রেমে বিহ্বল কৃষ্ণের গভীর হৃদয়ার্তি কয়েকটি শব্দবন্ধে গাঢ় চিত্রমাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। কৃষ্ণের এই শূন্য হৃদয়ের অবস্থার চিত্রকল্প —

'শূন্য সে হিয়া রহিল পড়িয়া বস্তু রহল তায়'।২৩

অথবা, আক্ষেপানুরাগের এই পদে দেখি কেবলি শ্যামবন্ধুর কথা মনে পড়ে রাধার। কি করে যে, রূপসৌন্দর্যে বা গুণ সম্পদে তিনি রাধাকে ভুলিয়েছেন তা ভাবতে গেলেই রাধার —

'মুখেতে না সরে বানী দুটি আঁখি কান্দে।' (ওই, পৃ.৬১)।

এখানেও রাধার অন্তরটি কয়েকটি মাত্র শব্দে চিত্রকল্পনায় ভাবরসমুগ্ধ হয়ে উঠেছে।

রাধার মুখ-সৌন্দর্য অঙ্কনে কবি উৎপ্রেক্ষিত হৃদয়ের মৃদু সঞ্চারে পাঠককেও কৃষ্ণের মতো দ্বিধাগ্রস্ত করেছেন। স্বয়ং কামদেবের ফাঁদ যেন রাধার মুখছবি। সে ফাঁদে পড়ে ক্রন্দিত হৃদয়ের চিত্ররূপ দিয়েছেন কবি —

'বদন ছান্দ কামের ফান্দ ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।' (এ-পৃ.৫৪)।

এবং রাধার কুন্তলের অগ্রভাগ যেন সর্পজিহ্বার মতোই লিক লিক করে বেষ্টন করছে মুখ সীমাকে-

'কেশের আগ চলয়ে নাগ ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে।।' (ওই, ওই)।

তাছাড়া, পংক্তি ও পদান্ত মিলের অনুপ্রাসে ও 'ঝুরিয়া' 'ফিরিয়া'র শব্দদ্বিত্বে কবি চাতুর্য সহকারে সংশয়াবিষ্ট করতে পেরেছেন।

মানসিক আকাঙ্খার স্বতস্ফূর্ত স্ফূরণ ভাবঘন মোহনীয় আবেশে উজ্জ্বলতা লাভ করেছে রাধার আত্মনিবেদনের নীরব স্তোত্র চিত্রে —

'তোমার চরণে আমার পরাণে বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।'[২৪]

দৈহিক মিলনের চিরস্থায়ীত্বে রাধার মতো কবিরও ভরসা নেই। তাই চিরন্তন অন্তরমিলনের অপার্থিব চিত্রকল্প রচনা করেছেন কবি পার্থিব বস্তু সমবায়ে যথা —

'হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর মন্দির গো রতন পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায় বিছানা হয়্যাছে গে শ্যামচাঁদ ঘুমায়্যা রয়েছে।।'(ওই, পৃ.৮৭)।

রাধার অন্তরে স্থাপিত শয়নমন্দিরের রত্নপালঙ্কে, কৃষ্ণ নিদ্রামগ্ন। এই ছবিটিতে অপরূপ

মাধুর্য নির্মিত হয়েছে 'অনুরাগের তুলিকা' রূপ 'বিছানার আয়োজনে। চিত্রটির মাধ্যমে গভীরার্থও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

ভাব গভীরতার চিত্রময় রূপ দিতে গিয়ে অনেক সময় আধুনিক মনোভঙ্গিতে কবি লৌকিক অভিজ্ঞতা প্রসূত উপাদান আমদানি করেছেন। এর মৌলিকত্বও আশ্চর্যভাবে সাবলীল। যথা—

'চোরের মায়ে যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কান্দিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পিরিতি করিলে এমতি সঙ্কট তারে।।'[১৫] (৮৯ সংখ্যক)

এখানে পরকীয়া পিরীতির সঙ্কটের উপমায় চোরের মার মানসিক কষ্ট অবিশ্বাস্যভাবে সিদ্ধরসের প্রতিপক্ষ হয়েও নুতনত্ব লাভ করেছে। কুলবতী রমনীর (রাধা) গোপন প্রোমোল্লাস চোরের মায়ের চাপা কান্নার গোঙানিতে বিপরীত চিত্রকল্পে সাজুয্য লাভ করেছে।

কৃষ্ণপিরীতি গত প্রাণ রাধা পিরীতি রূপ রসসাগরে ডুব দিয়েছেন। তাঁর অবগাহন চিত্রটিতে দুঃখের বাতাস বইয়েছেন কবি। যথা —

'পিরিতি রসের সায়র দেখিয়া নাহিতে ডুবিলাম তায়।
ডুবিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগল দুখের বায়।।' (ওই, ৯৬ সংখ্যক)

এই দুঃখের অবৈধ পিরীতিতে কলঙ্কিত রাধা সংসারে কি দুঃসহ গঞ্জনার পাত্র হয়েছেন তার জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন কবি —

'গুরুজন জ্বালা জলের শেহলা পড়শী জিওল মাছে।
কুল পানিফল কাঁটায় গরল সলিল ঢাকিয়া আছে।।
কলঙ্ক পানা সদা লাগে গায় ছাঁকিয়া খাইলু যদি।
অন্তরে বাহিরে কুট কুট করে সুখে দুখ দিল বিধি।।' (ওই, ওই)।

বহিঃপ্রকৃতির চেনা উপাদান মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। 'জলের শেহলা' গুরুজনের জ্বালার বেষ্টনী, 'পড়শী'র পর্যবেক্ষণ যেন' জিওল মাছের প্রকাণ্ড হাঁ, নির্মল সলিলে ঢাকা রয়েছে ' পানিফলের কাঁটা'র মতো বংশ গৌরব। তাই 'কলঙ্ক পানা'য় কালিমা লিপ্ত রাধার শরীর মনে তীব্র কুট্‌কুটানী। উপরোক্ত রূপচিত্রটি নির্মমভাবে প্রকটিত করেছে তৎকালীন সমাজের রূঢ় অঙ্গুলিসংকেত।

নিসর্গ প্রকৃতির বৈচিত্র্য চিত্রকল্পের ভাবানুষঙ্গে আরোপিত হয়েছে চণ্ডীদাসের প্রতিভায়। সদ্যস্নাত রাধার রূপচিত্র উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে কবি বলেছেন —

'সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটিতে পড়্যাছে চিকুর রাশি।
কান্দিয়া আন্ধার কনক চান্দার শরন লইল আসি।।'[১৬]

এখানে দেখি গৌরবর্ণা রাধার সিক্ত কটিতটে কৃষ্ণকুন্তল আছড়ে পড়েছে। এই রূপচিত্রটি কবির কাছে অতিশোয়োক্তির চিত্রকল্প উপস্থিত করেছে যে, যেন আঁধার (কেশ) শরণাগত হয়েছে উজ্জল কিরণ দায়ী চন্দ্রের (রাধার গাত্রবর্ণ) কাছে।

অবিমিশ্র প্রকৃতির চিত্রকল্পের টুকরো টুকরো অংশ পাই চণ্ডীদাসের পদে। যেমন —

'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা কেমনে আইল বাটে।
আঙিনার মাঝে বঁধূয়া তিতিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে।।'[১৭]

কৃষ্ণ এসেছেন রাধার আঙিনায়। কিন্তু প্রকৃতি বিপরীত। মেঘের সজ্জা নেমেছে ঘোর অন্ধকার রাত্রে। সুতরাং শঙ্কিত রাধার চিত্র চিত্র যে কৃষ্ণ ভিজছেন তাঁরই আঙিনায়।

নিম্নোক্ত পদে দেখি, রাধা কৃষ্ণপ্রেমের অন্ত পাচ্ছেন না কিছুতেই। শেষপর্যন্ত অদৃষ্টকে দোষারোপ করেছেন। নিজেকে আত্মদহনের অভিমানে ছিন্নমূল স্রোতবাহী শেওলার চিত্রকল্পে পরিক্লিষ্ট করেছেন। এ জগতে তিনি একা —

'কোন বিধি সিরজিল সোতের শেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে বন্ধু বলি।।' (এ, পৃ. ৭৬)

স্রোতের শেওলা যেমন অনিকেত তেমনি রাধার জীবনে কৃষ্ণের অ-চির প্রেম। এই চিত্রকল্পটির সঙ্গে মহুয়া লোকগাথার মহুয়ার জীবনালেখ্যের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় —

নাহিঁ আমার মাতা পিতা গর্ভ সুদর ভাই
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই।।[২৮]

চিত্রকল্পের উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলির মাধ্যমে একথা বলা যায় যে, মাঝে মাঝে কবির মনোধর্ম ও চিত্ররচনায় উপস্থিত হয়েছে। চণ্ডীদাসের চিত্রকল্পনায় পার্থিব অলঙ্কার আহরণ অপেক্ষা অনুভূতি লব্ধ ঘরোয়া উপাদানই অধিকতর বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

গ্রন্থসূত্র

১. শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু, 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' (১৩৬৭বঃ) পৃ.২৬।
২. ড. নীলরতন সেন, বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় (১৯৬৮) পৃ.১৩৩।
৩. বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত ও সংকলিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' (১৩৬৭ বঃ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), পার্শ্বস্থ সংখ্যা উক্ত গ্রন্থের পদসংখ্যা সূচিত করে।
৪. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (১৯৬৯), রাধাবিরহ, পৃ.৩৩০।
৫. বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত ও সংকলিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
৬. বৈষ্ণব দাস (গোকুলানন্দ সেন, (১৮শ শতক) সংকলিত, সতীশচন্দ্র রায় ১৯৩১-এ সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ) পদকল্পতরু (১ম খণ্ড), পদসংখ্যা ৬৭১।
৭. বিমান বিহারী মজুমদার কৃত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
৮. পূর্বোক্ত পদকল্পতরু (১ম খণ্ড), ১৯৮ সংখ্যক পদ।
৯. বিমান বিহারী মজুমদার কৃত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
১০. আচার্য বামনের 'কাব্যলঙ্কার সূত্রবৃত্তি, সম্পাদনা গৌরী নাথ শাস্ত্রী, প্রথম অধ্যায়, শ্লোক নং ১১।
১১. ওই, শ্লোক নং ১২।
১২. বিমান বিহারী মজুমদার কৃত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
১৩. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৫২।
১৪. বিমান বিহারী মজুমদার কৃত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
১৫. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৭০।
১৬. পূর্বোক্ত পদকল্পতরু (১ম), পৃ.১৪০।
১৭. পূর্বোক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-এর গ্রন্থ, পৃ.৫৬।
১৮. বিমান বিহারী মজুমদার কৃত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
১৯. পূর্বোক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়েরর গ্রন্থ, পৃ.৮৩।
২০. বিমান বিহারী মজুমদার কৃত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
২১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৫।
২২. পদকল্পতরু (১ম), পূর্বোক্ত, পৃ.২৬১।
২৩. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৪।
২৪. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' (১ম সংস্করণ, ১৯৭২) পৃ.৮২।
২৫. বিমান বিহারী মজুমদার কৃত পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
২৬. পদকল্পতরু (১ম), পূর্বোক্ত, পৃ.১৫০।
২৭. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পূর্বোক্ত 'বৈষ্ণব পদাবলী', পৃ.৫৯।
২৮. দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ' মৈমনসিংহ-গীতিকা' (১৯৭৩), মহুয়া, পৃ.১১, (প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা)।

জ্ঞানদাসের কাব্যভাষা

জ্ঞানদাস : ভাষা নির্মিতি

চৈতন্য-উত্তর বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি জ্ঞানদাস। সম্ভবত খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন। তিনি বাংলা এবং ব্রজবুলি—উভয় ভাষারীতিতেই পদ লিখেছেন, তবে বাংলা পদগুলির তুলনায় ব্রজবুলির পদগুলি নিষ্প্রভ; গতানুগতিক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের আলোকে পদ রচনা করলেও, তাঁর কবিভাষা স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। শব্দচয়ন ও প্রয়োগের কৌশল তাঁর বিশিষ্ট কবি মানসিকতারও সাক্ষ্য দেয়। বাক্যরীতি-কৌশলও জ্ঞানদাসের স্বতন্ত্র কবিস্বভাব পরিস্ফুট করে। প্রথমে তাঁর পদে ব্যবহৃত ভাষার ধ্বনিরূপটির পরিচয় আলোচিত হচ্ছে।

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের মাধ্যমে অন্যান্য কবিদের মত জ্ঞানদাসও তাঁর পদাবলীতে একদিকে যেমন ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন, তেমনি ছন্দের মাত্রা সমতা রক্ষারও প্রয়াস পেয়েছেন। প্রধানত শ্রুতি মধুরতার জন্য ব্যবহার করেছেন—'মুরছিত', 'ভকতি',[২] (১৯) 'নিরমিত' (২২), 'উনমাদ' (২৯৫), 'শকতি' (২৯৯), 'বিদগধ' (২১২), 'মনমথ' (২১৩), 'মগন' (৩৬৩), 'স্তবধ' (৪৪৫), 'গরজন' (৪৭৫) প্রভৃতি এবং ছন্দসাম্য রক্ষার্থে যেসব স্বরভঙ্গি বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়, সেগুলি হল—পরমাদ (২৯৭), সরম, করমে (৬০), পরকাশ (৭৯), পরবেশল (১৯৩), বিয়াধি (১২৩), পরকিত (১৩৪) ইত্যাদি।

কাব্যভাষাকে শ্রুতি মধুর করতেও একই স্বরধ্বনির পাশাপাশি অবস্থান হেতু ধ্বনিসাম্য সৃষ্টিতে স্বরসঙ্গতি বিশেষ সহায়ক। জ্ঞানদাসের শব্দাবলীতে স্বরসঙ্গতির বেশ উল্লেখ দেখি। যেমন—মাগল (১০), অভরন (১১), বলিলি (৯১), নিতিনিতি (১১৮), খসল (১১২), ভরল (৩৩৮), দুরুজন (১৮৭), রাতিদিনি (২২১), কিরিতি (৩০১), খেনে খেনে (৩৮৪) ইত্যাদি।

কৃত্রিম নাগরিক বা সাধুভাষার চল সেকালে কম ছিল। এবং কথ্য বা চলিত ভাষার শব্দ অনায়াসে কাব্যভাষায় এসেছে। এই ধরণের শব্দ ব্যবহার ছন্দে সমতা রক্ষায় যেমন সহায়তা হয়েছে, তেমনি শুনতেও নতুন লেগেছে। স্বরধ্বনির উচ্চারণ পরিবর্তনজনিত এই শব্দগুলিকে অপিনিহিতি বলে। যথা—লেখ্যা (১১), ব্যায়া, পড়্যাচ্ছে (২৪২), বান্ধ্যাছে (১৬৪), নায়্যা (৩৩৬), গায়্যা (৩৯০), আলা (১১৮) ইত্যাদি।

যুক্তবর্ণের একটিকে উচ্চারণ না করে বিলোপ করে কাব্যভাষায় ধ্বনি-সাম্য আনা হয়েছে। ছন্দের মাত্রা সমতাও আনা হয়েছে। ছন্দের মাত্রা সমতা রক্ষায়ও এই প্রথায় কার্যকারী। জ্ঞানদাসও বর্ণলোপের মাধ্যমে এই কবি কৌশল ব্যবহার করেছেন। যথা—পরথে (২৩), হিলোল (২২,৭২), পহর (২৭), কাঁতি (৪১০), উসলিত (১২৭), অলখিতে (২২৮), দখিন ২৮৯), পাঁতরে (৩০৫), নিচয় (৬৮), নিঠুর পনা (ওই), মরমর (৭৯), কটাখে (৩২) প্রভৃতি।

ধ্বনিরূপের মতো শব্দরূপের বিভিন্ন প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি পদাবলীর ভাষা-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের মধ্যে বর্তমান কালের প্রথম পুরুষ 'এ, ত, ই', প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহৃত। যথা—ধরিয়ে, দেখিয়ে, বাজেছে (১১৮), বহয়ে (১২৩), বাজত (১২৫), তেজই,

ঝরএ, বুঝএ (১৩১) সম্বাদএ, বিরাচই (১৩৫), শোভিত, দোলিত (৩২), সিনায়ত করু বর্তমান কালের মধ্যম পুরুষে (ও, অ, সি' প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহৃত। যথা—বুঝও (২২৪), ফরহ (২৮), পরিহর (ওই), বুঝ (২৯), বোলসি (২৮) প্রভৃতি। বর্তমান কালের উত্তম পুরুষে—'ই, এ, ওই' প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহৃত। যথা—চলইতে চাহি (২৮), সমুঝয়ে—উপজে (ওই), দিয়াছি (১২৬), দেখি (১৩৫), আকি (১৫৬), অনুভবই (১৪৭), চু ষই, আলিঙ্গই (২১৩) প্রভৃতি।

ধ্বনিরূপের মতে শব্দরূপের বিভিন্ন প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর পদাবলীর ভাষা-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের মধ্যে বর্তমান কালের প্রথম পুরুষে 'এ, ত্, ই,' প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহৃত। যথা—ধরিয়ে, দেখিয়ে, বাজেছে (১১৮), বহয়ে (১২৩), বাজত ৯১২৫) তেজই, করএ, বুঝএ (১৩১), সম্বদএ, বিচারই (১৩৫), শোভিত, দোলিত (৩২), সিনায়ত করু (২৬), ঝলকে (৯৮), নাচিছে (১৫৬), দুলিছে (৯৪) প্রভৃতি। বর্তমানে মধ্যম পুরুষে 'ও, অ, সি' প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহৃত। যথা—বুঝও (২২৪) ফরহ (২৮), পরিহর (ওই), বুঝ (২৯), বোলসি (২৮) প্রভৃতি। বর্তমান কালের উত্তম পুরুষে—'ই, এ, ওই' প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহৃত। যথা—চলইতে চাহি (২৮), সমুকয়ে—উপজে (ওই), দিয়াছি (১২৬), দেখি (১৩৫), আকি (১৫৬), অনুভবই (১৪৭), চুম্বই, অলিঙ্গই (২১৩) প্রভৃতি।

ভবিষ্যৎ কালের প্রথম পুরুষে ব্যবহৃত হয়েছে—'আঙ, বে, ব' প্রভৃতি প্রত্যয়। যেমন—ঘুচাঙ ঘুচিবে (১২৩), সুধাব, পাঙ (২৫৫) প্রভৃতি। ভবিষ্যতের মধ্যম পুরুষে প্রধানত 'বি' প্রত্যয়। যথা—বঞ্চবি (১৩২), কহবি (২৯) ইত্যাদি।

ভবিষ্যতের উত্তম পুরুষে—'ব' প্রত্যয়ের বিশেষ ব্যবহারে দেখি। যথা—বলিব (১৩৩), কহব (ওই), যাব, দিব, পাঠাব (৯১), করব (১৪১), হারাব (১৪০) প্রভৃতি।

লৌকিক ভাষার কাছাকাছি আনার প্রয়াসে বিশেষত ক্রিয়াপদের নানারূপে কবি আনুনাসিক বর্ণ 'ঞ', 'ঙ' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে এনেছেন। যথা—ধাঞা, গিঞা (১৩), পরাঞা (১৪), নাঞি, ঠাঞি (৬১), তেঞি (২৪১), দেখিঞা, যাইঞা, কান্দিঞা, বসিঞা, হঞাছে (১৮৮), সঞে (২৭, ৪১৩) সোঙারি (৫৩, ৩০৭), পাঙ, যাঙ (২৬৬) প্রভৃতি।

জ্ঞানদাসের অনেক পদে প্রবচন প্রৌঢ়াক্তির সাহায্যে কবিতার কেন্দ্রিয় বা মূলভাবকে বা অনেক সময় প্রাসঙ্গিক ভাব বা বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার কবি কৌশল লক্ষণীয়। রাধার অল্প বয়স, অথচ কৃষ্ণের রতি তৃপ্তির বাসনা। এই বাসনাকে পরিস্ফুট করা হয়েছে 'না পুরে অল্প ধনে দারিদ আশ' (৭১) এই প্রবচনে। 'রাধার বয়স অল্প ধন' এবং কৃষ্ণের বাসনা দারিদ্রের আশা এই প্রবাচনিক উপমায় কথিত।

৪৬ সংখ্যক পদে অনেকগুলি প্রবচন বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—'ঝাঁপল শৈলশিখরে এক পানি'—রাধাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছেন কৃষ্ণ। রাধা কৃষ্ণের কাছে সহজলভ্য সুলভ হয়ে গেছেন। তাঁর দুর্লভত্ব খর্ব—এই মনঃপীড়াকে জ্ঞানদাস উক্ত প্রবচনে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ পাহাড়ের চূড়া তুল্য রাধাসঙ্গ যেন কৃষ্ণের এক হাতের তালুতে সহজেই বন্দী বা ঢাকা পড়ে গেছে আজকাল। ওই পদেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল' এই প্রৌঢ়োক্তিটি। এখানে রাধার সঙ্গ কৃষ্ণ এত বেশি পেয়েছেন যে রাধা তাঁর কাছে একঘেঁয়ে হয়ে পড়েছেন। রাধাকে কৃষ্ণের আর তাই পছন্দ হচ্ছে না—রাধার নিদারুণ এই মর্মজ্বালা তাঁর এই প্রত্যাখ্যাত অবহেলিত অবস্থার সঙ্গে উপরোক্ত প্রবচনটি একাকার হয়ে গেছে। সত্যিই তো, বাসি ফুলে

গ্রথিত মালাকে কেই বা তেমন পছন্দ করে? বাসি ফুলের মালা পূজার কাজে অচলিত, সুতরাং তা বর্জনীয়। ওই পদেই আর একটি ব্যবহৃত প্রবচন উল্লেখ্য, 'পানী তৈল নহে গাঢ় পিরীত'—কৃষ্ণের সাথে দেখা করে রাধার আর ফললাভ হচ্ছে না। তার প্রতি কৃষ্ণের প্রেম এখন আর পূর্বের মতো দুর্বার নয়। এখন সেখানে ভাটার টানের দুস্তর ব্যবধান। কৃষ্ণের প্রেমের এই রীতিকে কবি পরিস্ফুট করেছেন উক্ত প্রবচনের মাধ্যমে। অর্থাৎ, জলের সঙ্গে তেলের মিশ্রণ যেমন সম্ভব হয় না তেমনি এই মুহূর্তে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমেও অবিমিশ্র মিলন হচ্ছে না। রাধা কৃষ্ণের প্রণয় এখানে তেল জলের বস্তুগত অমিশ্রণে বন্ধ হয়েছে কবির বাক্‌চাতুর্য ও লোকাভিজ্ঞতার মাধ্যমে। পূর্বরাগের এই পদটিতে প্রণয়াসক্ত রাধার অন্তরটিকে কবি অভিব্যক্ত করেছেন একটি সুন্দর প্রবচনের সাহায্যে—'না জানি কি আর অন্তর সুখে আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে।' (১২৪) এখানে রাধার প্রথম প্রণয়জনিত উল্লসিত হৃদয়কে কবি ব্যঞ্জনায় উন্মোচিত করেছেন। আঁচলে স্বর্ণখণ্ড বাঁধা থাকলে যেমন রমনীর গর্বিত মুখাবয়বে ফুটে উঠে এক অকথিত দীপ্তি, তেমনি কৃষ্ণরূপ স্বর্ণ লাভ করে রাধাও গর্বিতা। তাঁর মুখাবয়বে সেই গর্বই দীপ্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

রাধার গোপন অভিসার মিলন সখীদের কাছে হঠাৎ ব্যক্ত হওয়ায় একদিকে তাদের সাহায্যে কৌতুক ও অন্যদিকে রাধার অপ্রস্তুত লজ্জা রসোদ্‌গরের নিম্নোক্ত পদটির উপজীব্য। কবি একটি লোকায়ত বচনের সাহায্যে রাধার এই ছলচাতরি উদঘাটনের ব্যাপারটি স্পষ্ট করেছেন —

চোরিক বচন কহত সব গুরুজন
সো সব পাওলুঁ সাখি।
দশদিন দুরজন সুজনে একদিন
আজ পেখলুঁ নিজ আঁখি।। (২৪৪)

অর্থাৎ রাধার চৌর্য (মিলনের জন্য) বৃত্তির কথা বাড়িতে যে গুরুজনেরা বলতেন, রাধা বরাবর তা অস্বীকার করতেন। তবে দশদিন চোরের (রাধার) হলেও সুজনের একদিন আসে যখন সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কৃষ্ণঅনুরাগের বিষে রাধার সর্বাঙ্গ জর্জরিত হয়েছে, কিছুতেই নিজেকে বশ করতে পারছেন না। এই ব্যাপারটি কবি 'কাল নাগে খেদাইলে নাহি শুনে মন্ত্র' (২৪৯)র লোকাভিজ্ঞতার নিরিখে তুলে ধরেছেন। কাল সাপের গ্রাসে পড়লে মন্ত্রও নিষ্ফল হয়, কৃষ্ণ অনুরাগে পড়ে রাধাও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছেন। রাধা আর একটি পদে সখীকে বলেছেন যে, কৃষ্ণের জন্য তিনি কুল-শীল-মান সবই ছাড়তে পারেন। তাঁর এই কৃষ্ণানুরাগ থেকে জীবিতাবস্থায় বিচ্ছেদ অসম্ভব। এ যেন নিক্ষিপ্ত শর (অনুরাগ), যাকে আর ফেরানো যায় না কোন মতেই। রাধার এই কৃষ্ণময় অন্তরকে 'খেপিল বান যেন রাখিল নয়' (২৬৩) এই প্রবচনের সাযুজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জ্ঞানদাস।

যে কৃষ্ণ রাধাকে চোখের আড়াল করতে চাইতেন না, সেই কৃষ্ণই রাধার কাছে সুদুর্লভ হয়ে গেছেন সন্দেশের মত। পরাধিনী রাধার, কুল কামিনী রাধার এই অর্ন্তজ্বালা একটি মাত্র প্রবচন বাক্যে কবি অসাধারণ নৈপুণ্যে ব্যক্ত করে তুলেছেন। 'ঘর হইতে অঙিনা বিদেশ' (৬৭) অর্থাৎ মেয়েরা সাধারণত ঘরে থাকতেই অভ্যস্ত তাই তাদের কাছে আঙ্গিনাও বিদেশ তুল্য অপরিচিত। এই ব্যঞ্জনাতেই বোঝা যায় যে, রাধার কৃষ্ণদর্শন হীন জীবন কেমন করে কাটছে।

প্রৌঢ়োক্তির সাহায্যে জ্ঞানদাস যেমন ভাষার অন্তর-প্রকৃতিতে জোর বা তীব্রতা সঞ্চার করেছেন, তেমনি কোন কোন পদে সংলাপভঙ্গীর সাহায্যে নাটকীয়তা এনেছেন। বাল্যলীলা

সম্পর্কিত এই পদটিতে রাধা তাঁর গৃহে বিলম্বে ফেরার কারণ স্বরূপ জননীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এই বলে—

মাগো, গেনু খেলাবার তরে।
পথে লাগি পেয়ে এক গোয়লিনী
লৈয়া গেল মোরে ঘরে।।
গোপরাজরানী নন্দের গৃহিনী
যশোদা তাহার নাম।
তাঁহার বেটার রূপের ছটায়
জুড়ায়ল মোর প্রাণ।। (১০)

কৃষ্ণের এমন আকর্ষণীয় রূপচ্ছটা বালিকা রাধা এখানে এরকম স্পষ্ট করে ও মধুর করে বলতে পেরেছেন ভাষায় সংলাপভঙ্গি ব্যবহার করে। নাপিতানী বেশে কৃষ্ণ রাধার কেশ প্রসাধন করেছেন এবং রাধার পায়ের নীচে আলতা দিয়ে নিজের নাম লিখে দিয়েছেন। তা দেখে 'ঢলিয়া পড়িল রাই নাপিতানী কান্ধে' (১৫) পরে তিনি কৃষ্ণকে বলেছেন —

শুনহে রসিক নাগর বন্ধুয়া চরণে ধরিয়া বলি।
কেনে বা করিলে চরণ পরশ অপরাধ ক্ষম তুমি।।
মনেতে যে কর নানা বেশ ধর কেহো সে লখিতে নারি।

উত্তরে কৃষ্ণ বলেন —

তুয়া অনুরাগে রহিতে না পারিতেই নানা বেশ ধরি।।

রাধা বললেন —

তেঞি সে তোমারে কহে সবজন রসিক মুরারি-বলি। (১৭)

এখানেও উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে ভাষা যেমন ধারালো ও স্পষ্ট হয়েছে তেমনি তার সাহায্যে নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সংলাপ মূলক নাটকীয় পদগুলির মধ্যে ২৬১ সংখ্যক পদটি সমস্তই রাধাকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তরে গ্রথিত। আদ্যাবৃত্তি অলঙ্কারে রচিত এই পদটিতে রাধা কৃষ্ণের পারস্পরিক অনুরাগ ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে এবং পাঠকের মনে রসাবেশ সঞ্চার করেছে। রাধার অনুরাগের প্রকৃতি এবং কৃষ্ণের অনুরাগের প্রকৃতিও কবি এর মাধ্যমে কুশলতার সঙ্গে উদঘাটিত করেছেন। লক্ষণীয় যে, রাধার প্রেমানুরাগে আছে প্রধানত আত্মসমর্পণ ও হৃদয়ার্তি; অন্যদিকে কৃষ্ণের ক্ষেত্রে বহিরঙ্গে সন্তোষ বিধান কৌশল ও খুশী করার প্রচেষ্টা ও মনোভাবে চাটুকারবৃত্তি প্রকট। সংলাপাত্মক ভাষারীতি ব্যতীত এই বিসমতা স্পষ্ট হতে পারত না সম্ভবত। যথা —

রাধা — তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
কৃষ্ণ — তুয়া অনুরাগে হাম গোলক ছাড়িলাম।।
তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই।।
রাধা — তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ি।
কৃষ্ণ — তুয়া অনুরাগে হাম পীতম্বর ধারী।
রাধা — তুয়া অনুরাগে হাম হইনু কলঙ্কিনী।

কৃষ্ণ — তুয়া অনুরাগে নন্দের বাঁধা ধেনু আমি।।
রাধা — তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
কৃষ্ণ — তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হৈল আঁখি।।
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।
(কবি) জ্ঞানদাস— চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাসের গান।। (১৬৯)

শেষ পংক্তিটি কবি কৃষ্ণের ছলনাকে নিজেই ব্যঙ্গ-কৌতুক করছেন যে, তিনি রাধা বই আর কিছু জানেন না, একথা সর্বৈব মিথ্যা—কেননা, তিনি চন্দ্রাবলীকে বেশ ভালোই জানেন।

শব্দশিল্পে যথার্থ প্রয়োজন জ্ঞানদাস অপূর্ব কৌশলে পার্থিব ইন্দ্রিয়াবেগকে শব্দ ঝঙ্কারের সাহায্যে মায়াময় করে তুলেছেন। যুগল মিলনের এই পদটিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের পুন পুন প্রয়োগে কাব্যের ভাষা এখানে দেহ মিলনের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মতই মুখরিত। ব্রজবুলি ও বাংলা শব্দের মিশ্রণে ভাষা হয়েছে গতিশীল —

'যবহুঁ কয়ল পহুঁ লহু লহু বাত।
তবহুঁ কয়ল ধনি অবনত মাথ।।
যবহুঁ ধয়ল পহুঁ অঞ্চল পাশ।
তৈখনে ঢল ঢল তনু পরকাশ।। (১৯৯)

এখানে শব্দাত্মিক 'হুঁ' ধ্বনি, 'লহু লহু', 'ঢল ঢল' প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক 'যবহুঁ —তবহুঁ', কয়ল - ধয়ল' প্রভৃতি নিত্যসম্বন্ধী অব্যয় ও শব্দমেলের সাহায্যে যুগল মিলনের দৃশ্যে রাধার লজ্জানম্র, কম্পমান অন্তর ও ভাবালস দেহমনের অপূর্ব রূপচিত্রে অঙ্কিত হয়েছে।

পদান্তমিলের ও পংক্তি মিলের সাহায্যেও ভাষাভঙ্গির বিশিষ্টতা সম্পাদন করেছেন জ্ঞানদাস। যথা—'গৌর-চোর-ত্রসনি', 'অঙ্গ-রঙ্গ-ভাষানি', 'চান্দ-ফান্দ-লায়নি', 'ধার-অপার-বেলিনি', 'মন্দ-ফন্দ-দোলনি', 'দেহ-মেহ-চাহনি', 'কাল-দয়াল-গাহনি', (২১)। অবশ্য 'গ্রাসনি', 'ভাষনি', 'লায়নি', 'বোলনি', 'দোলনি', 'চাহনি', 'গাহনি' প্রভৃতি বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'নি' এই অর্থহীন ধ্বনিযুক্ত হয়ে ছন্দের মাত্রা সাম্য ও শ্রুতি মাধুর্য সৃষ্টি করেছে। ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'সি', এই অর্থহীন ধ্বনিযুক্ত হয়ে ছন্দের মাত্রা সাম্য ও শ্রুতি মাধুর্য সৃষ্টি করেছে। ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'সি', এই অর্থহীন ধ্বনি যুক্ত করে কখনো অসমাপিকার রূপ, কখনো ঘটমান বর্তমানে, কখনো বা, সামান্য অতীত কালের শব্দসূচী তৈরি হয়েছে। ৪২ সংখ্যক পদটি এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই পদে ব্যবহৃত শব্দগুলি হল—'বসসি', 'ফান্দাওসি', 'গাঁথাসি', 'মখসি', 'গনসি', 'চালসি', 'বিছাওসি', 'মাগসি', 'ধরসি', 'গিলসি', 'থাপসি', 'বোলসি', 'রহসি', প্রভৃতি। সখীদের বক্রোক্তি 'সি', ধ্বনির উষ্মবর্ণীয় উচ্চারণে পদটির মধ্যে একটা Suspense বা সন্দেহ সংশয় লক্ষিত হয়। ছন্দের মাত্রাসমতা রক্ষাতেও কবির এ প্রয়াসটি প্রশংসাযোগ্য। চৈতন্য-উত্তর পদাবলীর ভাষার ক্ষেত্রেও জ্ঞানদাস গৌরাঙ্গের সর্বাঙ্গীণ প্রভাব মেনে নিয়েছেন। কিছু কিছু বিশিষ্টার্থক শব্দ প্রয়োগ লক্ষ্য করে এ কথা বলা চলে। যেমন—'লাবণ্য' শব্দটির প্রয়োগ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে এবং রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক পদেও শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। শরীরী মাধুর্য ও গুণগতধর্ম সৃষ্টি করতে এই শব্দটি অনবদ্য। যেমন—গৌরাঙ্গ সর্বাত্মক অর্থে হচ্ছেন 'লাবণ্যসার' (২২) কৃষ্ণকে দেখে রাধার মনে হয়েছে 'লাবণ্যঝুরয়ে' (৫৮) 'লাবণ্য ফুল' (২০১) দ্বারা রাধা অর্চনা করেছেন অনঙ্গকে ১৪৭, ১৫৪, ১৫৫ নং পদগুলিতে লাবণ্য হয়েছে লীলা প্রকাশি, রাধার কেশবেশকে বিশেষিত করেছে 'ললিত লাবণ্য' (১৬০) লাবণ্য

দ্বারা বিধি কর্তৃক রাধার অঙ্গ সজ্জিত হয়েছে (৪১১) এই পদে।

গৌরাঙ্গের গাত্র বর্ণ স্বর্ণকান্তি বিশিষ্ট তাঁর মূর্তি যেন 'কাঞ্চন-কাঁতি (২০), বর্ণ। 'কমল কণক' (২১) তুল্য। রাধার অঙ্গ শোভাও 'কনক কাঁতি' (২৬) সমান। ৮০ নং পদে গৌরাঙ্গের বর্ণনায় পাই যে তিনি 'কাঞ্চন-বরণ' তুল্য কখনো বা 'কাঁচা কাঞ্চন' (৭৪) সমান।

রাধার 'যৌবন'কেও কবি নানা পটভূমিতে বিভিন্ন শব্দাবেশে স্থাপন করে বিশিষ্টতা দান করেছেন। 'যৌবন জল তরঙ্গ' (২৬) রাধার ত্রিবেণীর ঢেউ স্বরূপ। যৌবন ক্ষণস্থায়ী। এর ক্ষণস্থায়ীত্বের ধর্মটিকে প্রকাশ কল্পে কবি ব্যবহার করেছেন 'চিরদিন না রহে কুসুমে মকরন্দ', 'পহরে না পাইয়ে দুতিয়াক চন্দ', 'অননিশি না রহে চন্দনরেহ' (২৭) প্রভৃতি উপমার আপ্তবাক্য। ঢেউয়ের উত্থান পতনের অনিবার্যতায় ১৪৪ নং পদে যৌবনকে রূপদান করা হয়েছে। 'ঢল ঢল যৌবন' (১৪৬) কৃষ্ণরূপকে আকর্ষণীয় করেছে। আর রূপানুরাগিনী রাধা 'যৌবন'কে যেচে দান করেছেন ১৪৩ সংখ্যক, ১৭৯ নং পদে, যেন যৌবন সফলতা প্রাপ্ত হয় (২৩৬), অন্যথায় যৌবন বৃথা। যৌবনকে আলঙ্কারিক বাক্-চাতুর্যে নতুনত্ব দেওয়া হয়েছে নিম্নোক্ত পদে। যমুনার উথাল-পাথাল জলে কৃষ্ণের নৌকা টলমল। কাণ্ডারী কৃষ্ণের হাত থেকে বৈঠা স্খলিত হয়ে পড়েছে। নৌকার এই বেসামাল অবস্থার জন্য কৃষ্ণ বেশবাস পরিহিতা নৌকারূঢ় রাধার ভারী শরীরকে দায়ী করেছেন। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। অতএব কৃষ্ণের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত এই যে —

'এতদিন নাহি জানি লোকমুখে শুনি
যুবতীর যৌবন এত ভারী।
নিজ অঙ্গ বাস ছাড় যৌবন পাতল কর
তবে তো বহিয়া যাইতে পারি।।'

(৩৪১) 'যৌবন পাতল কর' এই অসামান্য মৌলিক বাক্-ভঙ্গিমায় জ্ঞানদাস কৌতুককর পরিবেশের মধ্যেও জীবন্ত ভাষা চিত্র অঙ্কণ করেছেন। 'পাতল' শব্দ প্রয়োগের মধ্যেই কবির সূক্ষ্ম রসবোধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রাম্য শব্দ 'পাতলা' থেকে কবি কাব্য প্রয়োজনে 'পাতল' শব্দটি গড়ে নিয়েছেন। যৌবন পাতল করার ইঙ্গিত করেছেন কৃষ্ণ —বিরহাকুল রাধা ঠিক উলটো কথা বলে কেঁদেছেন ২৫২ সংখ্যক পদে। এখানে কৃষ্ণ বিরহে কাতর হয়ে রাধা নিজ যৌবনকে ভারী জ্ঞান করেছেন—'তোমাবিনু জীবন যৌবন মহাভার'। যৌবন ধর্মের অসাধারণ আরোপ করেছেন কবি ১৫৮ নং পদে। যৌবনের এই উপমা চিত্রটি বাংলা কাব্য-সাহিত্যেই তুলনাহীন—'যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল'—এখানে, কৃষ্ণের ঢলঢল যৌবন রাধার কাছে পথহীন অরণ্যের মতো নিবিড় বোধ হয়েছে। ওই অরণ্যে মন দিয়ে পথ খুঁজে পাচ্ছেন না রাধা। রাধার পথভ্রমকে যৌবনের বনে মন হারানোর তুলনা দিয়েছেন কবি। এই রকম মৌলিক বাক্-রীতির প্রয়োগ জ্ঞানদাসই করেছেন। শরীর বস্তু এখানে অনির্দেশ্য দুর্গমতায় রহস্যময় ও রোমান্টিক সৌন্দর্য মণ্ডিত। কৃষ্ণের যৌবন অরণ্যে রাধা নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছেন মনে মনে।

প্রত্যেক কবিরই শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রবণতা থাকে। জ্ঞানদাসও ব্যতিক্রম নন। তাঁর পদাবলীতে যে সমস্ত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ পুন পুন ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে আছে 'পুলক' যথা—'পুলক-পত্র' (১৯), 'প্রচুর পুলক' (২১), পুলক-রোমাঞ্চিত গৌরাঙ্গ মূর্তি—'পুলকের শোভা কিবা নবনীপ মূল' (৭৪) গৌরাঙ্গের দেহখানি--'পুলক-উজোর' (৭৭) অর্থাৎ পুলকে উজ্জ্বল, বা ৮১ নং পদে সাত্বিক ভাব বিভোর গৌরাঙ্গের অবস্থা—'বিপুল পুলক শোভে গৌর

কলেবরে।' প্রেম শব্দেরও বিচিত্র ব্যবহার করেছেন কবি। যথা—রাধা কৃষ্ণের অনুরাগে হয়েছেন—'প্রেম বাউল' (৫০) ' প্রেম অঙ্কুর' (৭৯) জন্মেছে গৌরাঙ্গের পুলক রোমাঞ্চে। রাধার পূর্বরাগে দেখি, তিনি 'শ্যামের প্রেমের বনে' (১১৮) আকুল হয়ে ভেসে চলেছেন' মহা যোগিনীর পারা'। 'প্রেমজলে' (১২২) তাঁর আঁখি পরিপূর্ণ।

রাধা, কৃষ্ণকে ক্রয় করেছেন এবং কবির মতে সেজন্য রাধাকে 'প্রেম-ধন' দিতে হয়েছে উপযুক্ত পরিমাণে। জ্ঞানদাসের কবি স্বভাবের রোমান্টিকতার কথা আগেই বলা হয়েছে। রোমান্টিকতার জন্যে তিনি তৎকালের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি কাব্য ক্ষেত্রে আধুনিকতার অগ্রদূত। এই রোমান্টিক কবি মন প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা যেমন তাঁকে সহায়তা দান করেছে তা সম্পদস্থল, তাঁর বিশিষ্ট বাক্য ব্যবহার ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথার্থতা তাঁর এমন বাক্য (বা বাক্যগুচ্ছ) আছে যা একই সঙ্গে যথার্থ প্রয়োগে ভাস্বর, বা অন্যদিকে যা মধ্যযুগীয় কবির পক্ষে অকল্পনীয়ভাবে আধুনিক। কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করা হচ্ছে—প্রথম মিলনে সমাগত কৃষ্ণের সামনে রতি—অপটু রাধার ব্যাকুলতা ও ভয়কে কবি সুন্দর অভিজ্ঞতায় ব্যক্ত করেছেন একটি সংকেত বাক্যে। কৃষ্ণ, রাধার পরিধেয় বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করতেই তাঁর হৃদয় অজানা আশঙ্কা ও লজ্জায় কেঁপে ওঠে 'এই প্রসঙ্গটিকে কবি ব্যক্ত করেছেন 'অঞ্চল পরশিতে অন্তর কাঁপ রজনী সহয়ে কিয়ে এত এ আলাপ।।' (৩৫) এই ব্যঞ্জনার মাধ্যমে। কৃষ্ণের প্রেমে মাতোয়ারা রাধার ঘর, স্বামী আজ তাঁর কাছে বিষের মত লাগছে। কিছুতেই তিনি কৃষ্ণ আসক্তি ত্যাগ করতে পারছেন না। কৃষ্ণ তাঁর চোখের সামনে থেকেও শুধুমাত্র চোখে থাকে না, তিনি সর্বদাই ঠাঁই পেয়েছেন—তাঁর হৃদয়ে—'আঁখি রৈয়া আঁখে নহে সদা রহে চিতে।' (৬৪)। রবীন্দ্রনাথের 'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই নয়নের মাঝখানে নিয়াছ যে ঠাঁই।'[২] এই অংশের সঙ্গে এর আশ্চর্য ভাবগত মিল বর্তমান। দানলীলার এই পদটিতে দেখা যায় যে, 'রাধার যৌবনপুষ্ট শরীরের বিভিন্ন অংশের দান হিসাবে কৃষ্ণ দানী সেজে পথে তাঁকে আটকেছেন। প্রথম দিকে কৃষ্ণের এই অবাস্তব ও অসঙ্গত প্রস্তাবে রাধা আমল না দিলেও কৃষ্ণের নাছোড়বান্দা প্রয়াসে ও আসল উদ্দেশ্য বুঝে রাধা শঙ্কিত। দুঃখে ক্ষোভে নিজ দেহ ও যৌবনের প্রতি তাঁর বিপন্ন উক্তি —

ঘরে বৈরী ননদিনী পথে বৈরী মহাদানী
দেহের বৈরী হইল যৌবন।[৩] (৩২৮)

অর্থাৎ রাধার বাড়িতে প্রতিবন্ধক তাঁর ননদিনী, পথে প্রতিবন্ধক মহাদানী তথা কৃষ্ণ। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় বাধা হল তাঁর সৌন্দর্য মণ্ডিত নিজ রূপ দেহ যৌবন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, চর্যাপদেও, কবি লিখেছেন—'অপনা মাংসে হরিণা বৈরী।'[৪]

মান পর্যায়ের এই পদটিতে কৃষ্ণের বিরহ চিত্র কবি দূতীর মুখে রাধার কাছে ব্যক্ত করেছেন। রাধার বিরহ তাঁর ইন্দ্রিয়-বিপর্যয় পর্যন্ত ঘটিয়ে দিয়েছে। 'বিরহ' এই ভাবদশাকে, এই অর্ন্তগূঢ় অনুষ্ঠানকে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ভাবনায় চিত্রিত করেছেন। রাধার বিরহে তাঁর তনু এমনই শীত-কম্পমান যে, ধরণীকে আলিঙ্গন করেও এবং রৌদ্রেও তা দূরীভূত হচ্ছে না। এখানে বিরহকে প্রবল শীত কল্পের কাঠিন্য ও যন্ত্রণাসমৃদ্ধ করেছেন কবি। এবং তাকে আরও প্রবলতা দিতে রৌদ্র সিক্ত ধরণীর ভূমিকা। এই অসামান্য কথা চিত্র কল্পনাটি হোল —

বিরহে আকুল গোকুল গতি অতি
রতি-পতি বিপরীত চিতে।

তুয়া রসে বিলপই ধরণী আলিঙ্গনই
রৌদ্রে বিকশিত শীতে।।[৫] (৪০৭)

২৭১ সংখ্যক পদে জ্ঞানদাসের আধুনিক মনস্কর চরম পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। চৈতন্যোত্তর রাধা কৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমচেতনা জাগরুক সত্ত্বেও। পার্থিব লৌকিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথা দেহজ কামনা বাসনা মণ্ডিত প্রেম সম্ভোগকে অস্বীকার করেনি এই পদটিতে —

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণে পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।

ভাষা ব্যবহারে, শব্দ চয়ন ও উপস্থাপনায় এই অংশে কবির আধুনিক কবি মানসটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'লাগি' এই অব্যয়ের সাহায্যে পংক্তির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক অন্বিত হয়েছে। কৃষ্ণের প্রতি রাধার এই অঙ্গের জন্য 'অঙ্গের', হৃদয়ের জন্য 'হৃদয়ের' ক্রন্দন আধুনিক কালের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল—কেননা আধুনিকতার এক লক্ষণ হল—'দেহজ কামনা, বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা'।[৬] তবে 'পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে'—এই অংশে দেহকামনার উর্ধায়ন ঘটেছে।

কৃষ্ণকে রাধা যে কি নিবেদন করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। কারণ, যে প্রেম তিনি জানাতে পারেন সেই প্রেম স্বরূপই কৃষ্ণ। তাই রাধা বলেন—' যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি।' বা 'তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার'।[৭] (২৬৪)

'শেষের কবিতা'য় লাবণ্য ও অমিতকে শুনিয়েছে প্রেমের চিরন্তন দেওয়া নেওয়ার ভাষ্য—'তোমারে যা দিয়ে গেনু সে তোমারি দান। গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়'।[৮]

প্রবাস পর্যায়ের এই পদটিতেও জ্ঞানদাসের শিল্পীমন সার্থক ভাষাচিত্রের মাধ্যমে রাধার বিষাদিত দেহ প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করেছে। বিরহদগ্ধ রাধার দেহকে তুলনা করা হয়েছে বহুদিন গত কৃষ্ণের ক্রমশ ক্ষীয়মান প্রেমের সঙ্গে। যে প্রেমের জন্য রাধা একদা বলেছেন, 'সে সব আদর ভাদর বাদর'[৯] (২৭৬) আজ সেই প্রেমের জন্যেই 'দিনে দিনে দেহ নেহ অনুসার' (৪৩৮) ক্রিয়াপদবিহীন এই পংক্তিটিতে ' দেহ নেহ'র শব্দান্তিক ধ্বনি অনুপ্রাস শব্দদুইটির আত্মিক উন্মোচন ঘটিয়াছে। এই বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা, রহস্যময় অনুভূতি, বিষাদময় রোমান্স—এসবের মধ্যেই জ্ঞানদাসের কবিভাষা ও শিল্পীমন নিহিত রোমান্স চেতনা তাঁকে ভাষার সুদক্ষ শিল্পী হিসাবে গড়ে তুলেছে।

জ্ঞানদাসের ছন্দোরীতি

কবিভাষা :

ব্রজবুলি এবং বাংলা উভয় ভাষাঙ্গিকেই জ্ঞানদাস বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন। ব্রজবুলি রচনার পূর্বসূরী হিসাবে বিদ্যাপতি এবং বাংলা রচনার পূর্বসূরী হিসাবে চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্ভবত তাঁর আদর্শ হয়ে থাকবে। আর সেই কারণেই হয়তো, ব্রজবুলিপদ রচনায় প্রধানত প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ এবং বাংলা পদরচনার ক্ষেত্রে মূলত অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত ছন্দোরীতির অনুসরণ করেছেন তিনি।

ব্রজবুলিতে তিনি প্রাচীন কলাবৃত্ত ছন্দোরীতি ব্যবহার করেছেন। প্রথমত, এই রীতিতে তিনি

ছন্দোবন্ধের যে ব্যবহার করেছেন তার আলোচনা করা যেতে পারে —

একপদী বন্ধ —

শুন শুন। গুণবতী। রাই ৪।৪।৩

তোহে বিনু আকুল কানাই ৪।৪।৩

সো তুয়া পরশক লাগি।

ছটফটি যামিনি জাগি।। (১৩১)

এগারো মাত্রার এই একপদী ছন্দকে একাবলী ছন্দ বলা হয়। প্রাচীন কলাবৃত্তের রীতি অনুযায়ী ছন্দসাম্য রক্ষার্থে প্রয়োজন মতো দীর্ঘস্বরের গুরু দু-মাত্রা উচ্চারণ রাখা হয়েছে। আবার কখনো কখনো দীর্ঘস্বরের লঘু একমাত্রা উচ্চারণও করা হয়েছে। সে যুগের সুরাশ্রয়ী পদাবলী গানে এরকম যেমন 'রাই' এর 'রা', প্রভৃতি মুক্তদল দীর্ঘ উচ্চারণে দু'মাত্রার মর্যাদা পেয়েছে, তেমনি আবার 'আকুল' এর 'আ', 'তোহে'র তো' প্রভৃতি মুক্তদল সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে এক মাত্রার মর্যাদা পেয়েছে।

একপদী ছন্দোবন্ধে কখনো অতি পর্বের দোলা ত্রনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার প্রয়াস লক্ষণীয়। যথা—

যব) সঘ নে কাঁ পয়ে। দেহ। ২) ৬।৩।

তব) ধরিতে নারয়ে। কেহ।।

যব) তেনই দীঘ নি। শাস।

তব) দূরে রহুঁ জ্ঞানদাস।। (৪৪৫ সংখ্যক)

এখানে ছন্দোভাগ দুই - ছয় - তিন (২।৬।।৩।)

শুনহ নিকরুন। কানা ৭।৩।

তুয়া রাই ভেলক নিদান।।

যব) পরণে সরসিজ। শেজ। ২।৭।৩।

তব) চমকে জনু জিউ তেজ।। (ওই)

এখানে ছন্দোবন্ধ সাত - তিন (৭।৩।) বা দশমাত্রার। পরে দেখি অতিপর্ব দু-মাত্রা সহ বারো মাত্রা - ২) ৭।৩। । তবে 'দীর্ঘ' ও 'নিশাস' শব্দের যুক্তবর্ণের একটি পরিহার করায় ছন্দে মাত্রা সাম্য বজায় রেখেছেন কবি, দীর্ঘ > 'দীঘ', নিশাস < 'নিশ্বাস'। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, পদটির প্রথমে অতিপর্বের ব্যবহার নেই। যথা —

শুনহ নিকরুন। কানা ৭।৩।

তুয়া রাই। ভেলক নিদান।। ৪।৪।৩।

যব) পরণে সরসিজ শেজ। ২।৭।৩।

তব) চমকে জনু জিউ তেজ।। (ওই)

এখানে ছন্দোবন্ধ প্রথম পংক্তিতে সাত - তিন (৭।৩) বা দশমাত্রার। পরের পংক্তিতে চার - চার - তিন (৪।৪।৩।) বা এগারো মাত্রার একাবলী ছন্দের ব্যবহার হয়েছে। তৃতীয় পংক্তিতে অতিপর্বের দু-মাত্রার প্রয়োগ সহ ছন্দের চাল হয়েছে দুই - সাত - তিন (২।৭।৩।) পর্ব ভাগে এবং মোট মাত্রা সংখ্যা বারো।

একপদী বন্ধের বারো মাত্রার পদ ও জ্ঞানদাসের পদাবলীতে লক্ষণীয়। যথা —

সহজে নুনিক। পুতলি গোরী। ৬।৬।

জারহ বিরহ । আনল তোরি।। ৬।৬।
বরণ কাঞ্চন। এ দশবাণ।
শ্যামরি সোঙরি। তোহারি নাম।। (৫৩ সংখ্যক)

এখানে পর্বমাত্রা বিভাগ ছয় - ছয় (৬।৬।)। তবে তৃতীয় পংক্তির 'কাঞ্চন' শব্দটিকে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে তিন মাত্রা ধরতে হবে।

ছন্দ নির্মাণের ক্ষেত্রে জ্ঞানদাসের মৌলিক প্রয়াস নিম্নোক্ত পদটিতে লক্ষিত হয়। প্রথানুগ ছন্দো রীতির গণ্ডী পেরিয়ে এখানে তিনি নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। যথা—

ও কি। দেহা। ২।৪।
উয়ল। জনু নব। মেহা।। ৪।৪।৪।
ওকি এ। চূড়া। ৪।৪।
মালতী মান মঞ্জুলা।।
ও কি এ। বয়না।
দুহু দিসে। ঢরকায়। নয়না।। (১৭৩ নং পদ)

এখানে প্রথম পংক্তিতে দুই - চার - পর্ব ভাগে। (২। ৪।) ছয় মাত্রার ব্যবহার লক্ষণীয়। পরবর্তী পংক্তি চার - চার - চার (৪।৪।৪।) তথা বারো মাত্রার পর্বভাগে। তৃতীয় পংক্তিতে দুটি চার মাত্রার পর্বভাগে - আট (৪। ৪।) মাত্রার পংক্তি। পদটিতে ক্রমপর্যায় প্রথম দুই পর্ব ও তিন পর্বের মাত্রা ভাগ করে ছন্দে বৈচিত্র্য ও ধ্বনি তরঙ্গের ওঠানামা সৃষ্টি করেছেন জ্ঞানদাস। অসমমাত্রিক পংক্তি ও-মাত্রার বিন্যাস থেকেই আধুনিক কালে এসেছে 'মুক্তবন্ধ' বা 'মুক্তক' ছন্দোবন্দ। জ্ঞানদাসের ব্রজবুলি পদগুলিতে কলাবৃত্ত ছন্দের ষোলমাত্রার চতুর্মাত্র পর্বিক দ্বিপদী বন্ধও দৃষ্ট হয়। যথা—

কু সু মি ত। ম ধু ব ন।। ম ধু ক র। মে লি। ৪।৪।৪।৪।বা ৮।।৮।
পিক কুল। গা ও ত। মন মথ। কেলি ।। ৪।৪।।৪।৪।
নিধুবনে। মুগধল।। নাগরি। কান
এক কলেবর দুই একই পরান।। (২০৯ সংখ্যক)

এ জাতিয় বন্ধে শেষ পর্বটি সাধারণত অপূর্ণ পর্ব এবং হ্রস্বস্বর থাকলেও দীর্ঘ উচ্চারণে চার মাত্রাধরা হয়। কলাবৃত্তের এই দ্বিপদী পয়ারের ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস পংক্তি শেষে দু-মাত্রার অতিপর্ব ধুয়া হিসাবে ব্যবহার করে ছন্দে দোলা বা স্পন্দন এনেছেন। যেমন —

ভ র ম ল। ভ র ম ল। অ ব ভে ল। রে ৪।৪।।৪।২।বা ৮।।৬।
আয়ত। হোয়ত।। নয়ান। রে।।
গতি অতি। তুরিত সমাপন। রে।
শৈশব। কয়ল।। পয়ান। রে।। (২৪ সংখ্যক)

শেষের 'রে' ওই দু-মাত্রার ধুয়াটি পয়ারের (৮।। ৬।) আভাস এনেছে। দ্বিপদী বন্ধের মত ত্রিপদীর ক্ষেত্রেও জ্ঞানদাস বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। ত্রিপদীর লঘুবন্ধটি তিনি বেশ স্বছন্দের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। যথা —

স হ জ শ্যা ম ল লি ত অ ঙ্গ ৬।।৬।।
পীঠওড়ন পাসরি। ৬।৪।

হাস বিমল বয়ান কমল ৬।।৬।।
অরুণ নয়ন চাতুরি।। ৬।৪।
দেখ বী সখি নিপমূলে
চূড়াডালে ভাটনী।
বিম্ব অধর মুরলী মধুর
মন্দ মধুর গায়নী।। (১৬৯ সংখ্যক)
৬ মাত্রার পর্ব এবং বিভাগ ৬।।৬।।৬।।৪।-এ।

এখানে পদমাত্রা ভাগের লঘু চৌপদী বন্ধ ব্যবহৃত। তবে ছন্দসাম্য রক্ষার জন্য কোন কোন শব্দকে কবি ইচ্ছামত নির্দিষ্ট করেছেন ও মাত্রা বৃদ্ধি করেছেন। যথা 'নিপ' 'মূল' প্রভৃতি শব্দ। এখানে ছন্দোসমতা বজায় রাখতে একমাত্রা করে যোগ হয়েছে ওই শব্দ দুইটিতে।

এই পদটি ১২।।১০। পদমাত্রা ভাগের দীর্ঘ দ্বিপদীতে ও পাঠ করা যায়। ত্রিপদী বন্ধের সাত পদমাত্রা ভাগের নিম্নলিখিত পদটি জ্ঞানদাসের ছন্দ সচেতনতার গৌরব বহন করে। তবে কোন কোন শব্দের মধ্যে স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ কবি মেনে নিয়েছেন। যথা —

ম ধু র যা মি নি কা ম কা মি নি ৭।।৭।।
বিজুরে কালিন্দি তীর। ৭।৩।
কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কৃত
বদত ধীর সুধীর।।
রাধা মাধব সঙ্গ।
সঙ্গে সহ চরি নাচয়ে ফিরি ফিরি
গাওয়ে রসপর সঙ্গ।। (৩৭৩ সংখ্যক)

পদান্ত মিলগুলিও ছন্দের ধ্বনি সুষমা বৃদ্ধি করেছে। যেমন যামিনি-কামিনি, কুহরত-ঝঙ্কৃত, সহচরি-ফিরি ফিরি প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সাত (৭) মাত্রার পদভাগ সম্পন্ন ছন্দোবন্ধ জ্ঞানদাসের রচনায় প্রায় দুর্লভ বস্তু। বারো - বারো - দশ (১২।। ১২। ১০।) পদমাত্রা ভাগের দীর্ঘ ত্রিপদী বন্ধের ছন্দ ও জ্ঞানদাসের পদে দেখা যায়। যথা —

অ তি সু ম ধু র। ম ধু র শ্যা ম।। কু টি ল কে শ। কু স্ত ল দাম।।
মউর পক্ষ। শোহনি।
ভাল উপরে। চন্দন বিন্দু। অমল শরদ। পূর্ণিমা ইন্দু।।
ভুবন মরম মোহনি।। (১৪৮ সংখ্যক)

এখানে পদভাগে ৬।।৬।।৬।।৬।।৫।১২।।১২।।১১। মাত্রায় 'কুন্তল' শব্দের সংশ্লিষ্ট তিন মাত্রার উচ্চারণ লক্ষণীয়। তবে পদটি একই ক্রমে থাকেনি। পরে আছে —

আজ পেখলুঁ।। তরান তীর। ৬।।৬।
মদন মোহন গতি সুধীর।।৬।।৬।

এখানে আবার দ্বিপদী বন্ধ লক্ষিত হয়।

পদমাত্রা ভাগ ৬।।৬। ভাবে।

কলাবৃত্তের ত্রিপদী বন্ধের ক্ষেত্রে পদযতি পাতের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে ক্রমের হেরফের ঘটেছে। নীচের পদটিতে দেখি লঘু ত্রিপদীর ছয় - ছয় - আট বা ৬।।৬।।৮।। বন্ধের মধ্যে কোথায় ও

কোথাও ছয় দশ (৬।। ১০।) বা ছয় আট (৬।। ৮।) মাত্রার দ্বিপদী বিন্যাস ঢুকে পড়েছে। যথা-

অ ল পে অ ল পে স ঘ নে স ঘ নে ৬।।৬।।
বচন রহে মিঠ। ৮।

সব আভরন থাকিতে হিয়ারে
হারে বাঢ়ায়ছ দিঠ।। (৩২০ সংখ্যক)

এই অংশের বিন্যাস ৬।। ৬।। ৮। ক্রমে। অথচ এই পদেরই প্রথমাংশে দেখা যায় —

এই মনে বনে দানী হৈয়াছ কাহ্নাই ৬।। ১০।।
ছুইতে রাধার অঙ্গ। ৯।
রাখলি হইয়া রাজকুমারী সনে ৬।। ৮।।
না জানি কিসের রঙ্গ।। (ওই)

এই অংশে 'দানী হৈয়াছ কাহ্নাই' উচ্চারণে মিশ্রবৃত্তের সংশ্লিষ্ট অপ্রান্তিক রুদ্ধ দল হিসাবে একমাত্রা ধরলে 'আট' (৮) মাত্রা এসে পড়ে।

কলাবৃত্তের চৌপদী বন্ধের নিদর্শনও জ্ঞানদাসের পদাবলীতে লক্ষিত হয়। যথা —

কষিল কনক। রুচির গৌর। অখিল ভুবন। মরম চৌর।।
করভ স্তম্ভ। বাহু দম্ভ।। কলমষ তাপ। গ্রাসনি।
প্রচুর পুলক শোভিত অঙ্গ।। নটন লীলা অধিক রঙ্গ
বয়ান শরদ পূণিম ইন্দু।। সরস হাস ভাসনি।। (২১ সংখ্যক)

এখানে পদভাগ ১২।। ১২।। ১২।। ১১। বা পর্বভাগ ৬।৬।।৬।৬।।৬।৬।।৬।৫। মাত্রা অনুসারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, জ্ঞানদাস পংক্তি শেষের অপূর্ণ পদছাড়া অন্যত্র অর্থাৎ পর্ব বা পদযতি মাত্রা হিসাবে পাঁচমাত্রা ব্যবহার করেন নি। চৌপদী বন্ধের অন্যধরণের রূপও জ্ঞানদাস তাঁর পদাবলীতে ব্যবহার করেছেন। যথা —

একে নব। কুঞ্জ কুটির অতি। মনোহর।। ৪।৪।।৪।৪
ভ্রমরা ভ্রমরা গণে।। গাওয়ে রসাল। ৪।৪।।৪।৩
রতনক। দীপ।। নীপপর হিমকর।। ৪।৪।।৪।৪।।
মদন দেব মোহন নট। রাজ।। ৪।৪।।৪।৩।

বাজত বলয় নূপুর মণি কিঙ্কিণি
শ্যাম বামে রহু গৌরী কিশোরি
ভুজ দুঁহু দুহুক কান্ধ পর শোভই
নব বারিদে জনু বিনদ বিজুরি।। (৩৫০ সংখ্যক)

এখানে পদমাত্রা ভাগ ৮।।৮।।৮।।৭। বা পর্বমাত্রা ভাগ হল ৪।৪।।৪।৪।।৪।৪।।৪।৩। দ্বিতীয় পংক্তিতে 'দীপ' শব্দটি বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘ উচ্চারণে 'দীপ' চার মাত্রায় গঠিত। লক্ষণীয় যে, এই পদটিতে অনেক সময় ভাবানুসারী যতিপাত ছন্দানুসারী হয়নি।

আগেই বলেছি, খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত পদাবলীগুলিতে জ্ঞানদাস মিশ্রবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত রীতিই অনুসরণ করেছেন। মিশ্রবৃত্তের এই পদটিতে নয় মাত্রার একপদী বন্ধ ব্যবহার দেখা যায়। যথা —

অচিরে পুরব। আশ। ৬।৩ (২)। বা ৩।৩।৩(২)।

বন্ধুয়া মিলিব। পাশ ৬।৩(২)।
হিয়া জুড়াইবে মোর।
করিবে আপন কোর।।
অধর অমৃত দিয়া।
প্রাণ দান দিবে পিয়া।। (১৫২ সংখ্যক)

মিশ্রবৃত্তে এটি ৮ মাত্রার একপদী মিশ্রবৃত্তের মধ্যে একপদী বন্ধে এগারো মাত্রার পংক্তি লক্ষিত হয়। এখানে পর্বমাত্রা ৬। ৫। ক্রমে। একে বাংলা মিশ্রবৃত্তের একাবলী ছন্দও বলা যায়।

ছয় - ছয় - আট (৬।। ৬।। ৮।) মাত্রার লঘুত্রিপদী ছন্দও জ্ঞানদাসের বহুপদে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ——

গৌরাঙ্গ আমার ধরম করম ৬।।৬।।
গৌরাঙ্গ আমার জাতি। ৮।
গৌরাঙ্গ আমার কুলশীল মান
গৌরাঙ্গ আমার গতি।। (২৪৬ সংখ্যক)

ত্রিপদী বন্ধের দীর্ঘ রূপ ও জ্ঞানদাসের পদে লক্ষিত হয়। যথা —

বান্ধিয়া চিকনচূড়া।। বনফুল তাহে বেড়া।। ৮।।৮।।
গুঞ্জা মালা তাহে বল সোনা। ১০।
গোঠে থাক ধেনু রাখ আপনা নাহিক দেখ
বড় হেন ভাবহ আপনা।। (৩২৪ সংখ্যক)

এখানে পদভাগ রয়েছে ৮।। ৮।। ১০ এই ভাবে।

লৌকিক রীতির ছন্দ বা দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার জ্ঞানদাসের রচনায় বিশেষ নেই। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে মাঝে মাঝে এই রীতির পরিচয় পাই যা তখনকার দিনে মধ্যযুগের কাব্যে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় মিশ্রবৃত্তের কিছু উচ্চারণ প্রয়াসে। যথা ——

বনের মাঝে। বাজে বংশী। কি হবে উ। পায়। ৪।৪।৪।১।
ধৈরজ না ধরে মন।। বন মুখে ধায়।। ৮।।৬।।
ত্বরায় চলিতে চাই।। নাহি চলে পা।
শ্যাম প্রেমের আবেল।। এলসয়া পড়ে গা।। (১৯৫ সংখ্যক)

১৯৮ সংখ্যক পদে ও শুরুতে মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী বন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু পরে লৌকিক বা দলবৃত্ত ছন্দ এসে পড়েছে। যথা —

মিলিল শ্যামের সনে।। নবীন কিশোরী। ৮।।৬।
পশু পাখী উনমত।। দুহুঁ রূপ হেরি।। ৮।।৬

কিন্তু পরে — হিলন দিয়া। দাঁড়াইল।। রসময় শ্যাম। চন্দ্র (৪।৪।।৪।২৮।।৬।)
নাগর অমনি। চেয়ে রহল। রাইমুখ চন্দ্র।। ৪।৪।৪।১।

এখানে দলবৃত্তের ৪।৪।৪।২।মাত্রা ভাগ লক্ষিত হয়। কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্তের ছন্দ মিশ্রণ ও জ্ঞানদাসের পদাবলীতে লক্ষিত হয়। উভয় রীতির সহাবস্থানের ফল ছন্দের ভাষাতেও ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষার মিশ্রণ সৃষ্টি হয়েছে। যথা —৪০ সংখ্যক (পৃ.৭৪) পদে —

শুতি। রহলুহাম।। করি এক চিত। ৮।।৬।

82

দৈব বিপাক ভেল।। সব বিপরীত।। ৮।।৬।

এই অংশে কলাবৃত্তের রূপ স্পষ্ট। যদিও 'শুতি'কে দীর্ঘ উচ্চারণে 'দু' মাত্রা ধরা হয়েছে। এর পরের অংশ —

না বোল সজনি শুন।। স্বপন সম্বাদ। ৮।।৬।
হেরইতে কোহো জানি।। করে পরিমদ।। (ওই)

গঠন গত ছন্দোবৈচিত্র্যও জ্ঞানদাসের পদে লক্ষণীয় রূপে ধরা পড়ে। ৪৩৬ সংখ্যক দ্বিপদী বন্ধের পদটির গঠন বৈচিত্র্য এই রকম। এর পর্বভাগ হয়েছে চার (৪) মাত্রায়। পদ ভাগ হয়েছে বার (১২) মাত্রায় এবং দুই পদের মাঝে দু মাত্রার অতিপর্ব এসে ছন্দের গতিপ্রাণতা বৃদ্ধি করেছে। যথা —

জলধর। অম্বর। ছাড়ল।। রে) পাহুক। ঋতুপর। বেশ।
হেরি হেরি। হিয়া তাত । রাখল।। রে) নাহ নাহিক নিজদেশ। (৪৩৬ নং)

এখানে মাত্রাভাগ ৪।৪।।৪।।২) ৪।৪।৪। বা ১২।।২) ১২।

নিম্নোক্ত ছন্দটি কলাবৃত্তে। আবার পরের পংক্তি দুটিতে দেখি দ্বিপদীর সঙ্কুচিত রূপ। যথা—

কিমোহে ধরল দূর।। ভানে। ৮।।৪।(৪।৪।।৪।)
জানলো। বিহি ভেল।। বামে।। (ওই)

একই পদে দুই রকমের ছন্দোবন্ধও জ্ঞানদাস ব্যবহার করেছেন। এখানে তাঁর বিশিষ্ট ছন্দবোধও পরিস্ফুট হয়েছে। যথা —

রাস বি লাস র সিক বর। নাগর।। ৪।৪।।৪।৪।।
বিলসই। রসবতী। মাঝে। ৪।৪।৪।
দুহু বনি। বেশ বয়স বৈদ গধি।।
অবধি করিয়া ধনী সাজে। (৩৪৭ সংখ্যক)

এখানে কলাবৃত্তের একপদী বন্ধ ব্যবহৃত। পর্বভাগ চার মাত্রায়। এবং ছন্দোবন্ধ চার - চার - চার - তিন। ৪।৪।৪।৩।) এইভাবে।

অনেক সময় দেখা যায় কলাবৃত্তের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের মাঝেই কোথাও কোথাও মিশ্রবৃত্তের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ফুটে উঠেছে, সে যুগে পদগুলি মুখ্যত গান হিসেবে রচিত হতো এবং সে জন্যই উচ্চারণ গত বৈষম্য সুরের টানে ঢাকা পড়ে যেত। তথাপি শব্দারম্ভিক বা শব্দ মধ্যস্থ রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ (মিশ্রবৃত্তের নিয়মে) গ্রহণ করার ফলে পদে অতিরিক্ত ধ্বনি তরঙ্গ শোনা যায়। তবে ছন্দের তাল ও মাঝে মাঝে ভঙ্গ হয়। যথা —

বিহরই নিধু বনে।। যুগল কিশোর। ৮।।৬।
ফাগু রঙ্গে আজি সঙ্গে।। হৈয়াছ বিভোর।। ৮।।৬।
চুয়া চন্দন।। ভার - পিচকারি। ৬।।৬
শ্যাম নাগর অঙ্গে।। দেওত কানরি।। ৭।।৬।(৩৭৭ সংখ্যক)

উল্লিখিত পদ্যাংশ রঙ্গে, সঙ্গে, হৈয়াছে প্রভৃতি শব্দকে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে মিশ্রবৃত্তের মধ্যে ধরা হয়েছে। এখানে প্রথম দু পংক্তিতে আট - ছয় ব্যবহৃত হলেও পরে ছন্দ পরিবর্তন ঘটেছে। "শ্যাম নাগর অঙ্গে" অংশটি বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে আটমাত্রাও ধরা হয়। ত্রিপদ ও দ্বিপদীর মিশ্রণ ও পদটিতে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে আছে লঘু ত্রিপদী বন্ধে ছয় - ছয় - আট (৬।।৬।।৮।) পদমাত্রা ভাগ, পরের অংশে দেখি আট - ছয় (৮।।৬।) বিভাগ। যথা —

বদন কমল।। নয়ন যুগল।। ৬।।৬।।
কি বা সে খঞ্জন পাখি। ৮।
শারদ চান্দের চকোর কিবা।।
আইল গিরার লাগি।।
পড়ি গেলু মদন ফান্দে।। নাহিক এড়ান। ৮।।৬
জ্ঞানদাস বলে বড়।। বিনোদিয়া কান।। (১৭৭ সংখ্যক)

ছন্দোসাম্য রক্ষার্থে 'চকোর কিবা' প্রভৃতিকে কলাবৃত্তের হ্রস্ব স্বরের ও বিশিষ্ট উচ্চারণ এ দু-মাত্রা ধরা হয়েছে। আবার মিশ্র বৃত্তের ক্ষেত্রে 'মদন কান্দে, খঞ্জন, চান্দের' প্রভৃতির সংশ্লিষ্ট একমাত্রিক উচ্চারণ লক্ষণীয়। একপদী ও দ্বিপদী বন্ধের মিশ্রণও জ্ঞানদাসে দেখা যায়। যথা —

মুখে হাসি। মিশা বাঁশি। বায়। ৪।৪।২
অমিয় বমিয়া বিধু।। জগত মাতায়।। ৪।৪।।৪।২।বা ৮।।৬
গালে গলে। মোতিম। মাল।
করি বর। কর কিয়ে।। বাহু কি শাল। (১৫৯ সংখ্যক)

এখানে প্রথম পংক্তিটি চার পর্বমাত্রার চার - চার - দুই (৪।৪।২।) এর একপদী ও দ্বিতীয় পংক্তিটি আট - ছয় (৮।।৬।) বা পয়ার বন্ধ ব্যবহৃত।

জ্ঞানদাসের পদাবলীতে প্রাকৃত নরেন্দ্রবৃত্ত ছন্দের ও নিদর্শন মেলে —

রাজিত চিকুর উপরে নব মালতী ৭।৯
অলিকুল অলংকার। পাশে। ৮।৪
মলয়জ মাঝে বাজে মৃদু মৃগমদ
তরুণী নয়ন বিলাসে।। (৩০ নং)

এর মাত্রাভাগ হয়েছে সাত - নয় - চার (৭।৯।৮।৪।) এই ভাবে। তবে বাংলা ছন্দের উচ্চারণ রীতিতে এভাবে আড়ষ্টতা আসে।

জ্ঞানদাস : অলংকার ব্যবহার

চৈতন্যের অব্যবহিত পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন জ্ঞানদাস। বাংলা, ব্রজবুলি এবং বাংলা ব্রজবুলির মিশ্রণজাত বৈষ্ণবপদ রচনা করেছিলেন তিনি। রচনার ক্ষেত্রে তিনি চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি উভয়েরই আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন, যদিও রচনায় কারুশিল্প বা মন্ডলকলার ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভাষা প্রয়োগ, ছন্দ ও অলংকার বর্ণনার রীতি বৈচিত্র্যে তাঁর স্বকীয়তা লক্ষণীয়। শঙ্করী প্রসাদ বসুর মতে 'বৈষ্ণব কবিকুলের মধ্যে আধুনিক কালের লিরিক প্রতিভা বলতে যাহা বুঝি তাহা যদি কাহারও থাকে তবে জ্ঞানদাসের। জ্ঞানদাসের গাঢ় গভীর অনুভূতির আকুতি ছিল এবং জ্ঞানদাস জানিতেন কেমন করিয়া সেই অনুভূতিকে সংহত তীব্র আকারে প্রকাশ করিতে হয়।'[১০]

কবির কাব্যানুভূতির প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁকে যে কাব্যভাষার আশ্রয় নিতে হয়, তা শব্দ বিন্যাস, ছন্দ, চিত্রধর্ম ও অলংকারের মধ্যেই নিহিত থাকে। জ্ঞানদাসের কবিভাষার মধ্যে দিয়ে রহস্যময়তা[১১] কখনো বা বিষাদের সুর[১২] শোনা যায়। বর্তমান আলোচনায় তাঁর গীতিময়তা কিভাবে তাঁর কবিভাষার অলংকার আশ্রয়ে বাণীরূপ লাভ করেছে তা বিশ্লেষণ করা হবে।

ভাষায় অলংকার সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি সচেতন প্রয়াসকে বিশেষ প্রাধান্য না দিলেও, শব্দালংকার

ও অর্থালংকার দুই ক্ষেত্রেই কাব্যভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রথমে কিছু শব্দালংকারের বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ বিথার।
জলদ পটল বরিষত রসধার।।
মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়,
অমিয় বমিয়া বিধু জগত মাতায়।।[১৩]

এখানে ঙ্গ, র, ল, ম, ব প্রভৃতি যুক্ত-অযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির ধ্বনি অনুপ্রাসের সাহায্যে কৃষ্ণের অঙ্গ দোলার সঙ্গে জল তরঙ্গের হিল্লোলকে একসূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে এবং তাকে তুলনা করা হয়েছে আকাশের জলদের বারিরূপের বর্ষণের সঙ্গে। কৃষ্ণের হাসিমুখে বাজানো বাঁশীর সুমধুর সুর জগতে পরিব্যাপ্ত এবং তা চন্দ্রের অমৃত উদ্গীরণের মত জগতকে মাতিয়ে তুলেছে। হাসি, মিশা ও বাঁশীর প্রান্তিক ধ্বনি সাম্য ও অমিয় বমিয়ার শব্দান্তিক অনুপ্রাস ধ্বনিতে মাধুর্য সঞ্চারিত হয়েছে।

কৃষ্ণের অঙ্গ ছোঁয়ায় বাতাসও কথা কয়ে ওঠে। এবং আনন্দ বর্ষণ করতে থাকে পরশ পাথর। এই অংশে কবি কিছুটা বৈচিত্র্য এনেছেন 'পরশ' শব্দের যমক অলংকারে —

ও অঙ্গ পরশে পবন হরষে
বরষে পরশ শিলা। (১৪৪ সংখ্যক)

তাছাড়া, এখানে 'পরশে, হরষে ও বরষে'র মধ্যেও চমৎকার ধ্বনিসাম্য শ্রুত হয়। নিম্নলিখিত পদটিতে কৃষ্ণের পূর্বরাগের প্রত্যুত্তরে রাধার মানসিক প্রতিক্রিয়া দূতীর বর্ণনায় অনুরাগ ঔদাসীন্যের দ্বন্দ্বে বিচলিত। এই ব্যক্ত-অব্যক্ত ভাবের লুকোচুরি 'ক' এবং 'চ' বর্ণের আদ্যানুপ্রাস জনিত শ্রুতিধ্বনিতে বাড়তি প্রাণ পেয়েছে। নীলোৎপল বর্ণের বসন পরিহিতা ও কালোকেশ প্রসাধিতা রাধা কি সত্যই কৃষ্ণানুরাগিনী অথবা মনের খেয়াল?

কুবলয় কর চির চিকুর চিয়ার।
কিয়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝায়।। (১৩৪ সংখ্যক)

রাধা কৃষ্ণের যুগল মিলনের এই চিত্রটিও অনুপ্রাসের ঝংকারে মুখরিত। কৃষ্ণরাধার রতিরণ-ঝংকার এই ধ্বনি ঝংকার আশ্রয় করে অপূর্ব শব্দ সৌষম্য লাভ করেছে। এবং আদিরসাত্মক বিষয়টিকে শ্রুতিমাধুর্যে অনুপম ঐশ্বর্য দান করেছে। যথা —

কঙ্কন কিনি কিনি ঘন ঘন রনি রনি
রতিরণ বাজন বাজে।
জ্ঞানদাস কহ রসিক শিরোমনি
সাজল রমনি সমাজে।। (২০০ সখ্যক)

এখানে ক, ন, র, ষ, ব প্রভৃতি বর্ণের ধ্বনি অনুপ্রাস ও তজ্জনিত গুঞ্জন ভাষাকে ভাবগম্ভীর ও সচল করেছে। জ্ঞানদাস মন্ময় গীতিকবি ধর্মানুসারী বলেও কবিভাষার বহিরঙ্গ রূপকল্প প্রসাধনেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয় তাঁকে 'ধ্বনিবাদী'[১৪] কবি বলতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

অর্থালংকারের ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস প্রথাগত অলংকার প্রয়োগ অনুসারী হলেও বিষয়বস্তু ও অলংকার যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কিত তার প্রমাণ রেখেছেন, এবং তার রোমান্টিক রহস্যময় কবি মন

ভাব গভীর তন্ময়তা লাভ করেছে। যথা —

হাসি খানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে বিজুরি প্রকাশ করে।
জাতিকুল মজাইল তায়।।[১৫] (১৬৫ সংখ্যক)

রূপানুরাগিনী রাধার দৃষ্টিতে কৃষ্ণরূপ বর্ণনায় এই পদটিতে নিদর্শনা অলংকার সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণ মুখের মনোমোহিনী হাসি চকিতে দেখা দিয়েই মুখ প্রান্তে মিলিয়ে (মিশিয়ে) যায়। সেই হাসিকে কবি অসম্ভব বস্তু সম্বন্ধে আবদ্ধ করেছেন নব মেঘের কোলে চমকিত বিদ্যুৎ ঝলকের সঙ্গে। কৃষ্ণ মুখ আর নবীন মেঘ রাধার কাছে একাকার হয়ে গেছে।

রাধার পূর্বরাগের নিম্নলিখিত পদটিতে ও জ্ঞানদাস রাধার বাহ্যজ্ঞান রোহিত ভাবটিকে ভ্রান্তিমান অলংকারের সাহায্যে স্পষ্ট করে তুলেছেন। বুকের উপরে লুটানো আলুলায়িত কৃষ্ণকেশ তাঁর অবচেতনায় শরীরী কৃষ্ণরূপে মূর্ত। অর্থাৎ কৃষ্ণকেশ রাধার কাছে কৃষ্ণরূপে ভ্রান্তি উপস্থিত করেছে। যথা —

ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়ত
কোরে - করত তুয়া ভানে। (১২২ সংখ্যক)

রূপমুগ্ধা রাধার সংশয়াচ্ছন্ন চিত্ত কবি উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। কৃষ্ণের কুঞ্চিত, কালো চুলে ময়ূর পুচ্ছ নিরীক্ষণ করে রাধা বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়। এই রূপচিত্র তাঁর কাছে যেন যমুনার কালো জলে ক্রীড়াবদ্ধ মাছরাঙা পাখীর মত। রাধার সংশয় এখানেই প্রকট। যথা —

কালিন্দীর জলে কিবা মৎস রাঙা উড়ে। (১৭৭ সংখ্যক)

কালোচুল না কালিন্দীর কালো জল? ময়ূরপুচ্ছ না মাঝরাঙা পাখি? জ্ঞানদাস মাছরাঙা পাখীর উপমাটি লৌকিক দৃষ্টিতে কোনও গ্রামীণ অভিজ্ঞতা থেকে গ্রহণ করে কাব্যভাষাকে ঘরোয়া রচনা বদ্ধ করেছেন।

প্রথানুযায়ী কবিভাষার মধ্যেও বহুস্থলে কবি স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। মূলত আঙ্গিক সচেতন না হলেও তিনি, বিশেষ করে, তাঁর ব্রজবুলি পদগুলিতে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের মতই অলংকার সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। নিম্নলিখিত পদটিতে কবি গৌরাঙ্গের ভাব বিভোর রূপচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে রূপতন্ময় সত্তা থেকে নিজের অজান্তেই কখন প্রাণতন্ময়তা লাভ করেছেন, এবং প্রবল সংশয়ের মধ্যে পড়ে উৎপ্রেক্ষা অলংকার সৃষ্টি করেছেন, এখানে গৌরঙ্গের রক্তাভ বুকের উপর সজ্জিত বনমালা তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়েছে স্বর্ণাভ পর্বত চূড়ায় মণ্ডিত আলোক মালার শোভার মত। যথা —

বনি বনমালা লাল উর উপর
কনয়া শিখরে কিরনাবলি ভাতি। (২৫ সংখ্যক)

বক্তব্য ভাষায় বাড়তি দ্বিধার উদ্রেক করেছে ব, ল, ক, ন প্রভৃতি বর্ণের ধ্বনি অনুপ্রাসের তরঙ্গ। কৃষ্ণের প্রতি রাধার মান এমনই প্রখর যে, দূতীর মুখে তাঁর প্রতি কৃষ্ণের অনুরক্তির কথা শুনেও তিনি নিশ্চল। সে কথাই সখী কৃষ্ণের নিকট ব্যক্ত করেছে এই পদটিতে উপমা প্রয়োগের মাধ্যমে। যথা —

তোহারি মধুর গুণ কত পরথাপলঁ
সবহুঁ আন করি মানে।

যৈছন তুহিন বরিখে রজনীকর
কমলিনি না সহে পরানে।। (৩৯৯ সংখ্যক)

কৃষ্ণের গুণরাজি রাধার নিকট সখী যত্ন সহকারে ব্যক্ত করলেও রাধা সবকিছুই বিপরীত করে মানলেন। অর্থাৎ তিনি তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। রাধার এই ব্যবহার কবি বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাবের সাহায্যে সূক্ষ্ম ভাব সাদৃশ্যে উপমিত করেছেন এইভাবে যে, —চন্দ্র কর্তৃক বর্ষিত হিমকিরণেও কমলিনি প্রাণ ধারণে সমর্থ হয়না, রাধার কৃষ্ণ বিপরীত মন ও শীতল স্পর্শ কাতর কমলিনিকে উপমার সাহায্যে কবি অসামান্য কাব্যব্যঞ্জনা দান করেছেন। জ্ঞানদাসের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও কবিমনের অনায়াস ভ্রমণ এখানে প্রকাশ লাভ করেছে।

রাধা বদন হেরি কানু আনন্দা।
জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দ্রা।। (২১২ সংখ্যক)

যুগল মিলনের উপরোক্ত পদটিতেও বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাব সাদৃশ্যের উপমা ব্যবহৃত হয়েছে চমৎকার কৌশলে। উপমান বস্তুর প্রয়োগে জ্ঞানদাস যদিও এক্ষেত্রে প্রথানুগ, তবুও উপমেয় বা প্রকৃত বস্তুর রসোদ্ঘাটনে তা অসাধারণ কাব্যব্যঞ্জনা এনেছে। রাধার আনন্দ উদ্বেল হৃদয়ের স্ফিত উচ্ছ্বাস আর চন্দ্রোদয়ের ফলে উচ্ছলিত সমুদ্র কাব্যোপমায় নিবিড় সাযুজ্য লাভ করেছে।

প্রথা স্মৃতি অনুসরণ করেও জ্ঞানদাস অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিজস্বতা অক্ষুন্ন রেখেছেন এবং পুরাতন অলংকরণকে নতুন ব্যঞ্জনা দান করে এ কালের সন্নিহিতি লাভ করেছেন। উপমার মধ্যেও নবত্ব সঞ্চার করেছেন। রাধা আক্ষেপ করছেন যে, কৃষ্ণ প্রেম তিনি গোপন রাখতে পারেন নি। এই প্রেম গোপন রাখতে অক্ষম হওয়ার ব্যাপারটা এতই দুরূহ ও স্বল্পকালীন যে, তাকে তুলনা করছেন আগুনের ধূম উদ্গীরণের সঙ্গে। আমরা জানি যে, আগুন চাপা বা ঢাকা দিলেও যেমন তার অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়ে পড়ে ধূম নির্গমন থেকে, তেমনি কৃষ্ণপ্রেমকে গোপন রাখা যায় না। কারণ তা আগুনের মতই অনভিব্যক্ত থাকে না। যথা —

ঝাঁপন আগি ধূম জনু নিকসই
অইছন প্রেম বিচার। (৩০০ সংখ্যক)

'চলচিত্রং চলদ্বিত্তং চল জ্জীবন যৌবনম্'—রাধাকে যৌবনের এই স্বল্প স্থায়িত্ব সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছে কৃষ্ণের নিয়োজিত দূতী। এবং সেজন্য একটার পর একটা উপমার সাহায্যে মালোপমা সৃষ্টি করেছেন কবি দূতীর সাপেক্ষে। যৌবনের সাধারণ ধর্মই হল অল্প স্থায়িত্ব। এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে কবি দিয়েছেন ফুলে স্থিত ক্ষণিকের মধু, দ্বিতীয়ার প্রহর স্থায়ী চন্দ্র ও দেহের ক্ষণস্থায়ী দৃষ্ট চন্দনরেখার সাধারণ যৌক্তিক সূত্রে। যথা —

চিরদিন না রহে কুসুমেমকরন্দ।
পহরে না পাইয়ে দূতিয়ক চন্দ।।
অহনিশি না রহে চন্দন রেহ।
ওইছন জানিয়ে যৌবন এহ।। (২৭ সংখ্যক)

কৃষ্ণের অনুপম যৌবন তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রাধার ব্যাকুল মনও তাঁকে অনুসরণ করল। রাধার প্রাণ তার সাক্ষী। রাধার রূপানুরাগ পর্যায়ের এই পদটির আলোচ্য অংশে সহোক্তি অলংকারের ব্যবহার লক্ষণীয়। যথা —

যৌবন তরঙ্গে সঙ্গে মন গেল

87

পরান রহিল সখি।। (১৪৪ সংখ্যক)

অভিমানিনী রাধার ক্ষুব্ধ চিত্তের আক্ষেপকে নিম্নলিখিত অংশে কবি বিশেষোক্তির সাহায্যে বিশিষ্টতা দান করেছেন। রাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ হঠাৎ হ্রাস পাওয়ায় দুঃসহ কষ্টকে জ্ঞানদাস সাগর সমীপে ও তৃষ্ণার্ত ও বসন্ত সমাগমেও মুকুলহীন আম্রবৃক্ষের সাথে তুলনীত করেছেন। যথা —

সায়র নিকট কয়ল বাস।
তবই না টুটল গরুয়া পিয়াস।
চুত না মঞ্চরু সময় বসন্ত। (৪৯ সংখ্যক)

কৃষ্ণের কপালে লাল সিঁদুরের টিপ। তাঁর গাত্রবর্ণ তমাল বৃক্ষের মত কবির সংশয় যে, তমাল বৃক্ষে বুঝি তমাল—ফল, এই উৎকট সন্দেহই উৎপ্রেক্ষা অলংকারের বৈশিষ্ট্য। যথা —

সুরঙ্গ সিন্দুর বিন্দু ললিত কপালে।
ধরল প্রবাল জনু তরুণ তমালে।। (৩৮৪ সংখ্যক)

রাধার চন্দ্রতুল্য মুখখানি থেকে নিসৃত সুধা জগৎকে শীতল করে, কিন্তু কৃষ্ণের কাছে মানিনি রাধার মুখচন্দ্রের স্নিগ্ধতা অগ্নিতুল্য সে আগুনে কৃষ্ণ পুড়ে গেছেন —

যে চাঁদের সুধা দানে জগত জুড়াও।
সে চান্দ বদনে কেন আমারে পোড়াও।। (৩১৪ সংখ্যক)

আলোচ্য অংশে জ্ঞানদাস কবিভাষার আঙ্গিক নির্মাণে বিশিষ্ট কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এবং তাঁর স্বতোৎসারিত তথাপি সচেতন কবিমন এখানে স্পষ্ট। প্রথম পংক্তিতে রাধার মুখচন্দ্র ও ভাবস্নিগ্ধ সুধা অতিশয়োক্তিতে গ্রথিত। দ্বিতীয় পংক্তিতে রাধার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি চন্দ্রের সঙ্গে রূপক সম্পর্কিত এবং উপজীব্যতায় পাই অসঙ্গতি অলংকার। কেননা রাধার শীতল স্নিগ্ধতা কৃষ্ণকে আগুনে দগ্ধ করছে।

রাধার প্রগাঢ় প্রেম একান্ত অনাড়ম্বর ভাষার মধ্যে দিয়ে উত্তরোত্তর উৎকর্ষতা লাভ করেছে নিম্নলিখিত সার অলংকারের মাধ্যমে। যেমন —

কি দিব কি দিব বঁধূ মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি।।
তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার।। (৪৫৭ সংখ্যক)

আত্ম-সমর্পণের এই কবিভাষায় প্রেমের গম্ভীর নম্র ভাবটি লক্ষণীয়। বিরহ-ক্লিষ্ট রাধার মিলন স্বপ্নকে কবি ভাবিক অলংকারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষদর্শন করে তুলেছন অপূর্ব ছন্দ-বাণী-কুশলতায়।

অচিরে পুরব আশ বন্ধুয়-মিলিব পাশ।।
হিয়াজুড়াইবে মোর করিবে আপন কোর।।
অধর অমৃত দিয়া প্রাণ-দান দিবে প্রিয়া।।
পুলকে পুরব অঙ্গ পাইয়া তাহার সঙ্গ।।
ছল ছল দু নয়ানে চাহিব বদন পানে।।
কিছু গদ গদ স্বরে এ দুখ কহিব তারে।।
শুনিয়া দুখের কথা মরমে পাইবে বেথা।।

করিবে পিরীতি যত জ্ঞান না কহিবে কত।। (৪৫২ সংখ্যক)

এ ছাড়া কবি অনেক স্থলেই রাধার বিচিত্র রূপচিত্রগুলি সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁকে উপমার মালা গেঁথে অপরূপা করে সাজিয়েছেন। চৈতন্যপূর্ণ বিদ্যাপতির মতো জ্ঞানদাসের রাধাও বিচিত্র রূপিনী। তিনি কলাবতী (৩৯) অথচ নবনীত পুতলি (৩৩) সম। তিনি একাধারে মোহিনী (১৫৩) আবার কৃষ্ণপ্রেমে চাতকিনী (১২১)। তাঁর রূপ চাঁদের কলিকা (৮)-র ন্যায় উজ্জ্বল, থির দামিনী (২০৫)-র মত দীপ্তিশালী। আবার তিনি প্রেমে মহাযোগিনীর (১০৮) বেশে সংকল্পে অটল থাকলেও পরকীয়া প্রেমকে চোরের রমনীর (৬৮) মত গুপ্ত রাখতে বাধ্য হন। কবি তাঁকে শাঠিনি (৪৬) আখ্যা যেমন দিয়েছেন, তেমনি অন্যত্র কমলিনী (২০১) সাধিকা ও রসময়ী (৩৪৫) বিরহের তীব্র কষ্টে চৌদিশি চাঁদ (৪৪৬) সমান ক্ষীণা। দানলীলায় কৃষ্ণের অবাস্তব বলপ্রয়োগে রাধাকে ব্যাধ (কৃষ্ণ) ভীতা হরিণী (৩২৮) মনে করেছেন কবি। এই উপমাই ব্যবহৃত হয়েছে ৭২ সংখ্যক পদে যেখানে রাধা কম্পিত হরিনীর ন্যায় সর্বদা সন্ত্রস্ত যে কৃষ্ণ প্রেমে তাঁকে কলঙ্কিনী হতে হবে। রাধার বহিরঙ্গ সৌন্দর্য ও নিতান্ত উপেক্ষিত হয়নি জ্ঞানদাসের কাছে। তাঁর মুখাবয়ব কমলের মত, দন্ত মুক্তশুভ্র, নাসিকা তিল ফুল সদৃশ। তিনি হরিণীনয়নী তাঁর লাল ঠোঁটে হাসিটি লেগে আছে ইন্দু রেখার মতো, চিবুকে আছে শ্যাম-বিন্দু-তিল, কুচযুগ কণক গিরি তুল্যপীনল বত। বাতাসে আন্দোলিত শুভ্র বসন যেন জ্যোৎস্নালোকিত লতিকার বিদ্যুৎ। হারের মধ্যে রক্ষিত প্রবাল যেন নদীতে স্নানরত সূর্য্য। সর্পিনী তুল্য লোমলতাবলী, নাভিকূপ হ্রদতুল্য, কটিদেশ কেশরী বা সিংহতুল্য, উরু উলটকদলীর মতো। রাধার পায়ে রয়েছে নূপুর। তিনি চলে যাওয়ার সাথে সাথে নূপুরের নিক্কণ বেজে উঠেছে—মনে হচ্ছে যেন তারা পরস্পরের সাথে ঝগড়া করছে। নূপুর নিক্কণ-এর সাথে ঝগড়া করার তুলনাটি একেবারে লোকায়ত জীবন যাত্রার খুঁটিনাটি থেকে গৃহীত (২৫) কৃষ্ণের রূপ বর্ণনার প্রসঙ্গে ও কবি বিশেষণের উপমাচিত্র অঙ্কন ও করেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তিনি ব্যঙ্গ অর্থে হয়েছেন তিরিভঙ্গ (৩২২) রাঙ্কেরপো (ছেলে) (৩১৮) নব জলধর (২০৫) বা নব মেহা (২৭৩) বা কেবল মেঘ (১৫৬) তিনি কখনো আঁখি-তারা (৬৩), তাঁর গাত্রবর্ণ যেন রাহু (৪২) আগ্রাসীর আঁধার চিত্র। লীলা প্রসঙ্গে তিনি নটবর তথা নটেন্দ্র (৩৪৫) রাধাকে ছলনা করেছেন নাপিতানী (১১) বেশে। তিনি রাধা সঙ্গ লাভ কামনায় সেজেছেন মহাদানী (৩২৮) ও কেরোআল (৩৪১) বা কাণ্ডারী (৩৩৩)। তাঁর শ্যামল দেহ কান্তির সঙ্গে তুলনীয় ইন্দ্রানীলমনি (৩০), অন্যত্র তাঁর রূপ বর্ণনায় পাই নবকুবলয়, অতসী ফুল, নীলমুকুর, দলিতাঞ্জন বা নবীন মেঘের (৩১) বর্ণসাদৃশ্য তাঁর অধর বান্ধুলী ফুলতুল্য (১৬৫) তাঁর ভ্রূযুগল যেন কামের কামান (ওই) তুল্য, বাহু করিবর করের ন্যায় বিশাল (১৫৯)।

প্রথাগত অলংকার ব্যবহার করলেও তার মাধ্যমেও যে প্রকৃত আনন্দ ও সৌন্দর্য্য—তাকে ফুটিয়ে তোলা যায় বা সম্ভব। ওই সঙ্গে বলা দরকার যে, রাধার চরিত্র—চিত্রণের প্রসঙ্গেও কবি যথেষ্ট আলঙ্কারিকতার পরিচয় দেখিয়েছেন। তাছাড়া কবিতার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে কখনোই তিনি অলংকার ভারে আচ্ছন্ন করেননি। ভাষার মণ্ডনকলার ক্ষেত্রেও অলংকারিক জ্ঞানদাস যথেষ্ট সচেতন ও সংযমী।

কবিভাষা : জ্ঞানদাসের চিত্রকল্প নির্মাণ

চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব তত্ত্ব বিষয়ক পদাবলী গানে ব্যক্তিক প্রেমানুভূতি প্রকাশের স্বাধীনতা ও পরিসর সংকীর্ণ হলেও জ্ঞানদাস নিজস্ব কবি ভাবনাগুলিকে শৈল্পিক চিত্র ধর্মে উদ্ভাসিত করেছেন

বহুক্ষেত্রে এবং কবিভাষার প্রাণসৃষ্টিতে ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যেও এঁকেছেন চিত্রকল্পের অনুপম পরিমণ্ডল। সে ক্ষেত্রে, যেমন নিসর্গ প্রকৃতিতে তথা পার্থিব বস্তুকে যথাযুক্ত ব্যবহার করেছেন বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গী আশ্রয়ে তেমনি বিষয়গত ভাবকে গভীর অনুভূতি রসে সিক্ত করে এক অপার্থিব চিত্রময়তার কারুকৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্রকল্প মূলত অলংকরণেরই অংশ বিশেষ, ইতোপূর্বে যে অলংকার শিল্প প্রসঙ্গ আলোচিত সেখানেও বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য সুনির্দিষ্ট অলংকার ব্যবহার না করলেও কাব্যের প্রয়োজনে চিত্ররূপের অবতারণা করেছেন, বর্তমান আলোচনায় এইধরণের রূপচিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করা হবে। প্রথমে নিসর্গচিত্র শোভায় জ্ঞানদাসের শিল্পী স্বভাব ক্ষমতা আলোচিত হয়েছে—রাসের উন্মাদনায় রাধা কৃষ্ণের রতি-রস-পুলকের সাথে সাথে কুঞ্জবনও মেতে উঠেছে, তার চিত্ররূপ এঁকেছেন জ্ঞানদাস—

চন্দন চান্দ কুসুম নব কিশলয়
মন্দ পবন পিকুরার।
বরিহা কপোত জোরে জোরে নাচত
চীতক নিজ পরথার।। (৩৫৪)

চন্দন-চন্দ-জ্যোৎস্না, কুসুম রাশি, নবপল্লব আর মৃদুমন্দবায়, সঞ্চরণে কুঞ্জবন মাতোয়ারা, কোকিলের মিষ্টগান, ময়ূরও কপোতের যুগল নৃত্যে অপূর্ব চিত্রনির্মিত হয়েছে। নিসর্গ ও পক্ষীকুলের এই আনন্দ রাধা কৃষ্ণের রাস লীলার উচ্ছ্বাসের মতোই স্বতস্ফূর্ত।

প্রবাস পর্যায়ের নিম্নোক্ত পদটিতে ও রাধার বিরহ বেদনার তীব্র যন্ত্রণার প্রেক্ষায় বর্ষার কামোদ্রেককারী মিলন পটভূমিকা সজীব প্রাণ সত্তা লাভ করেছে। আকাশ জুড়ে নবমেঘের পদসঞ্চার, ডাহুকীর ডাক আর বর্ষার দরদর—ধারার গম্ভীর ধ্বনি রাধার মনকে হরণ করে নিয়েছে। চাতকের চকিত আহ্বান আসঙ্গমত্ত ময়ূরের শব্দক্ষেপে গাঢ় মিলন সংকেত-রাধার মনে বিচ্ছেদ দুঃখের তীব্রার্তি সঞ্চার করেছে, প্রকৃতির এই মিলনচিত্রও রাধার মানসিক বৈপরীত্য এক দুঃসহ চিত্র সৃষ্টি করেছে —

গগন ভরল নব বারিদ হে বরখা নব নব ভেল।
বাদর দর দর ডাকে ডাহুকী সব শবদে পরান হরি নেল।।
চাতক চকিত নিকট ঘন ডাকই মদন বিজয়ী পিকরব।
মাস আষাঢ় গাঢ় বড় বিরহ বরখা কেমনে গোঙাব।। (পদ নং)

কালিদাসের মেঘদূতের এই শ্লোকটির ধ্বনিরেশ ও ভাবচিত্র এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমা শ্লিস্ট সানুং..."[১৬] ইত্যাদি।

চিত্রকল্প সৃষ্টিতে জ্ঞানদাস কোন কোন পদে চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। ভাষার বিচিত্র ধ্বনি মুখরতার সঙ্গে প্রকৃতির গজন - বর্ষণ - পক্ষী কীট পতঙ্গের মুখর ঐকতানে এক মায়াময় চিত্রলোক নির্মাণ করেছে নিম্নোক্ত পদটিতে। যথা —

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতুহলে।।[১৭]

এখানে শ্রাবন রজনীর মেঘপূর্ণ আড়ম্বর, রিমঝিম অবিরাম বর্ষণ, পাহাড় শিখরে ডাকছে ময়ূর, কৌতুকে কোকিল গান গাইছে, মিলনোন্মত্ত ভেকের মত ডাক শোনা যাচ্ছে। সর্বোপরি

গম্ভীর মেঘ গর্জন। নিসর্গের এই রাত্রীকালীন বর্ষাচিত্রটি কবি সম্পূর্ণভাবে উদঘাটিত করেছেন রাধার, কৃষ্ণের সঙ্গে স্বপ্ন মিলনের অনুষঙ্গে। শ্রবণ ভরল সেই বানী (ওই) দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতে ভগবানের সঙ্গে ভালোবাসার মিলন যেখানে সেই জগৎটা রূঢ় বাস্তব থেকে আলাদা, সে জগৎ হল প্রেম স্বপ্নময়তার জগৎ। সে জগতেরই কঠিন চিত্র এখানে উদ্ঘাটিত।

প্রাকৃতিক পরিবেশকে কবি অনেক সময় রাধা কৃষ্ণের লীলা প্রকাশের প্রত্যক্ষ সহায়ক হিসেবে এঁকেছেন। এ সব স্থলে উপলক্ষ চিত্র - বিষয় উপজীব্য পরস্পরের পরিপূরক। যেমন, নৌকাবিলাসের নিম্নোক্ত পদটিতে কবির উপাদান চয়ন ও পরিবেশ চিত্রন কৌশলে রাধা প্রায় বাধ্য হয়েছেন কৃষ্ণস্মরণ নিতে। অথচ চিত্র নির্মাণে কোথাও অতিযত্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। পদটিতে ভক্ত বৈষ্ণব হিসেবেও কবির ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত—জগৎ সংসার উত্তাল যমুনার জলের মতো। ঈশ্বরের স্মরণ ভিন্ন গতি নেই —

"একি দয়া দেখ দেখ ওগো বড়িমা।
জীরন শীরন আয়স ভিন্ন
অতিপুরাতন না।
অথিরনীর গভীর ধীর।
অগাধ নাহিক যা
বিধির ঘটন আসিয়া পবন
উপাজল বহু বা।।
পাইয়া আশ্রয় দিয়া জয় জয় -
যমুনা কাড়িছে রা।
কল কল কল হিল্লোল কল্লোল
দেখিয়া হেলিছে গা।।
হেলিছে দুলিছে তুলিয়া ফেলিছে
চলবল শ্রোতসা।
জ্ঞানদাসের আশা কেবল ভরসা
ও রাঙা দুখানি পা।।[১৮] (৩৪০)

পারাপারের নৌকাটি অতি পুরাতন, জীর্ন শীর্ন চেহারাযুক্ত। অথচ অস্থির গভীর নদীর জল। নৌকাকে অস্থির করতে ঢেউ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। যে কোন মুহূর্তেই বৃদ্ধ নৌকার সলিল সমাধি যোগ ঘটিতে পারে। এ অবস্থায় রাঙাচরণ দুখানি ছাড়া আর পথ কি? কবি সে উত্তর দেন নি। লক্ষণীয় যে, পদটির বহিরঙ্গ চিত্র-এর মূল বিষয়কে সার্থক ভাবে উদ্ঘাটিত করেছে।

অভিসারের পদেও জ্ঞানদাস বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু চিত্রকল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, এগুলোর মধ্যে তিনি চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ধ্বনি ঝংকারের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন এবং সেখানেই তাঁর অভিনবত্ব।

মেঘে যামিনি অতি ঘন আনিয়ার।
ওইছে সময়ে ধ্বনি করু অভিসার।।
ঝলকিত দামিনী দশদিশ আপি।
নীল বসনে ধানি সব তনু ঝাঁপি।।

বরিখত ঝরঝর খরতর মেঘ।
পাতল সুবদান সঙ্কেত গেই।। (১৮০)

এখানে স্পষ্টই দেখা যায়, বর্ষাভিসারের পটভূমিটি অত্যন্ত জীবন্ত। ঘনমেঘ আবৃত আঁধার সে আঁধারে পথ দেখাচ্ছে বিদ্যুৎ চমক। বৃষ্টি পড়েছে অঝর ধারায় এর মধ্যেই রাধা চলেছেন অভিসারে আঁধার রাতে তাঁর নীল বসন এই চিত্রকল্পকে প্রাণ দিয়েছে।

১৮৭ সংখ্যক পদেও দেখি ঘনান্ধকার রাতে রাধা অভিসার করছেন। এটি তিমিরাভিসারের পদ। সর্পসঙ্কুল পথকে রাধা তৃণসম গণ্য করেছেন। কারণ বাসক সজ্জায় শয্যা বিছিয়ে রাধা উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছেন প্রিয় মিলনের জন্য। বাইরে ঘন অন্ধকার রাত্রি ও মেঘ গর্জন শোনা যাচ্ছে। রাধার সাগ্রহ মনোরথ বিফলে যাচ্ছে। তাঁর খণ্ডিত প্রাণকে চিত্রিত করেছেন কবি, তাঁর উচাটন প্রাণেও চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ এবং ব্যাকুল বিফল প্রাণে যেন ঝন ঝন করে মেঘগর্জন শ্রুত হচ্ছে - একটি মাত্র পংক্তিতে কবি একথা ব্যক্ত করেছেন—দহয়ে দামিনি ঘন ঝনঝনি পরান মাঝারে হানে। (৩৮৩)

৪৩৮ সংখ্যক পদের এই পংক্তিতে রাধার প্রবাসজনিত বিরহকথা কবি অপূর্ব কৌশলে চিত্র মণ্ডিত করেছেন। রাধার প্রেম স্পষ্ট ও বলশালী। সে প্রেম এখন ক্ষীণ হয়ে গেছে। প্রেমের সেই ক্ষীণ দুর্বল অবস্থা রাধার বিরহক্লিষ্ট শীর্ণ তনুর মতন এখানে রাধারশরীর কেই কবি প্রেমের মূর্ত রূপ করে তুলেছেন —

দিনে দিনে শেহ দেহ অনুসার।।
বিহি সে কয়ল মোহে হাহা যার।। (৪৩৮)

আবার রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেম যে কত অবিরাম কত নিরন্তর তা কবি চমৎকার ভাবে একটি অসামান্য চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন, এবং সেই প্রেমোৎসারকে অভিনব ভাবে লোকায়ত করেছেন। প্রেমের এই রূপ সোহাগ কবির চোখে ভাদ্রের বর্ষণ তুল্য গাঢ়তা ও বহতা লাভ করেছে—

সে সব আদর ভাদর বাদর
কেমনে ধরিব দে" (৬০)

স্বপ্ন মিলনের নিম্নোক্ত পদে রাধা যখন মিলন সুখে অবশ, তখনই সেই স্বপ্ন মিলন থেকে জাগরণের বিচ্যুতি ঘটে। এই বিচ্যুতির তীক্ষ্ণ আঘাতকে কবি স্পষ্ট করেছেন মিলিত কপোত পক্ষীর উপর নিক্ষিপ্ত অতর্কিত বাঁটুলের প্রচণ্ড আক্রমনের উপমাচিত্রে। মৈথুনরত ক্রৌঞ্চ দম্পতির উপর বর্ষিত শরাঘাতের সুদূর চিত্রটি এখানে সম্ভবত অনুসৃত 'মানিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বত সমা। যা ক্রৌঞ্চ মিথুনা দেকমবধি কাম মোহিতম'।। বাল্মিকী—

"পরশ করিতে রস উপজিল জাগিয়া হইনু হারা"
কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল বধিলে যেমন হয়। (৪৯৭)

দেখা গেল যে, জ্ঞানদাস চিত্রকল্পের ব্যবহারে একদিকে যেমন কাব্যের বহিরঙ্গ সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পেরেছেন, তেমনি অমূর্ত ভাবরাশিকেও অসামান্য কৌশলে লোক প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এখানেই তাঁর বিশিষ্ট আধুনিকতাবোধ প্রকাশিত।

গ্রন্থসূত্র

১. বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত : 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী' (১৩৭২ বঙ্গাব্দ, গ্রন্থভবন)। পার্শ্বস্থ সংখ্যা উক্ত গ্রন্থের পদসংখ্যা সূচিত করে।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বলাকা (১৩৫১, বিশ্বভারতী) ৬ নং, পৃ. ১৭।

৩. বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত : 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী' ১৩৭২।

৪. অতীন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত : 'চর্যাপদ' (৩য় সং, ১৯৭২, নয়াপ্রকাশ) পদসংখ্যা-৬, পৃ. ১২৫।

৫. বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত : 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী' ১৩৭২।

৬. ড. দীপ্তি ত্রিপাঠি : আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় (১৯৫৯), পৃ. ২৫।

৭. বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত : 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী' ১৩৭২।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা (বিশ্বভারতী ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৮৪।

৯. বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত : 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী' ১৩৭২।

১০. শঙ্করী প্রসাদ বসু : মধ্যযুগের কবি ও কাব্য (১৩৭৯), পৃ. ৭৬।

১১. শঙ্করী প্রসাদ বসু : মধ্যযুগের কবি ও কাব্য (১৩৭৯), পৃ. ৭৯।

১২. শঙ্করী প্রসাদ বসু : মধ্যযুগের কবি ও কাব্য (১৩৭৯), পৃ. ৭৬।

১৩. বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত : 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী' (১৩৭২)।

১৪. শঙ্করী প্রসাদ বসু : মধ্যযুগের কবি ও কাব্য (১৩৭৯), পৃ. ৭৯।

১৫. বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত : 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী' (১৩৭২)।

১৬. রাজশেখর বসু সম্পাদিত : কালিদাসের 'মেঘতদূতম' (১৩৬৯, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি.) পূর্বমেঘ, শ্লোক নং ২, পৃ. ২।

১৭. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা (১৩৬৫), পৃ. ৫৭।

১৮। বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত ঃ 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী' (১৩৭২)।

গোবিন্দদাসের কাব্যভাষা

গোবিন্দদাসের : ভাষা নির্মিতি

চৈতন্য-উত্তর বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব তথা-গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অন্যতম উত্তরসুরী হলেন ষোড়শ শতকে আবির্ভূত ভক্ত ও বিদগ্ধ কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ। "পরিণত মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, গোবিন্দদাস সাধনার অঙ্গরূপে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন"[১] বৈষ্ণব রস সাধনায় তাঁর সম্যক উপলব্ধি ও সিদ্ধি। তাঁর জ্ঞানচর্চার ফসল হিসেবে, তা প্রতিফলিত হয়েছে বৈষ্ণব পদবলীতে। সংস্কৃত অলংকার-কাব্যশাস্ত্রে তাঁর প্রশ্নাতীত দক্ষতা থাকায় এবং কাব্যের মণ্ডণকলার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকায় সম্ভবত তিনি বিদ্যাপতি প্রবর্তিত কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষাকেই প্রধানত তাঁর পদাবলীর ভাষা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। এবং এই ভাষারই অসামান্য প্রয়োগে তিনি ভাষার ঐশ্বর্য ও অলংকৃতি, ভাবের গূঢ়ত্ব ও গাম্ভীর্য, ছন্দের বিত্ত ও নৃত্য দ্বারা...তাঁহার রূপালোক নির্মাণ করিয়াছেন।"[২] তাঁর ভাষা পদাবলীতে এনেছে ছন্দোময় গতি, শ্রুতি সুখকর ধ্বনি-উল্লাস ও সুরের আবেশ। অত্যন্ত সচেতন ভাবেই কবি তাঁর পদে ভাষা ব্যবহারে "চাতুর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের অপূর্ব সমন্বয়ও ঘটাইয়াছেন।"[৩] গোবিন্দদাসের অনুশীলিত কবিমন ও ভাষা-শব্দ প্রয়োগের ব্যাপারে তাঁকে সহায়তা করে থাকবে। তাঁর ভাষা ব্যবহার আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রথমে তাঁর ভাষায় ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করব। স্বরান্তধ্বনি ব্যবহার। যথা —

অধর সুধা - ঝরমুরলি তরঙ্গিনি বিগলিত রঙ্গিনি হৃদয় - দুকুল।
মাতল - নয়ন ভ্রমণ জনু ভ্রমি ভ্রমি উড়ি পড়ত শ্রুতি-উতপল ফুল।।[৪]

(পদকল্পতরু, ২৪২৪ নং পদ)

পংক্তিগুলিতে 'অধর ঝর, বিগলিত, হৃদয়, দুকুল, মাতল, নয়ন, ভ্রমর, পড়ত, উতপল, ফুল' প্রভৃতি শব্দগুলি 'অ' স্বরান্ত ধ্বনিযুক্ত। এবং 'মুরলি, তরঙ্গিনি, রঙ্গিনি, ভ্রমি ভ্রমি, উড়ি, শ্রুতি' প্রভৃতি শব্দগুলির শেষে 'ই' স্বরান্ত ধ্বনি শ্রুত হয়। এই ধ্বনি সাম্যের পৌনঃপুনিক প্রয়োগের ফলে পাঠকের শ্রুতিতে এক আশ্চর্য শব্দরোল অনুভূত হয়। কৃষ্ণের অধররূপ অমৃত প্রবাহ যুক্ত যে বংশীধ্বনি-রূপ স্রোতাবেগে উছলে পড়ছে রঙ্গিনি গোপীদের বুকের বস্ত্র আবরণী বা হৃদয়-আবরণী। মত্ত ভ্রমরের মতো তাঁর চঞ্চল চক্ষু কর্ণ প্রান্তে বিলম্বিত পদ্মের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কবি স্বরধ্বনির এবং ব্যঞ্জনধ্বনির ধ্বনি অনুপ্রাসের মাধ্যমে এখানে কৃষ্ণের অসামান্য রূপকে অপূর্ব কৌশলে ব্যক্ত করেছেন।

শব্দের মধ্যে স্বর প্রয়োগ করে বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির মাধ্যমে ছন্দে মাত্রাসমতা রক্ষা করা হয়েছে অনেক স্থলে। যেমন— ৪৭ সংখ্যক পদে —

শ্যামর গৌরী বি।। লাল রস কিঞ্চিত।। ৮।।৮।।
মঝুচিতে করু পরচার।[৫] ১০।

'পরচার' প্রচারকে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে স্বরভক্তির সাহায্যে চারমাত্রা গণনা করে মাত্রাসাম্য রক্ষা করা হয়েছে।

৪৮ সংখ্যক (ওই) পদের বিভিন্নস্থলে 'উনমত', 'গেয়ান', 'খরতাপ' প্রভৃতি স্বরভক্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট রূপে ছন্দসাম্য রক্ষা করা হয়েছে।

যে সমস্ত শব্দ স্বরভক্তির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট ভঙ্গীতে ছন্দে সমতা রক্ষা করেছে তার মধ্যে আছে—'পরমাদ' (৫২, ৫৩ নং পদ), ধৈরজ (৭,২ নং পদ), পরবেশ (৫৪ নং পদ), পরকার (ওই), ভরমে (৯৯ নং পদ), নিশাস (১৪৬ নং), ধেয়ান (১৩৩ নং পদ), পরাণ (১৭৩ নং পদ), পরকাশি (১৭৯ নং পদ), বরত (২১৫ নং পদ), পরথায় (২২১ নং পদ), পরসাদ (২২৫ নং পদ) , বেয়াধি (৪২৫ নং পদ), দরশায়ল (৩৬৮ নং), পরবোধবি (৫১৩ নং পদ), সিনান (৪৩৩ নং), নিরবন্ধ (৫৪১ নং), সনেহ (৬২৫ নং) পরতীত (৬৫৫ নং), বরজ (৭০৮ নং পদ), তরাসি (৭১৫ নং) প্রভৃতি।

এছাড়া পংক্তি মধ্যে ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি কল্পেও বহু শব্দ স্বরভক্তি অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে। যথা—লুবধ (২২ নং), মুগধ (ওই), বেকত (ওই), করম (৪৮ নং), মগন (৫২ নং), বিদগধ (৮২ নং), বরণ (৮৭ নং), হরসিত (৯৩ নং), মুকুতা (১০২ নং), নিরমিত (১৩৪ নং), উপত (১৯১) উনমাদ (২৮০ নং), নিরমাণ (৩৪২ নং), পরশ (৪৫৮ নং), নিমগন (৫৫০ নং) নিরবাহ (৩১৮ নং), গরজন (৫৯ নং) অশোয়াস (৬২৭ নং) প্রভৃতি। অনেক সময় যুক্তবর্ণের একটি লোপ করে ছন্দোসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। বর্ণলোপের ফলে উচ্চারণেও একটা স্বরান্ত প্রবণতা লক্ষণীয়। এতে কাব্যভাষায় লালিত্য ও পেলবতা এসেছে। নিম্নোক্ত শব্দগুলোকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। যথা—

দিঠি (৬০ নং), সরবস (৬৬ নং), উপেখি (৪৫৪ নং) পতগ (১৮৩) কটাখ (১৮৪ নং পুনফলে (৪৪১ নং), ভমরা (২৬৫ নং) অহনিশি (১৮১ নং) হিলোল (৫৫৮ নং), নীলজ (৫১৮ নং), উলসিত (৫১১ নং), নিশাস (৫৬১ নং), পিয়া (৪৬৮ নং), নিঠুর (৪৩১ নং) দীঘ (৪৩৩ নং), উতর (৪২৬ নং), উনমত (২৬৭ নং), উতপত (২৩৭ নং) প্রভৃতি।

গোবিন্দদাস ধ্বনিতাত্ত্বিক বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে স্বরসঙ্গতিকেও ব্যবহার করেছেন। স্বর-সঙ্গতির প্রয়োগে স্বরসাম্যহেতু পদে শ্রুত হয়েছে স্বরধ্বনির একটা তরঙ্গ। যথা—বিঘিনি (২৫৩ নং), রহত (৩৪৪ নং), পাতল (৮০ নং) মুরুখপণ (২৫৩ নং), নিতিনিতি (৫৯ নং), অভরণ (৪১৮ নং), মুরুতি (২৫০ নং), পদুমিনি (৩২৩ নং), চলল (৪৫৩ নং), মুগুধিনি (৪৭০ নং), মীলল (৪৬৫, ৪৯৮ নং) প্রভৃতি।

স্বরধ্বনির সরাসরি ব্যবহার প্রবণতাও গোবিন্দদাসের পদে লক্ষণীয়। অনেক সময়ই 'য়' স্থলে 'এ' এবং 'ছ' স্থলে 'ও'-র ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—অতএ (৪২৪ নং), কি এ, কর এ (৪২৯ নং) আওল (৪৩৩ নং) ঘুমাওল, পাওল (৩৩৮ নং), নেহার এ (৮৩ নং), প্রভৃতি।

ধ্বনিরূপের বিভিন্ন পরিবর্তনের মত গোবিন্দদাস তাঁর পদাবলীতে শব্দরূপেরও নানা ধরণের ব্যবহার করেছেন। গোবিন্দদাসের ভাষা মূলত ব্রজবুলি। এই ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ক্রিয়ার বর্তমান কালের বিভিন্ন রূপগুলির মধ্যে, উত্তমপুরুষে 'হু, ইয়ে, অ, ই, ত' প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। যথা—

রহু (৪৩৪ নং), শুনিয়ে (৪০৭), কাঁপ (৪৩৭ নং), অনুরোধই (৪০৮ নং), রোই (৪০৯ নং), বাঢ়ত (৪০৯ নং) চাই (২২৯ নং) প্রভৃতি।

মধ্যম পুরুষে প্রধানত সি, ই, হ প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত। যথা—জানসি (৫১য নং), ফিরসি,

করসি (৫১৫ নং), গরাসি, তরসি (৪৫৯ নং), গঞ্জসি, মানসি, নিন্দসি, পরিবাদসি (৪৪৪ নং), মোড়সি (৪৪৭ নং), দগধসি (৪৪৮ নং), ইত্যাদি এবং ধুয়ায়সি (১৮৩ নং) ঘোষই (৩৩০), চলহ (৪৪৩ নং) প্রভৃতি।

প্রথম পুরুষে ব্যবহৃত প্রত্যয়ের মধ্যে আছে - ই, ত, তা, আ, হি, ইয়া, উ, প্রভৃতি। যথা —

নেহারই, গাওই, সম্ভাষই, কহই (৪১৩ নং), রোয়ই, জীয়ই (৪২০ নং), মোছই, মেটই (৩০১ নং), সমুঝই (৩০৮), বিরাজই (৫৭৯ নং), চঢ়ই ৯৩৩৫ নং), পোহায়ই, লোটাই (২২৭ নং), রহই, রোই (১৩১ নং), বিহই (১৫০ নং), করত (৪৪৫), শোভিত (২৬৫ নং), পরিপূরিত (২৬৭ নং), পড়ত (১৮২ নং), মুখরিত, পুলকিত, বহই (১৫৯ নং), ঝুর (৫০৭ নং), তুম - দহ - দাহ (৪), ফোর (৫১৩ নং), অবনায়িতা (১১৪ নং), কহতহি, জলতহি (৪৭৫ নং) করতহি (২২৭ নং) চলিয়া, টলমলিয়া, ঝলমলিয়া (১৫০ নং) রুনিঝুনিয়া চলু (১৫০ নং)। পাতিয়া, রাধিয়া, ঝলমলিয়া, কিনিকিনিয়া, দোলনিয়া, দমনিয়া, মাতিয়া (৫৫৯ নং) প্রভৃতি।

অসমাপিকা ক্রিয়ায় 'ইতে, ই, এ' প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। যথা—

শুনইতে, কহইতে, সভরিতে, চলইতে, হেরই (২৪৩ নং) সোঙরি তবই (২৬৭ নং), বণি (১৭৯ নং), সমাধিয়া (ওই) রোখে (৫১৯ নং), ভাগি (৪৯৯ নং) জপিতে জপিতে (ওই) চমকি চমকি (৩৬৭ নং), দুরহি ভারি (৩৫৬ নং) ইত্যাদি।

অতীত কালের ক্রিয়াপদেও বিভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে এবং শব্দে বৈচিত্র্য এনেছে। উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদে সাধারণত লুঁ, হুঁ ইত্যাদি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে।

কয়লুঁ (৪০৫ নং), কহলহুঁ (৪৪৫ নং), আয়লুঁ (৪২৩ নং), চঢ়ায়লুঁ (৪১৭ নং), সাজিলুঁ, জানিলুঁ (৪৩১ নং), পায়লুঁ, বুঝলুঁ (৪৩৮ নং), ভেটলুঁ (৪৪১ নং), উপেথলুঁ ৯৫১৩ নং), পাঠাওলুঁ (৪৫৩ নং) প্রভৃতি।

প্রথম পুরুষে সাধারণত লোঁ, অল, অলি, এল, প্রত্যয় যুক্ত। যথা—

—পরবেশলোঁ (৪৪৫ নং), ভৈগেল (৫১৬ নং), দংশল (৫১৫ নং), বৈঠল (৪৬৭) পোহায়লি (৩৭৭ নং), বান্ধল (৪৩৫ নং), মীলল (ওই), বিথারল (ওই), চঢ়ল (৪০৭), ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষের অতীতকালে ব্যবহৃত হয়েছে অলি (লি) প্রত্যয়। যথা —

বাঢ়য়লি, ধরলি (৫১০ নং), হানলি (৩২৩ নং), কহলি (২৩৪ নং) ইত্যাদি।

ভবিষ্যত কালের উত্তম পুরুষে 'ব' প্রত্যয়—সমাধব (৪১৭ নং), শিখায়ব (৪৫২ নং) পরবোধব (৪২১ নং), জোড়ব (২৬৫ নং), ধাব (ওই) বোলব (৪২২ নং), জারব (৪১৩ নং) ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ায় 'বি' প্রত্যয় যোগ হয়েছে—মিলায়বি (৫১৪ নং), উপেথবি (৩৪৩ নং), কহবি, করবি, বুঝায়বি, ধরিবি (২৩৩ নং) প্রভৃতি।

প্রথম পুরুষে ব্যবহৃত হয়েছে 'ব' প্রত্যয়। যথা—

মিলব (৪০৭ নং), দিয়ব (৪০৬ নং), বিশয়াসব (৪৬৪ নং), শুনব (৬৩১ নং) প্রভৃতি।

বিশেষ্য পদের সঙ্গে 'নি' এই 'পদ পুরণার্থক অব্যয়' ব্যবহৃত হয়েছে ছন্দোসাম্য ও শ্রুতিমাধুর্য সম্পাদন হেতু। যথা—গাহনি, চাহনি, সাহনি, (৫৫৬ নং), চোরনি, লোলনি, দোলনি, গাওনি (৫৫৫ নং) প্রভৃতি।

ভাষায় সঙ্গীত ধর্ম তথা সুরের তরঙ্গ সৃষ্টি কল্পেও অনেকস্থলে 'নি' অব্যয়ের ব্যবহার হয়েছে। পদচলনি (১৬৪ নং), নেহারনি (১৬৩ নং), শোহনি (১৫৭ নং), মনোরথ-করনি (৫৫৭ নং) প্রভৃতি।

আবার স্ত্রীলিঙ্গেও 'নি' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে পদের মধ্যে ধ্বনির ব্যঞ্জন এনেছে। যথা—কেশিনি, বেশিনি, আবেশিনি, ভঙ্গিনি, সুরঙ্গিনি, তরঙ্গিনি, সঙ্গিনি, রঙ্গিনি, গামিনি, দামিনি, ধারিনি, অভিসারিনি, বিহারিনি, অনুরাগিনি, সোহাগিনি, বিলাসিনি, বিকাশিনি, চিতশোহিনি (৩৪৩ নং) প্রভৃতি।

দ্বিরুক্ত শব্দ ও শব্দমেলের অপূর্ব ধ্বনি ঝঙ্কার গোবিন্দদাসের পদে এনেছে ধ্বনিমাধুর্য ও শ্রুতিমাধুর্য। এক্ষেত্রে অনেক সময় স্বরভক্তিরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। যথা—হাসনি-ভাসনি (১২ নং), হেলন -দোলন (১৩ নং), হরষি-বরষি, নটন-ঘটন, চলত-খলত উত্তম-অধম, (১৭ নং পদ), মগন-সগন (৫১ নং), কাজর-জাগর (৬৫৯ নং), উমরি-ঝুমরি (৪৮৭ নং), দরশ-পরশ (৪৬৬ নং), অঙ্গ-ভঙ্গ (৫৬৫ নং), খঞ্জন-গঞ্জন (২৪৫ নং), শাঙ্কিল-পাঙ্কিল (৩৫৩ নং) ইত্যাদি।

গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভাষা ঐশ্বর্য মণ্ডিত হওয়ার একটি কারণ তাঁর শব্দ ব্যবহারে অসামান্য দক্ষতা। বহু ধ্বন্যাত্মক বা, অনুকারাত্মক শব্দকে কবি ব্যবহার করেছেন। যথা—লহু লহু (৩, ২০, ২৭, ৪০, ৫৮, ৪৮৮, ২৬৪, ৬১০ নং প্রভৃতি), গদ গদ (৩, ৫, ৭, ১৬, ২২, ২৪১, ২৬৩, ৪৪৩, ৪৮৭, ৫৫৭ নং পদ) গরগর (৩, ৭, ১৩, ২৩৫ ইত্যাদি), টলমল (৫, ৬৮৫ নং), ঝলমল (৫, ২৩, ৫৬১, ৫৬৩, ৫৬৬ ইত্যাদি), ঢর ঢর (১২, ৫৭, ৬৮ ইত্যাদি), ছলছল (২৪, ২৯, ৩১, ৬৭২ নং), ঝনঝন (৩২, ৩১৮, ৭১১ নং ইত্যাদি), ঢলঢল (১৭১, ৫৫৮ ইত্যাদি), ছটফট (৪৪৪, ৬৪১ ইত্যাদি) ঝরঝর (২৩৫, ৪৮৭, ৬৫২, ৭১১ নং), খরখর (২৬৩ ইত্যাদি), ঝাঁঝাঁ (৭১১ নং), লটপটা (২১৩ নং), ইত্যাদি।

গোবিন্দদাস প্রকৃত অর্থেই শব্দ-শিল্পী। তাঁর কবিতায় তাই শব্দভাষার চিত্ররূপ পরিলক্ষিত হয়। একই বিশেষণকে বিচিত্র ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেছেন। যেমন—'ভকত' শব্দটিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত করেছেন। 'ভকত-কল্পতরু (৬ নং, ১ নং ইত্যাদি) অর্থাৎ গৌরাঙ্গ ভক্তরূপ কল্পতরু বৃক্ষ রোপণ করেছেন। 'ভক্ত' কখনো হয়েছে নামামৃত কীর্তনকারী 'ভ্রমরগণ' (১১ নং), 'ভক্তকে কখনো কবি সাধারণের অনেক উর্দ্ধে স্থাপন করেছেন দশদিশ আলোককারী উজ্জ্বল 'নখতবৃন্দ' (নক্ষত্র) (১৭ নং) রূপে। ভক্তরূপ নক্ষত্র যেন অন্ধকার আকাশের ন্যায় পৃথিবীকে উজ্জ্বল করে তুলবে। তাঁরা গৌরাঙ্গরূপ চন্দ্রকে বেষ্টন করে আছে—'দেখত বেকত গৌরচন্দ। বেঢ়ল ভকত-নখতবৃন্দ। অখিল-ভুবন উজরকারি। কুন্দ কনক কাঁতিয়া। "(ওই)। ২১ নং পদে দেখি, ভকত চকোর' রূপে গৌরাঙ্গের প্রেমে ব্যাকুল। গোবিন্দদাস ভক্ত হিসেবে অনুভব করেছেন যে, বিদ্যাপতির কৃপাতেই তাঁর অন্ধত্বনাশ হবে এবং ভক্তের নখমণিরূপ চন্দ্র-কিরণ ছটায় দশদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠলে তার রশ্মি বিন্দুর স্পর্শে তাঁর জ্ঞান-নয়ন প্রকাশিত হবে। এখানে 'ভকত-নখর-মণি-ইন্দু' রূপে (৪৫ নং) কল্পিত। 'প্রেম' শব্দটিকেও কবি বিভিন্নরূপে তাঁর পদে উপস্থাপিত করেছেন। প্রেম কখনো 'রতন ফল' (১১, ২৪ নং), কখনো 'অমিয়া' (অমৃত) তুল্য (২০, ২১ নং), কখনো বহু 'তরঙ্গ' ক্ষেপের মতো (২০ নং) উত্থান পতনময়। প্রেমকে কবি দেখেছেন 'আনন্দ' স্বরূপে (১১, ১৬, ২৬ নং প্রভৃতি), অনেকস্থলে প্রেম 'সিন্ধু' তুল্য গভীর শান্ত (১৫, ১৮ নং) প্রেমের দোষ কখনো ব্যবহৃত হয়েছে 'বন্ধন ডোর' (৩৭ নং), বা নয়ন 'লোর' (৩৭ নং)। প্রেমকে কবি জ্ঞান করেছেন 'মুকুটমণি' (৪৮ নং), 'রতন বন' (৬৪ নং) প্রভৃতি মহার্ঘ বস্তু তুল্য। মাঝে মাঝে প্রযুক্ত হয়েছে লৌকিক তুলনামূলক শব্দবলী। যথা—প্রেমের অস্পষ্ট জটিল উপমায় 'ধুম' (৪২১ নং) শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। প্রেম যেন ধোঁয়াটে স্বরূপে আচ্ছন্ন। এখানে কবির মৌলিকতাও

প্রশংসনীয়। হৃদয়ের বিচিত্র গতিপথের প্রেমকে কবি 'প্রহরী'র সাজ (৫৯৬ নং) পরিয়েছেন। প্রেমকে গুপ্ত করতে কবি ব্যবহার করেছেন 'কুলুপ' (৬২৯ নং) এর অনুষঙ্গ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে প্রেমের অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের একটি হচ্ছে 'পুলক'। এই ভাবটিকেও কবি বিচিত্র শব্দোপমায় এঁকেছেন। পুলকের বর্ণোজ্জ্বল প্রকাশের মধ্যে আছে—'পুলক-মুকুল' (১১, ১৩ নং), 'পুলক-কদম্ব' (২০, ৫৪৩ নং), পুলকের ব্যাপক পটভূমি স্মরণ করে এসেছে — 'বিপুল পুলক' (১০, ১৬ নং), 'পুলক-পাঁতিয়া' (১৭ নং), 'পুলক-পটল-বলয়িত' (৩৭ নং) (বালা তথা অলংকার স্বরূপ) প্রভৃতি শব্দোপমা।

গোবিন্দদাস শব্দ প্রয়োগে মনস্বীতার পরিচয় রেখেছেন। প্রসঙ্গানুসারী শব্দ প্রয়োগে তাঁর নৈপুণ্য দেখা যায়। তিমিরাভিসারিকা রাধাকে কবি ঘন অমাবস্যার অন্ধকারে মিলিয়ে দিয়েছেন। নিসর্গ প্রকৃতির গোপন-আঁধারে তাই কবি রাধাকে স্থাপন করেছেন নীল বর্ণের গাঢ়ত্বে। শব্দকল্প ও চিত্রকল্পের জোড়কলম লক্ষিত হয় এই পদটিতে —

নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়গণে ভুজ যুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল।।
.....
নীল অলকাকুল অলিকে হিলোলিত
নীল তিমিরে চলু গোই। (৩৫৭ নং)

এখানে, নীল-মৃগমদ, নীল-হার, নীল-কজ্জল, নীল-তিমিরের গাঢ় আঁধারে নীল বর্ণের বিশিষ্ট প্রয়োগে তিমিরাভিসারের অসামান্য প্রেক্ষাপট উন্মোচিত করেছেন কবি। 'নীল-তিমিরে' শব্দটির ব্যবহারে কবির শৈল্পিক মনটি ব্যক্ত হয়েছে। পরের অংশে রাধা হয়ে গেছেন নীল পদ্ম, এবং শ্যামল সায়রের কোলে চলেছেন তিনি। কেউই তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু পদ্মের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে নীল ভ্রমরেরা তাঁকে ঘিরে ঝঙ্কার করছে। কেবল মাত্র কবি বুঝতে পারলেন যে 'রাই চললি অভিসার'। (ওই)

একই শব্দের বার বার প্রয়োগ বর্তমান—আধুনিক কবিদের কবিতায় লক্ষিত হয়। অবশ্য বৈষ্ণব কবিরাজ এক শব্দ বা একটি পদাংশ বারবার ব্যবহার করেছেন একই পদে। গোবিন্দদাসের নিম্নোধৃত পদটিতে একই শব্দের বারবার ব্যবহারে শব্দটি বিশেষ বক্তব্য উপস্থিত করেছে। যথা-

"নব নব গুণগণ শ্রবণ - রসায়ণ নয়ন - রসায়ণ অঙ্গ।
রভস - সম্ভাষণ হৃদয় - রসায়ণ পরশ - রসায়ণ সঙ্গ।।"[৬] (৯০২ সংখ্যক)

কৃষ্ণের সর্বাঙ্গীণ মাধুর্য রাধার স্মৃতিতে প্রবলভাবে জাগরূক। কৃষ্ণের নতুন নতুন গুণগানে তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত, তাঁর অনুপম অঙ্গশোভা-নয়নের আনন্দদায়ী, তাঁর মিলন-সম্ভাষণে হৃদয় হয়ে ওঠে আনন্দকুল এবং তাঁর সঙ্গলাভে স্পর্শপুলক জেগে ওঠে। রাধার বিচিত্র আনন্দানুভূতি 'রসায়ণ' শব্দের মধ্যে দিয়ে জাগ্রত।[৭]

১৯০ সংখ্যক পদটিতে দেখি —

"লোচন শ্যামর বচনহুঁ শ্যামর শ্যামর চারু নিচোল।
শ্যামর হার হৃদয় জনু শ্যামর শ্যামর সখি করুকোর।।"

কৃষ্ণকে ঘিরে রাধার অনুরাগ-লালসা উদ্বেগ আকুলতার কথা তিনি সখিকে জানাচ্ছেন। তাঁর ভাব-

তন্ময় হৃদয়ের ব্যাকুলতা 'শ্যামর' শব্দের কোমল প্রয়োগে পাঠক মনকেও আচ্ছন্ন করে। রাধা এখানে শ্যামময় হয়ে গেছেন। তাঁর চোখে শ্যাম-কজ্জল, মুখে শ্যামনাম, অঙ্গের বস্ত্রও শ্যামবর্ণের। তাঁর গণ্ডদেশে দুলছে শ্যামল হার, বুকে রয়েছে নীলমণি। কৃষ্ণ মনে করে তিনি আলিঙ্গন করছেন কোন শ্যামলী সখিকে। রাধার এই রূপময়তার চিত্রটি 'শ্যামর' শব্দ প্রয়োগে অপূর্ব ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

বর্ণ আর শব্দ নিয়ে অনায়াস, স্বতস্ফূর্ত প্রযোজনায় গোবিন্দদাস বৈষ্ণব সাহিত্যে তুলনাতীত। এক একটি ব্যঞ্জনবর্ণকে ধরে তিনি যেন শব্দের স্বর্গলোক সৃষ্টি করেছেন। গোবিন্দদাসের বৈদগ্ধ্যপূর্ণ মানসিকতার প্রকাশও এসব পদে লক্ষিত হয়। কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় রূপাঙ্কনে কবি 'ক' বর্ণের শব্দলোক নির্মাণ করেছেন —

"কুবলয় - কন্দল - কুসুম - কলেবর
কালিম - কান্তি - কলোল।
কোমল - কেলি - কদম - করিম্বত
কুন্তল - কান্ত - কাপাল।।
জয় জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কমলেশ"। (১১৭ নং পদ)

স্পষ্টতই বোঝা যায়, এখানে 'ক' বর্ণের শব্দগুলির ছন্দোময় ধ্বনি কল্লোলে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষ্ণবন্দনা করা হয়েছে। কৃত্রিম হলেও এর নিপুণ প্রয়োগ লক্ষণীয়। নীলপদ্ম ও কন্দল পুষ্পের বর্ণের ন্যায়, কৃষ্ণের দেহের বর্ণে নীল তরঙ্গ। তিনি কোমল কেলি কদম্বের নীচে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁর গণ্ডদেশে স্পর্শ করে দোলায়িত কুন্তল। এই যে কৃষ্ণ, কমলাপতি তাঁর জয় হোক।

'ল' ধ্বনির মধ্য দিয়ে একটা কোমলতা ফুটে ওঠে। এবং নিম্নোক্ত পদটিতে রাধার বিষাদিত অন্তরের বিরহাশ্রু বর্ষণে 'ল' বর্ণাশ্রিত শব্দগুলির মধ্যে দিয়ে একটা বিরহ তরঙ্গ ও কোমল বিষাদ ফুটে উঠেছে —

ললিত কমল ফুল বালা।
লাগল বিরহক জ্বালা।।
লীলা লাবণি খোই।
লোর লহরি ভরে রোই।। (১৪৬ সংখ্যক পদ)

বিরহের অশ্রু বর্ষণে 'লোর লহরি ভরে রোই' পংক্তিটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে এর 'ল' 'র' বর্ণের ধ্বনি অনুপ্রাস তরঙ্গ সৃষ্টিতে। রাধা-বিরহের তীব্র বেদনা ফুটিয়ে তুলতে কবি অসাধারণ শব্দচিত্রের কল্পনা করেছেন —

"বাসিত বিশদবাস - গেহে বৈঠত বহ্নি - ভবন বলি উঠই।
বরিহা - বিরচিত বীজন বিজইতে বিষধর - বিষ সম বলই।।" (১৪০ নং পদ)

সুবাসিত নির্মল বাসগৃহকে রাধা অগ্নিগৃহ বলে চিৎকার করছেন। ময়ূরপুচ্ছের পাখা দ্বারা তাঁকে বাতাস করা হচ্ছে অথচ তা সর্পের জ্বালাময় বিষতুল্য বলে তাঁর বোধ হচ্ছে। রাধার বিরহ -অন্তর্জ্বালা এতই দুঃসহ যে ঘর-দুয়ার তাঁর কাছে অগ্নিজ্বালার মত এবং শীতল বাতাস তাঁর কাছে বিষের জ্বালার মত। 'ব' বর্ণের শব্দ প্রয়োগে কবি রাধার বিরহ-স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। নির্মল বাসগৃহের বিপরীতে 'বহ্নি-ভবন' শব্দটির অসাধারণ প্রয়োগ লক্ষণীয়। পাখার বাতাসের বিপরীতে 'বিষধর বিষ' শব্দটি আটপৌরে হলেও একটা ভীষণতা ফুটিয়ে তুলেছে।

এই ধরণের বিশেষ বর্ণের সাহায্যে শব্দালোক নির্মাণের প্রবণতা অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের

মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। সেদিক থেকে গোবিন্দদাসকে প্রথানুগত্যই স্বীকার করতে হয়েছে। তবে শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর মৌল কল্পনাও স্বীকার্য।

সংস্কৃত তৎসম শব্দের প্রয়োগ গোবিন্দদাস বিশেষ করে অনুসরণ করলেও গ্রাম্য কথ্য শব্দকেও কবি যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। কেননা সমকালীন শব্দ প্রয়োগে জনপ্রিয়তা অর্জন করা তুলনায় সহজ। কবি এক্ষেত্রে 'ঞ' ও 'ঙ' বর্ণ বিশিষ্ট শব্দই বেশি এনেছেন। যথা—সোঙরি, আউ লাঞা (৩৯), সঞে (৫৪২), ঘনাঞা (৪৩৩), ঘেরিঞা, হেরিঞা (৫৫২), মোছাঞা (৫৯৭), রচিঞা বেঢ়িঞা (৫৫২), সঙরি (২৫৪), তেঞি (৫৯৫), মুঞি, পাঞা, খাঞা (৬৯২ প্রভৃতি। এই ধরণের শব্দ প্রয়োগে ভাষা লোকায়ত ভাষার কাছাকাছি চলে আসে।

লোকাভিজ্ঞতার ফসল স্বরূপ কবি তাঁর পদে, বিভিন্ন ভাবকে জোর দিতে বক্তব্য জোরালো যুক্তিপূর্ণ করতে, ব্যবহার করেছেন মৌলিক প্রবাদ বা প্রবচন। যথা —

'ছুটল বাণ ফুটল হিয়ে মোরি' (২৫৮ সংখ্যক) এখানে কৃষ্ণের পূর্বরাগের ব্যাকুল ও তীব্র হৃদয়াকাঙ্ক্ষাকে উপরোক্ত প্রবচনের সাহায্যে তীব্র করা হয়েছে। রাধা-অনুরাগের বাণ কৃষ্ণকে হৃদয়ে বিদ্ধ করেছে।

রাধার কুটিল ও মনোহরকারী কটাক্ষে কৃষ্ণ অভিভূত বিচলিত হয়ে আত্মসমর্পণ করছেন যে, 'মন বাঁধল বিনু দামা' অর্থাৎ বিনা রজ্জুতে মন বাঁধা পড়ল।

রাধার রসোল্লাসকে একটি প্রবাদের সাহায্যে সখি রসোদ্বারের এই পদে ব্যক্ত করেছেন— 'গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই' (৫৮৪ নং পদ) অর্থাৎ আঁচলে ওই সোনা বাঁধা থাকলে তার প্রকাশ মুখে ফুটে ওঠে পরিতৃপ্ত হাসির মাধ্যমে তেমনি কৃষ্ণকে (সোনা) পেয়ে রাধার চোখে মুখে উল্লাস-আনন্দ ফুটে উঠেছে। বিরহ দিব্যোন্মাদ রাধা তাঁর প্রেম-গভীরতায় নিজেই প্রমোদে বা বিপদে পড়েছে। পিরীতি যত বেশি ততই বিপদও বেশি —

'যতএ পিরিতি ততএ পরমাদ' (৬৫ নং পদ)

রাসনৃত্যের এই পদটিতে কবি নৃত্যকে চক্ষুষ্মান করেছেন ছন্দনিনাদে 'কিং কিং কিঙ্কিনি কিং কিং মন্দিরা', নৃত্য ছন্দে 'তা থৈ থৈ, তাধিক তাধিক, থৈ থৈ' নুপূর নিক্কনে 'ঝুমুকু ঝুমুকু, ঝুমদি ঝনাঝনা' (৫৬৪ নং পদ)।

ছন্দ : গোবিন্দদাস কবিরাজ

চৈতন্য-উত্তর বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তাদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত তাঁর জীবৎকালে তিনি অসংখ্য বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার 'গোবিন্দদাসের পদাবলী তাঁহার যুগ' (১৯৬১) গ্রন্থে গোবিন্দদাস কবিরাজ ভনিতায় ৭৮২টি পদ সংকলন করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব অনুসরণ করে তথা এই বিশিষ্ট ধর্মাচার ও তার আচরণ ও ব্যাখ্যায় দীক্ষিত হয়ে তবেই তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয় লীলার বাণীরূপ এঁকেছেন, এবং এঁকেছেন নিষ্ঠাবান ভক্ত বৈষ্ণব হয়ে, বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিতে। একদিকে বৈষ্ণব ধর্মসাধনা, অন্যদিকে নিরাসক্ত শিল্পী হিসাবে গৌরাঙ্গ প্রবর্তিত ধর্মাচারের রূপচিত্রাঙ্কন—এই অসাধ্য সাধন করেছেন কবিরাজ গোবিন্দাদাস। ধর্মাচারের মতই তাঁর নৈতিক নিষ্ঠা লক্ষিত হয় পদ রচনায়। এক্ষেত্রে তিনি চণ্ডীদাসের মতন বা অংশত জ্ঞানদাসের মত আত্মবিলোপী বা আত্মতথ্যয় নন, তিনি সর্বাংশে সচেতন শিল্পী। কাব্য ও কবির মধ্যে এক শৈল্পিক দূরত্ব তিনি বজায় রেখেছেন। নিজের পদ সম্পর্কে কবি ইঙ্গিত ও করেছেন—

'রসনা রোচন। রসিক রসায়ণ। রচতি গোবিন্দদাস।' (১১৬ সংখ্যক, বি.ম. পৃ. ৫৯) অর্থাৎ রসিকদের আনন্দ জনক ও জিহ্বার (শুনতে) রুচিকর গীত রচনা করেছেন গোবিন্দদাস। অন্যত্র বলেছেন—'রসনা রোচন। শ্রবণ বিলাস। রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস। ''(১৪৫, ওই পৃ.৭৭) গোবিন্দদাস পদ রচনা করেছেন যা জিহ্বার রুচিকর, কর্ণের আনন্দকারী ও সুন্দর। ১৬৮ সংখ্যক পদে 'গোবিন্দদাস ভণ রসিক রসায়ণ।'' (পৃ. ৮৯), কবির নিজ কাব্য সম্পর্কিত এ রকম উক্তি থেকেই তাঁর কবিভাষা সম্পর্কেও কিছুটা ইঙ্গিত ফুটে ওঠে। বর্তমান আলোচনায় তাঁর ব্যবহৃত ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভাষা মুখ্যত ব্রজবুলি। এছাড়া সামান্য কিছু পদ তিনি বাংলা ভাষায় রচনা করেছেন। ব্রজবুলি পদগুলিতে বিদ্যাপতির আদর্শে মূলত অনুসৃত হয়েছে প্রাচীন কলাবৃত্ত ছন্দরীতি। এক্ষেত্রে প্রাচীন কলাবৃত্তের মত লঘু গুরু উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়, আর বাংলা পদগুলিতে অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্তের ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে কলাবৃত্তের বিভিন্ন গঠনের ব্যবহার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

কলাবৃত্তের একপদী বন্ধে হ্রস্বতম মাত্রা ব্যবহারের পরিচয় পাই এগারো মাত্রার পদগুলিতে ঃ

রাইক। আগমন। বাত। ৪।৪।৩।
শুনইতে। উলসত। গাত।।
তাহে কহই নব - কাম।
নাগ - দমন মঝু। নাম।। (ওই, ৩৩১ সংখ্যক পদ)

এখানে পর্ববিভাগ চার - চার - তিন (৪।৪।৩।) এই মাত্রানুযায়ী। এগারো মাত্রার এই একপদীকে একধরণের একাবলী বলা যায়। গোবিন্দদাসের পদাবলীতে এর বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

অনেক সময়, শেষ পর্বের অপূর্ণ অংশটিকে পূর্ণপর্বের মর্যাদা দান করে একপদী বন্ধে বারো মাত্রার আরোপ করা হয়েছে। যথা —

খল সঞে। পিরিতিক। সাধে ৪।৪।৪।
খোয়ল। কুল মরিঃ য়াদে।।
খেনে খেনে। তুয় গুণ। গায়ে।
খপুর কঃপুর নাহি। ভায়ে।। (১২০ নং পদ)

এখানে শেষ পর্বে দীর্ঘ উচ্চারণে চার মাত্রা ধরে পর্ববিভাগ হয়েছে চার - চার - চার (৪।৪।৪।) মাত্রানুযায়ী।

বারো মাত্রার একপদী বন্ধের মধ্যে মাত্রাবিভাগ ও পর্ববিভাগে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

সবহু আপন। ভবনে গেল। ৬।৬।
সুবদনি - চিতে। চমক ভেল।।
নাসা পরশি। রহল ধন্দ।
ইষত হাসয়ে। বয়ন - চন্দ।। (৪৫১ নং পদ)

এখানে পর্ববিভাগে ছয় - ছয় (৬।৬।) মাত্রানুযায়ী।

২৮৯ সংখ্যক পদটিতে কলাবৃত্তের ছয় - ছয় (৬।৬।) মাত্রাভাগ ও দলবৃত্তের পাঁচ - পাঁচ (৫।৫।) দল বিভাগে অদ্ভুত এক শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টি হয়েছে। যথা —

৬।৬। (কলা) > কদম্ব মূল। মণ্ডপেহরি। নবীন নারী। সঙ্গেতে করি।। < ৫।৫। (দল)
সুরম্য নর্ম্ম। নির্জন বনে। বিরাজিত ব্রজাঙ্গনা সনে।।
শ্রীনন্দ - রাজ। নন্দন রমে। বৃষভানু - রাজ। নন্দিনী বামে।।

গোবিন্দদাস যে কত ছন্দ সচেতন কবি ছিলেন এবং ছন্দের অনুশীলন করতেন তা উপরোক্ত নিদর্শন থেকে বোঝা যায়। যদিও, পদটির সর্বত্র তিনি সমতা রাখতে পারেন নি। যেমন—'সুরম্য নর্ম্ম'কে কলামাত্রায় সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ছয় মাত্রা না ধরলে সমতা থাকে না। তেমনি 'নীলরাগ - অম্বরধরা' 'ঘুক্ষত ভুঙ্গঁ মাধুরী পিয়ে', 'নবীন নীরদ যেন বিধু', 'গোবিন্দদাস পিবই মধু' প্রভৃতি অংশে কখনো বিশ্লিষ্ট কখনো সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ গ্রহণ করে মাত্রাসাম্য রাখতে হয়।

কলাবৃত্তের দ্বিপদীবন্ধের নিদর্শনগুলির মধ্যে আট - আট - আট (৮।।৮।) বিভাগ লক্ষণীয়-

মন্দির। বাহির।। কঠিন ক। বাট। ৪।৪।।৪।৪।
চলইতে। শঙ্কিল।। পঙ্কিল। বাট।। ৮।।৮।
তঁহি অতি। দুরতর।। বাদর দোল।
বারিকি। বারই।। নীল নি। চোল।।

আট মাত্রার এই কলাবৃত্ত দ্বিপদীতে চার - চার - চার - চার (৪।৪।।৪।৪।) পর্ববিভাগে মোট ষোলমাত্রা ব্যবহৃত। এখানে গোবিন্দদাস অবশ্য প্রাচীন 'পাদাকুলক' ছন্দেরই অনুসরণ করেছেন।

কলাবৃত্ত দ্বিপদীর আর একটি বিভাগ গোবিন্দদাস ব্যবহার করেছেন তাঁর পদাবলীতে —

কুঞ্জর - বর। গামিনী রাই।। কুঞ্জর - বর। গামিনী।
প্রেমতরঙ্গে। ভরল অঙ্গ।। সঙ্গে বরজ। রমণী।।
গগন মণ্ডল। অতি নিরবল।। শারদ সুখদ। যামিনী।
নীল বসন। হটক বরণ। ঝটকত ঘন। দামিনী।। (৭০৮ নং পদ)

এখানে পর্বভাগ ছয় - ছয় - ছয় - চার (৬।৬।।৬।৪।) মাত্রাবিভাগে। পদভাগ বারো - দশ (১২।।১০।) বিভাগে। 'গগন মণ্ডল' অংশকে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ৬ মাত্রা করা প্রয়োজন। দ্বিপদীর দীর্ঘ বন্ধের ও ব্যবহার করেছেন কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ। যথা —

বহুল - বারিদ। বরণ বন্ধুর।। ৭।৭।।
বিজুরি - বিলসিত। বাস। ৭।৩।
বিকচ বান্ধুলি বলিত বারিজ
বদন - বিম্ব পরকাশ।। (পদ সংখ্যা ১৩৯)

এখানে সাতমাত্রা পর্ববিভাগের ছন্দ লক্ষিত হয় - সাত - সাত - সাত - তিন (৭।৭।।৭৩।) বা চোদ্দ - দশ (১৪।।১০।) মাত্রার পদবিভাগ। তবে দ্বিতীয় পংক্তির 'বদন - বিম্ব'কে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে পাঁচমাত্রা ধরতে হবে। এই শব্দটির পরবর্তী পংক্তিটি আবার আট - আট (৮।।৮।) বিভাগে। যথা —

বিহরিত বৃন্দাঃবনে বন মালি। ৮।।৮।

আবার পরবর্তী পংক্তি থেকে ১৪।। ১৩। পদবিভাগ অনুমৃত। 'ব' এর ধ্বনি অনুপ্রাস-এ ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি করেছে।

অতি পর্বের ব্যবহার করে দীর্ঘ দ্বিপদী বন্ধে বৈচিত্র্য এনেছেন কবি। এবং দু মাত্রার এই অতিপর্ব বিশেষ তরঙ্গ দোলারও সৃষ্টি করেছে —

ভাণু - নন্দিনি। নন্দ - নন্দন।। রতন মন্দির। মাহ রে। (৭।৭।।৭।৩।২)
কেলি কুণ্ডক। তীর শোভিত।। কল্পতরু - দ্রুম। ছাহ রে।।
নীপ তরুবর পলব কুল - ভরে পরশি রহু সব নীর রে।
ফুল্ল মালতি কমল - মাধুরি বহই মন্দ সমীর রে।। (৪০০ নং পদ)

এখানে পর্ববিভাগ সাত মাত্রায়—সাত - সাত - সাত - তিন - দুই (৭।৭।।৭।৩।২।) এবং পদবিভাগ চোদ্দ - দশ - দুই (১৪।। ১০। ২।) । এখানেও ধ্বনি-অনুপ্রাস ছন্দটিতে মাধুর্যের মাত্রাযোগ করেছে। 'রে' অতিপর্বের টানে সুরের একটা আবেশ পদটিকে গৌরবিত করেছে।

কলাবৃত্তের ত্রিপদী বন্ধের নিদর্শনও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। যথা —

ভাণু - কিরণ যছু।। অঙ্গ না। পরশই।। ৮।।৮।।
অঙ্গন। বাহির ন। যাতি। ৮।৪।
সো আজ। যামিনী। কুঞ্জে একাকিনী।।
তিমিরে পোহায়ল রাতি।। (ওই, ৪২৯ নং পদ)

দীর্ঘ ত্রিপদীর এই বন্ধটিতে পর্ববিভাগ—চার - চার - চার - চার - চার - চার - চার। অর্থাৎ, ৪।৪।।৪।৪।।৪।৪।৪। । পদবিভাগ আট - আট - বারো (৮।।৮।।১২।)। ত্রিপদীর মধ্যে দ্বিপদীর বন্ধও উঁকি মেরেছে। যথা —

মাধব কোন ক।। রব তোহে রোখ। ৮।।৮। (ওই)

পরবর্তী সময়ে আবার ৮।৮।১২। মাত্রার ত্রিপদী বন্ধ অনুসৃত হয়েছে। ত্রিপদীর অতি দীর্ঘ রূপও গোবিন্দদাস তাঁর পদাবলীতে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন। যথা —

চীত চোর। গৌর অঙ্গ।। রঙ্গে ফিরত। ভকত সঙ্গ।।
মদন মোহন। - ছন্দুয়া।
হেম - বরণ। - হরণ দেহ।। পুরল তরণ। করুণ মেহ।।
তপত - জগত বন্ধুয়া।।

অর্থাৎ, পর্ববিভাগ (১৫ নং পদ) — ৬।৬।।৬।৬।।৬।৪। বা, বারো - বারো - দশ (১২।।১২।।১০।) মাত্রানুযায়ী পদবিভাগ।

দ্বিপদীর মত ত্রিপদীতেও ধুয়া ব্যবহার করে অতিপর্ব দোলার সৃষ্টি লক্ষণীয়। যথা —

দুহুঁ মুখ। দরশনে।। দুহুঁকো বি। লোকনে।। ৪।৪।।৪।৪।।
আনন্দ । নীর নি। ঝাঁপই। রে। (৪।৪।৪।২)
আরতিয়ে। পরাশিতে।। কুচ - কন । কাচল।।
গিরিবর - ধর - কর কাঁপই রে।। (২৮৬ নং)

এখানে পর্বমাত্রিবিভাগ হচ্ছে—চার - চার - চার - চার - চার - চার - চার বা ৪।৪।।৪।৪।।৪।৪।৪।২)। পদবিভাগ আট - আট - বারো - দুই (৮।।৮।।১২।২)। দু-মাত্রার অতিপর্বের তরঙ্গ ছন্দে সুর প্রয়োগ করেছে। এই পদটির প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি দ্বিপদীবন্ধে যথাক্রমে ৭।।৭। ও ৮।।৬। পদভাগে রচিত হয়েছে।

কলাবৃত্তের চৌপদীবন্ধেরও অনেক প্রয়োগ তাঁর পদে লক্ষ্য করা যায়। যথা —

জয় নিজ। কান্তা।। কান্তি কলেবর।। ৮।।৮।।
জয় জয় । প্রেয়সী।। ভাব-বিনোদ। ৮।।৮।

জয় ব্রজ সহচরী লোচন - মঙ্গল
জয় নদিয়া - বধু নয়ন - আমোদ।। (৪২ নং পদ)

এখানে পর্বভাগ ৪।৪।।৪।৪।৪।৪।৪। বন্ধ পদবিভাগে দাঁড়ায়---আট - আট - আট - আট (৮।।৮।।৮।।৮।)।

দীর্ঘ চৌপদীবন্ধের আর একটি কৌশল হল এই রকম

বিপিনে মিলল। গোপ - নারি।। ৬।৬।।> ১২।।
হেরিহসত। মুরলিধারি।। ৬।৬।।> ১২।।
নিরখি বয়ন। গুছত বাত।। ৬।৬।।> ১২।।
প্রেম সিন্ধু। গাহনি। ৬।৪।> ১০।
পুছত সবক।। গমন - খেম।।
কহত কীয়ে।। করব প্রেম।।
ব্রজক সবহুঁ।। কুশল বাত।।
কাহে কুটিল।। চাহনি।। (৫৫৬ সং)

এখানে পদবিভাগ ১২।। ১২।। ১২।। ১০। এইভাবে।

চৌপদীবন্ধের ক্ষেত্রেও গানের ধুয়ার সাথে ২ মাত্রার অতিপর্ব কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে। যথা —

('ঞ' পদটিতে বহুশব্দে যুক্ত—শুনিঞা ঘেরিঞা, হেরিঞা)

শুনিঞা মধুর। মুরলীতান।। ৬।৬।।> ১২।।
সহিল নহিল। রসের প্রাণ ।। ৬।৬।।> ১২।।
অন্তরে ভেদল। মদন - বাণ।। ৬।৬।।> ১২।।
চলল নিকুঞ্জ। মাঝেরে। ৬।৩।২)> ৯।২)
অঙ্গে পরিহল। জলদ বাস।।
বিধির অবধি। লাস বিলাস।।
মধুর মধুর। কোমল হাস।।
কঙ্কন কিঙ্কিনী বাজে রে।। (৫৫২ নং)

পদটির সবকটি পংক্তিতে ধুয়া ব্যবহৃত না হলেও সেক্ষেত্রে মাত্রার হেরফের ঘটেনি। উধৃতাংশের অন্তর্গত 'অন্তরে' 'নিকুঞ্জ' 'অঙ্গে', 'কঙ্কন', কিঙ্কিনী', প্রভৃতি যুক্ত বর্ণের শব্দের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ হেতু একমাত্রার হ্রাস করে মাত্রা গণনা করা হয়েছে।

গোবিন্দদাস ছন্দের নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন অনেক পদে যথা —

কালি দ। মন দিন। মাহ ৪।৪।৩।
কালিন্দি। কুল ক। দম্বক। ছাহ।। ৪।৪।৪।৩।
কত শত ব্রজ নব - বালা।
পেখলুঁ জনু থির বিজুরিক মালা।। (২২২ নং)

এখানে পংক্তিটি একাবলী ছন্দে এবং দ্বিতীয় পংক্তি একপদী ছন্দে। পর্বমাত্রা বিভাগ যথাক্রমে ৪।৪।৩। ও ৪।৪।৪।৩, অর্থাৎ দ্বিতীয় পংক্তিতে একটি পর্বভাগ বেশি।

এই রকমই বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় ৩৩৪ সংখ্যক পদে। তবে এখানে পর্বমাত্রা বিভাগ

যথাক্রমে ৬।৩।ও ৬।৬।৬।৩। যথা —

সই) বড়ই লাগল। ধন্দ ২) ৬।৩।
ইন্দু কুমুদ। মেহ বিজুরি। ৬।৬।
চকোর ভ্রমর। বন্ধ।। ৬।৩।
সই) দেখিতে লাগয়ে সাধ।
ভানু তিমির গড়ুড় সাপিনী
নীলবরণে চাঁদ।।

এখানে পংক্তির প্রথমেস্থিত ২ মাত্রার অতি পর্ব হেতু ছন্দে তরঙ্গ দোলার সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিপদীর সঙ্গে চৌপদীর মিশ্রণে ও গোবিন্দদাস ছন্দবন্ধে বৈচিত্র্য এনেছেন।

যথা — যত যত। রস পদ।। করলহি। বন্ধে ৮।।৮।
কোটি হুঁ। কোটি শ্রবণ যব। পাইয়ে।। ৮।।৮।।
শুনইতে। আনন্দে।। লাগয়ে ধন্দে।। ৮।।৮।
সো রস। শুনি নাগর বর। নারি।
কিয়ে কিয়ে। করিয়া। চতি চম। কাওই।।
ঐছন। রসময়।। চম্পু বি।থারি (৪৬ সং)

গোবিন্দদাস বাংলা ভাষায় বেশি পদ রচনা করেননি। তবে যে পদগুলিতে বাংলাভাষা অনুসৃত তা অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্তে রচিত। এখন সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথম মিশ্রবৃত্ত পয়ার বন্ধের নিদর্শন দেওয়া হল যথা —

হোরি কি দেখি গো বড়াই।। কদম্বের তলে। ৮।।৬।
তড়িত জড়িত যৈছে।। নব জল ধরে।।
শ্যাম চান্দের উপরে ধবল চান্দের কলা।
তাহার উপরে শোভে তিমিরের মালা।। (২১৩ সং)

মিশ্রবৃত্তে রচিত ত্রিপদীবন্ধের ও পদ গোবিন্দদাসে পাই। যথা —

ভালে সে চন্দন চাঁন্দ।। কামিনী মোহন ফাঁদ।। ৮।।৮
আন্ধারেতে করিয়াছে। আলা। ১০।
মেঘের উপর কিবা।। সদাই উদয় করে।।
নিশি দিশি শশী ষোল কলা।। (২১২ সং)

এখানে পর্বভাগ হয়েছে ৮।।৮।। ১০। এই যতিপাতে।

মিশ্রবৃত্তে রচিত লঘু ত্রিপদীবন্ধেরও নিদর্শন গোবিন্দদাস-এ রয়েছে। যথা —
(৬।।৬।।৮।)

ঢর ঢর কাঁচা।। অঙ্গের লাবনি।।
অবনি বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ হিলোলে
মদন মুরুছা পায়।। (২১০ সং)

অতিপর্বকে পদ মাত্রায় অন্তর্গত করে নিম্নলিখিত ত্রিপদীটিতে গোবিন্দাদাসের ছন্দ চেতনার পরিচয় স্পষ্ট। যথা —

চাঁদর চিকুর চুড়ে।। গিরিপুচ্ছ উড়ে গো।। ৮।। ৮
পদে দোলে বনফুলের মালা। ১০।
বিম্বাধরে বংশী কত তানে গায় গো। ৬।। ৮।।
চরণে নূপুর করে আলা।। ১০।

এখানে দ্বিতীয় পংক্তিতে প্রথম পদে 'ছ' মাত্রা লক্ষিত হয় সম্ভবত 'বিম্বাধারে' ও 'বংশী' শব্দে বিশ্লিষ্ট দীর্ঘ উচ্চারণ ধরা প্রয়োজন।

গোবিন্দদাসের রচনায় ছড়ায় ছন্দ বা দলবৃত্তের পরিচয় যে একেবারেই নেই তা নয়। তবে দলবৃত্তে রচিত তাঁর পদ নামমাত্র। প্রথমে একপদী দলবৃত্ত —

বৃন্দাদেবী। সময় জাঃনিয়া। ৪।৪।২।
গোপীগণে। কহে সম্বো। ধিয়া।।
হোর দেখ নিশি বহি গেল।
এবং, দশ দিশ অরুণিত ভেল।। (৫৮০ সং)
কি হেরিলাম। কদম্বের । তলে। ৪।৪।২।
বাম পাশে। দাঁড়ায়েছে। হেলে। ৪।৪।২।
উহার) গলে দোলে বনফুলের মালা। ২) ৪।৪।২।
পুঞ্জে পুঞ্জে তঁহি। অলি করে খেলা।। (২১৭) ৬।৪।২।

এখানে ৪।৪।২। ছন্দে শুরু হলেও পুরে দু-মাত্রার অতিপর্ব যুক্ত হয়ে ছন্দকে নতুনত্ব দান করেছে। শেষ পংক্তির প্রথম পর্বটি দু-মাত্রাতে।

কোন কোন পদে দলবৃত্তের সঙ্গে কলাবৃত্তের মিশ্রণ ঘটে গেছে। যথা —

দলবৃত্ত পয়ার চিকন কালা। গলায় মালা।। বাজন নূপুর। পায়।
চূড়ার ফুলে। ভ্রমরবুলে।। তেরছ নয়ানে। চায়।।
৪।৪।। ৪।২। বা ৮।। ৬।

ও,

কালিন্দীর কুলে। কি পেখলুঁ সই। ছলিয়া নাগর। কান। কলাবৃত্ত
ঘর মু যাইতে। নারিলুঁ সই। আকুল করিল। প্রাণ।। (১৭৩ সং) ৬।৬।৬।২

এছাড়া অন্যান্য ছন্দোবন্ধের পদও গোবিন্দ দাসে আছে। যথা —

নন্দ নন্দন। চন্দ চন্দন। গন্ধ নিন্দিত। অঙ্গ। ৩ঃ ৪।৩ঃ ৪।।
জলদ সুন্দর। কম্বু কন্ধর। নিন্দি সিন্ধুর। ভঙ্গ।। ৩ঃ ৪।৩ ।
প্রেম আকুল। গোপ গোকুল। কুলজঃ কামিনি। কন্ত।
কুসুম রঞ্জন। মঞ্জু বঞ্জুল। কুঞ্জ মন্দির। সণ্ড।। (১৬১ সং)

এই ছন্দকে চর্চরী (১০) ছন্দ ও বলা হয়। সাত মাত্রার মাত্রাবৃত্ত রীতিতেও একে পাঠ করা যায়। এছাড়া গোবিন্দদাস নরেন্দ্রবৃত্ত ছন্দেও পদ রচনা করেছেন। এর ছন্দ বিভাগ ৭।।৯।।৮।।৪। ২)। এইভাবে এখানে অনুসৃত। যথা —

চম্পক সোন।। কুসুম কনকাচল।। ৭।। ৯।।
জিতল গৌর - তনু।। লাবনি। রে ৮।। ৪।২)।

উন্নত গীম।। সীম নাহি অনুভব।।
জগজন মোহন।। ভঙনি। রে।।[১৪] (৩ নং)

এখানে মাত্রাভাগ ৭।। ৯।। ৮।। ৪। ২)। এই চৌপদীবন্ধে। শেষে দু-মাত্রার সুরের রেশ হেতু অতিপর্ব - দোলা এই ছন্দে নতুনত্ব এনেছে।

অলংকার : গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাসের কবিভাষার আর একটি মুখ্য উপাদান তাঁর অলংকার নির্মাণ ক্ষমতা। সাধক-ভক্ত কবি হলেও অলংকার ব্যবহারের সময় তিনি ভীষণভাবে নিরাসক্ত থেকেছেন। বিচিত্র অনুপ্রাস ধ্বনিময় ভাষা ও অলংকার ব্যবহারে তিনি মধ্যযুগে দ্বিতীয় রহিত। এখানে অলংকারের-ব্যবহার ভিত্তিতে তাঁর অলঙ্কারিক মনের পরিচয় বিশ্লেষণ করা হবে। প্রথমে শ্রুতি তথা শব্দালঙ্কারের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।

কুবলয় - কন্দল - কুসুম কলেবর
কালিম - কান্তি - কলোল
কোমল - কেলি - কদম্ব - করম্বিত
কুন্ডল - কান্ত - কপোল।। (১১৭)

এখানে 'ক' বর্ণের সাহায্যে প্রত্যেকটি শব্দ শুরু হয়েছে কমলাপতি কৃষ্ণের কালো রূপাঙ্কনে গোবিন্দদাস চাতুর্য-নিমিত্ত 'ক' বর্ণের আদ্যানুপ্রাস ব্যবহার করেছেন। ক এর সাথে কোমল ধ্বনি 'ল'-এর ধ্বনি-অনুপ্রাস মিলেমিশে ছন্দোধ্বনিতেও কোমলতা এনেছে। সমস্ত পদটিতেই এইভাব স্পষ্ট।

নটরাজ কৃষ্ণের নব নব প্রেমান্বেষণ, তাঁর নারী-কুল-নাশিনী বাঁশির গৃহত্যাগী সুর তার মতোই নৃত্য চঞ্চল। এই চরিত্রাভাসকে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন 'ন' এর অনুপ্রাসে। যথা —

নাচত নন্দ - নন্দন নটরাজ।।
নাগরি - নারি -নগরি নব - নাগরি
নিরুপম নটিনি সমাজ। (১৩৫ সং)

রাধার অভিসারিকা মূর্তিকে গোবিন্দদাস নিম্নোক্ত পদটিতে প্রাণ চাঞ্চল্য দান করেছেন ধ্বনি অনুপ্রাসের প্রয়োগে। রাধার সচলতাকে কবি অলংকার কৃর্তিতে আরও রূপময় করেছেন। ল, ক্ক, র প্রভৃতি মুক্ত ও যুক্ত ব্যঞ্জনের সার্থক প্রোজযনা এখানে লক্ষিত হয় —

সকল অলক্তি কঙ্কন ঝঙ্কৃতি
কিঙ্কিনি রণরণি বোল।। (১৭৭ সং)

আবার অলংকার চাতুর্যের পরিচয় দিতে গিয়ে গোবিন্দদাস কখনো কখনো ভাবের পরিবেশকে আহত করেছেন। রাধাবিরহের নিম্নোক্ত পদটিতে অনুপ্রাস বাহুল্য হেতু পারিপার্শ্বিকতা বিনষ্ট হয়েছে। যথা —

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল
বৃন্দাবন বন - দাব।
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন
মারুত মারত ধাব।। (৬৫৯ সং)

এখানে ঞ্জ, ক, ব, ন, ন্দ, ম প্রভৃতি বর্ণ, যুক্তবর্ণগুলি অনুপ্রাস ধ্বনিতে বিরহের শোকাকুল প্রেক্ষাপটটি বিড়ম্বিত হয়েছে।

১৬৮ সংখ্যক পদটিতে বৃত্তানুপ্রাসের ব্যবহার লক্ষণীয়। যথা —

তনু ঘন - গঞ্জন জনু দলিতাঞ্জন।
কঞ্জ নয়ানি - নয়ন - ললিতাঞ্জন।।

তনু, জনু, গঞ্জন, অঞ্জন, নয়ানি, নয়ন প্রভৃতিতে বর্ণের ক্রম ও ধ্বনি সাদৃশ্য হেতু এই অলংকার সৃষ্টি হয়েছে।

অনেক স্থলে অযুক্ত ব্যঞ্জনগুচ্ছ ক্রমানুসারে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে বৃত্ত্যনুপ্রাসের শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টি করেছে। যথা —

এতহুঁ যতনে পুরুষ - রতনে
চিতে নাহি বিশোয়াস। (২৩৬ সং)

গোবিন্দদাসের অধিকাংশ পদেই অনুপ্রাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। শব্দের অর্থ নির্ভর অলংকার তথা অর্থালঙ্কারের ব্যবহারেও গোবিন্দদাস যথেষ্ট মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন।

প্রথমে উপমা অলংকার —

কৃষ্ণ ও রাধার রূপের তুলনায় কবি এনেছেন নীলকান্তমণি ও কাঞ্চনের উপমা। যথা —

রাই - কানু আলিঙ্গন নীলমণি - কাঞ্চন
হেরইতে লোচন ভোর। (৩১১ সং)

তবে উপমাটি প্রাণ পেয়েছে কবি যখন নীলকান্তমণির সঙ্গে কাঞ্চনকে একসূত্রে গেঁথেছেন কৃষ্ণ ও রাধার আলিঙ্গনের দৃশ্যপটে।

কৃষ্ণের সুরতাসক্তির উপমায় কবি ব্যবহার করেছেন চকোরের লুব্ধতা। এতে তাঁর চরিত্রটি স্পষ্টতা পেয়েছে। যথা —

চুম্বন বেরি। জনি মুখ মোড়বি। জনু বিধু - লুবধ চকোর। (৫৮৭ সংখ্যক)

উপমার মালা সাজিয়ে গোবিন্দদাস নিম্নোক্ত পদে রাধাকৃষ্ণের মিলনচিত্রকে অনন্যতা দান করেছেন। যথা —

তনু তনু মীলনে উপজল প্রেম। মরকত যৈছে জড়ায়েল হেম।।
কনক লতাবলি তরুণ তমাল। নব - জলধরে জনু বিজুরি রসাল।।
কমলে মধুপ যেন পাতল সঙ্গ। দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম - তরঙ্গ।।
মাতল মধুপ জনু করলহি পান। গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান।। (২৯৪ সংখ্যক)

এখানে মরকত বর্ণময় কৃষ্ণ হেমাঙ্গী রাধাকে বেষ্টন করেছেন। এই দৃশ্য কনকলতা বেষ্টিত তমাল কৃষ্ণ, নবমেঘ গাত্রস্থ বিদ্যুৎ, পদ্মে আসীন মধুপ, প্রভৃতির সঙ্গে তুলনীয়। তাই অলঙ্কার মালোপমা।

রূপক সৃষ্টিতেও কবি প্রথাগত ব্যবহারের মধ্যেও আপন চাতুর্যের পরিচয় রেখেছেন। মান পর্যায়ের এই পদটিতে কবি অভিমানকে সাপের রূপকে ব্যবহার করেছেন। রাধার বুকে স্থান পেয়েছে মানরূপ সর্প। যার দংশনে তিনি অস্থির। যথা —

হৃদয়ে ধরল তুহুঁ মান -ভুজঙ্গ।। (৫১০ সংখ্যক)

রূপকের মধ্যদিয়েও যে কেমন কূটকৌশলী রচনার ব্যবহার যায় গোবিন্দদাস তা দেখিয়েছেন। যথা—

মনমথ - মকর ডরহিঁ ডর - কাতর

মঝু মানস - ঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয় হার - তটিনি তট কুচ - ঘট
উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ।। (৩২১ সংখ্যক)

কৃষ্ণ বলেছেন রাধাকে যে, তাঁর চিত্তরূপ মৎস্য মন্মথ - বাহন মকরের ভয়ে কাঁপছিল। সেই অবস্থায় তা জীবন-রক্ষা নিমিত্ত ঝাঁপ দিল রাধার বক্ষস্থিত হার-রূপ নদীর তীরে রক্ষিত কুচরূপ ঘটে। রূপকের আবরণে এখানে আপাত দৃষ্টিকটু বিষয়টিকে কবি উত্তীর্ণ করেছেন কাব্যে।

বিরহ ভাবনাকুল রাধা নিম্নোক্ত পদে রূপকাবরণে তাঁর মনজ্বালার ভাষান্তর করেছেন। হৃদয় রূপ রস - কারাগারে তিনি পিরিতি রূপ কপাটে, মনরূপ শিকল দিয়ে, প্রেম রূপ তালা দ্বারা তাঁকে বন্ধ করে (কৃষ্ণকে) রাখবেন। যথা —

রস - কারাগার তেজি কাছে যাওব
চলইতে ইথে নাহি বাট।
মনহি শিকলি তাহে প্রেম কুলুপগো
লাগিয়াছে পিরিতি কবাট।। (৬২১ সংখ্যক)

এখানে বাউল লোকাভিজ্ঞতার নিম্নোক্ত পংক্তিটি স্মরণীয় - খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কেমনে আসে যায়। ধরতে পারলে মন বেড়ি দিতেম তাহার পায়।

রাধাকে প্রসন্ন করার জন্য অবশেষে কৃষ্ণ তাঁর পদস্পর্শ করার জন্য হাত বাড়ালেন। রাধা তৎক্ষণাৎ এই অনুচিত কার্যে বাধা দিতে হাত প্রতিহত করলেন। ফলে পরস্পরের করস্পর্শ ঘটল। এবং অন্তরে প্রেম সঞ্চার হল। কৃষ্ণের ক্ষেত্রে অকস্মাৎ এই প্রেমপ্রাপ্তিকে কবি দরিদ্রের সহসা স্বর্ণ প্রাপ্তির মতোই মনে করেছেন। এই ঘটনাকে কবি অতিশয়োক্তির সাহায্যে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। যথা —

করে কর করিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম।। (২৮৫ সংখ্যক)

রতি অবসানের পর কৃষ্ণের বিস্তৃত বক্ষে শায়িতা ক্লান্ত রাধা। কবির চোখে এই দৃশ্যটি মরকত নির্মিত মদনকে চম্পকমালা দ্বারা বেষ্টিত পূজা ক্রিয়া বলে মনে হয়েছে। অতিশয়োক্তির সাহায্যে এখানে কৃষ্ণ রাধাকে উপমেয়ত্ব গ্রাস করা হয়েছে। যথা —

মরকত মদনে কোই জনু পুজল
দেই নব চম্পকমালা।। (৩১৬ সংখ্যক)

বিরহক্লিষ্ট রাধার চোখের তপ্ত অশ্রু বর্ষণে যমুনার শীতল জল আগুনের চেয়েও বেশি গরম হয়ে গেছে। এখানেও অতিশয়োক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা বিরহ জ্বালাকে গ্রাস করেছে অগ্নিজ্বালা। যথা —

সোই যমুনাজল অনল অধিকভেল
কহতহি গোবিন্দদাস।। (৬৪০ সংখ্যক)

সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীতেই উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারে কবিদের বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। গোবিন্দদাস ও তার ব্যতিক্রম নন।

রাধার মুখ যে কত সুন্দর এবং তা দেখে উপমেয়ের প্রতি কেমন সংশয় জাগতে পারে এই উৎপ্রেক্ষাটির মাধ্যমে কবি চাতুর্যের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন —

কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল

ওইছন বদন সঞ্চার। (২৩১ সংখ্যক)

সোনার পদ্মফুল যেন বাতাসের ধাক্কায় উল্টে গেছে। ওই স্বর্ণপদ্ম আসলে রাধার অনিন্দ্য সুন্দর মুখ।

রাধার মুখের মতো তাঁর হাসিতেও পাঠকের মনে কবি সংশয় জাগিয়েছেন নিম্নোক্ত প্রতীয়মনোৎপ্রেক্ষার সাহায্যে —

মন্দ আধ হাসি কুন্দ পরকাশি
বিচুরি কত শত ঝলকিতে।। (১৭৯ সংখ্যক)

রাধার ঈষৎ হাসি যেন শ্বেতপদ্মের উদ্ভব ঘটিয়েছে। তা ছাড়াও তাঁর সেই আধস্ফুট হাসি যেন বিদ্যুৎ - চমক।

রাধার ঘন কৃষ্ণ কেশদামকে গাঢ় অন্ধকারের সঙ্গে তুলনার মধ্যেও উৎপ্রেক্ষার সুন্দর অভিব্যক্তি দেখা যায়।

সো ঘন চিকুর তিমির ঘন চুম্বিত
ইহ অতি অপরূপ ভাতি। (১৮২ সংখ্যক)

রাধার কেশ বিন্যাস কলা চাতুর্য এতই উৎকৃষ্ট যে তা মর্দিত কাজলকেও গঞ্জনা দেয়। অর্থাৎ দলিতা কজ্জলের রূপাপেক্ষা রাধার কেশবিন্যাস সুন্দর। এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কার —

দলিতাঞ্জন গঞ্জ কলা কবরী। (১৮৩ সংখ্যক)

কৃষ্ণের রূপ ঢল ঢল সজল মেঘের মতো। তাঁর কটাক্ষ দৃষ্টিপাতে বিদ্যুৎ পরাস্ত। শুধু তাই নয় তা কুলবতী রমনীদের লজ্জাকেও দগ্ধ করে। আমরা জানি বিদ্যুৎপাতে শরীর দগ্ধ হয় কিন্তু মনের ভাবও (এখানে লজ্জা) যে দৃষ্টিতে দগ্ধ হতে পারে তার ব্যতিরিক্ত তেজ স্বীকার্য।

ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন
মোহন অভরণ সাজ।
অরুণ - নয়ন - গতি বিজুরি - চমক জিতি
দগধল কুলবতি - লাজ।। (১৯২ সংখ্যক)

১৫৮ সংখ্যক পদটি ব্যতিরেক অলংকারেই পূর্ণ। তার সেই উৎকর্ষিত সৌন্দর্যকে অনুপ্রাসের ধ্বনিমাধুর্য বাড়তি উজ্জ্বলতা ও তরঙ্গদোলা দান করেছে। কালো কাজল আর মেঘের বর্ণকে জয় করে কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। তাঁর নুপুর পরা পদযুগল দীপ্ত অরুণ আর স্থলপদ্মের মতো রক্তবর্ণ। তাঁর হাসির ছটায় সুধারস নির্গলিত, তা চন্দ্রগর্বকেও ম্লান করে দেয়। শ্রেষ্ঠ পদ্মের সৌন্দর্য ও আকর্ষণী ক্ষমতার চেয়েও তাঁর চক্ষুদ্বয় মন্মথের ফাঁদ-তুল্য। ভ্রূর নাগপাশে কুলবতীকে বেঁধে ফেলায় ফুলদেবতা ক্রন্দনোদ্যত —

অঞ্জন - গঞ্জন জগ জন রঞ্জন
জলদ - পুঞ্জ জিনি বরণা।
অরুণারুণ থল - কমলদলারুণ
মঞ্জির - রঞ্জিত - চরণা।।
শুধই সুধারস হাস বিকশিত
চাঁদ মলিন ভেল লাজে।।
ইন্দীবর - বর - গরব বিমোচন

লোচন মনসিজ - ফান্দে।
ভাঙ - ভুজগ পাশে বান্ধল কুলবতি
কুল - দেবতি মন কান্দে।। (১৫৮)

কৃষ্ণ ও রাধার রূপবর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলছেন যে, জলধরের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বিদ্যুতের সঙ্গে রাধার প্রচলিত তুলনা চলে না। কারণ মেঘ দেহকে ভিজিয়ে দেয় আর বিদ্যুতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তেমনি মরকত মণি বা স্বর্ণ উভয়েই জড় ও কঠিন পদার্থ। কিন্তু কৃষ্ণ ও রাধা শরীর, মন ও চোখের তৃপ্তি দায়ক। এখানে ও ব্যতিরেক অলংকারের সাহায্যে উপমেয় বা প্রাকৃত বস্তুর উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে।

জলদহি জলদ বিজুরি দিঠি তাপক
মরকত কনয় কঠোর।
এ দুহুঁ তনু - মন - নয়ন - রসায়ন
নিরুপম নওল কিশোর।। (৩১৭ সংখ্যক)

চন্দ্রকরোজ্বল রাত্রিতে গৌরাঙ্গি রাধা অভিসার চলেছেন। তাঁর পরিধেয় বসন শুভ্র। অঙ্গের আভরণ ও শ্বেতবর্ণ। তাঁর দেহ যেন চন্দ্র কিরণে মিশে গেছে। তাঁর এই রূপান্তরে সাধারণ মানুষ দূরের কথা, প্রতিবেশীজনেরই ধাঁধা লেগে গেছে। মনে হচ্ছে রাঙের পুতুলকে পারদের মধ্যে ডুবিয়ে তোলা হয়েছে। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অসামান্য নৈপুণ্যে কবি রাধাকে মিলিয়েছেন। এবং অলংকার হয়েছে সামান্য —

চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি।
হরি - অভিসার - রভস রসে ভোরি।।
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই।।
হেরইতে পরিজন লোচন ভুলই।
রঙ্গপুতলি কিয়ে রস মহাপুরই।। (৩৮০ সংখ্যক)

শুক্লাভিসারের এই পদটিতেও সামান্য অলংকার সৃষ্টি হয়েছে। জ্যোৎস্নাময় রাতে রাধা শ্বেত বস্ত্রে ও শ্বেত চন্দনে অঙ্গ মন্ডিত করেছেন। তাঁর অঙ্গের ফুলের মালা-ও সাজসজ্জাও শ্বেতশুভ্রবর্ণের। মুক্তর যে মালা পরেছেন তাও শ্বেতাভ। পরিজনদের বোকা বানাতে চান তিনি এই পরিবেশ - উপলক্ষ্য সাজে —

রাকা নিশাকর কিরণ নিহারি।
যতনে পরয়ে ধনি ধবলিম সারি।।
চন্দ চন্দন লেপিত সব অঙ্গ।
সিত কুসুমাবলী হাস নব রঙ্গ।।
অব নব রঙ্গিনী করত অভিসার।
কুচযুগে সোহই মুকুতার হার।।
অভরণ সুবরণ শশিমণি সাজ। (৩৭৯ সংখ্যক)

কৃষ্ণের হাসি দেখে কবির মনে ঘোরতর সন্দেহ জেগেছে। তাঁর হাসিতে কি অমৃত ঝরে না মধু ঝরে? এই দ্বিকোটিক সংশয়ের ফল সন্দেহ অলংকার।

হাসকি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ।। (১৫৬ সংখ্যক)

যমুনা তীরস্থ কুঞ্জে কৃষ্ণ রাধার কেলিবিলাস কালে পুরুষ নারী চেনাই যাচ্ছে না। ফলে আসল বস্তু বা উপমেয়তেই সন্দেহ জাগে। যথা —

নারী পুরুষ দুহুঁ লখই না পারিয়ে
ওইছে পরিরম্ভনে ভাঁতি। (৩০৬ সংখ্যম)

অথবা কৃষ্ণ-রাধার কেলিবিলাস দেখতে ভ্রমবশত জিজ্ঞাসার সম্মুখে পড়তে হয়। কেই বা কৃষ্ণ কেই বা বিধুমণি, কেইবা ইন্দু।

হেরইতে মরমে ভরমে পরিপূরিত
কো বিধু-মণি কো ইন্দু। (৩০৬ সংস্যক)

কৃষ্ণের বিচ্ছেদ - বিরহে রাধা একান্তভাবে কাতর। তাঁর অন্তর বির্দীণ হয়ে যাচ্ছে, মনের মধ্যে বিরহানল জ্বলছে। কিন্তু রাধার শরীর তাতেও দ্বিধা বিভক্ত হচ্ছে না। তাঁর কঠিন শরীর ভস্মীভূতও হচ্ছে না।

হৃদয় বিদারত মনমথ বাণ।
কো জানে কাহে নহত দুই ঠাম।।
জলু বিরহানল মন মাহা গোই।
কঠিন শরীর ভসম নাহি হোই।। (৬২৭ সংখ্যক)

এখানে বিশেষোক্তি অলংকার হয়েছে।

রসিক চূড়ামণি কৃষ্ণ পুরনাগরীদের সঙ্গে কেলিবিলাস করেন। আর বৃন্দাবনের সহচরীরা পুতনার সঙ্গে মিলে তাঁর গুনগান করে। নিন্দার স্থলে স্তুতি করে অলংকারটিকে ব্যজস্তুতি করেছেন—

পুর নাগরি সঙে রসিক শিরোমণি
পুরহ মনমথ কেলি।
বনচরি - নারি তোহারি গুণ গাওব
পুতনিকা সঙে মেলি।। (৬৩৬ সংখ্যক)

সুনয়নী, রসবতী প্রভৃতি বিশেষিত রমণীদের ব্যাঙ্গার্থে ব্যবহার করা হয়েছে এইভাবে যে, তাদের কাছে কৃষ্ণ নব মেঘের মতো বা তাঁর স্পর্শ-রসে আনন্দ সাগরে তারা ভাসে—অথচ রাধার কাছে তিনি বিদ্যুৎ তুল্য জ্বালাময় বা স্পর্শ সাপেক্ষ অগ্নিজ্বালকের মতো। এখানে আপাত নিন্দাস্থলে প্রশংসা করা হয়েছে। তাই অলংকার ব্যজস্তুতি।

রাধার সৌন্দর্য অপরূপ। তাঁর কটাক্ষ যেন লক্ষ লক্ষ শর বর্ষণ করে। তাতেই বিনা রজ্জুতে বাঁধা পড়ে গেছে কৃষ্ণের মন। এখানে অলংকার বিভাবনা —

কুটিল কটাখ লাখ শর বরিষণে
ঘন বাঁধল বিনু দামা।। (২৫৫ সংখ্যক)

তদ্‌গুণ — অলংকারের সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নিম্নোক্ত পদটিতে —

সোনার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম।। (২৪৬ সংখ্যক)

বিরহে রাধার স্বর্ণঅঙ্গ কালিবর্ণ হয়ে গেছে। অলংকারের মাধ্যমে কবি একথা উপস্থিত করেছেন।

112

বিরুদ্ধ বিন্যাসের মাধ্যমে এই পদটিতে প্রতিবিন্যাস অলংকারের সৃষ্টি করা হয়েছে —

ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরি তরঙ্গ।।
ও বর মরকত ঠান।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ।। (২৯০)

অসংখ্য উপমা-রূপক প্রভৃতি সাদৃশ্যমূলক অলংকার শব্দের মাধ্যমে কবি কৃষ্ণ-রাধার রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃত কবি-আলংকারিকদের থেকে ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত উপমান সমূহেরই রোমন্থন করেছেন। প্রচলিত উপাদান উপকরণ গ্রহণ করলেও তাঁর উপস্থাপনা কৌশল তাঁর মৌলিক প্রতিভার পরিচায়ক। প্রথাগত শব্দকেই তিনি নতুন মাত্রা দিয়েছেন। তাঁর কবিমনের এ এক মূল বৈশিষ্ট্য। শব্দের দ্ব্যর্থবোধকতার সূত্রেও তিনি পদের মধ্যে তাঁর কবি চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করে কবি মানব চরিত্রকে অসীম ব্যাপ্তি দিয়েছেন ৫৮১ সংখ্যক পদে। তাঁর তনু ঘনরসময় অর্থাৎ মেঘ বারিপূর্ণ, সেখানে নিমগ্ন আছে বহু রমণীয় হৃদয় রূপ মৎস্য। হৃদয়ের গভীরতা আর মৎস্যের গভীরচারিতা গোবিন্দদাসের অভিজ্ঞ কবি দৃষ্টির পরিচায়ক। তাঁর কানে রয়েছে মকর অব তংশ। গ্রীবা শঙ্খসাদৃশ্য। অন্তরে লক্ষ্মী তার কৌস্তভ মণি এ সমস্তই সমুদ্রের উপকরণ। গোরচনা তিলকের ম্লান জ্যোতির সঙ্গে সমুদ্র মগ্ন মৈনাকের আভা তুলনীয়। (ওই)

রাধার ভাব-মানসকে ফুটিয়ে তুলতেও কবি কল্পনার আতিশয্য গ্রহণ করেছেন। রাধা হরিণ-নয়না। তাঁর হৃদয় - খাঁচায় বন্দী করেছেন কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ সিংহতুল্য হলেও এক্ষেত্রে হরিণীর কাছে বন্দী। কৃষ্ণের কটি কৃশ, তিনি গোবর্ধন গিরিতে চন্দ্রাকৃতি সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করে ভ্রমেণ। তাঁর দৃষ্টি রক্তিম ও বঙ্কিম। কৃষ্ণকে এখানে সিংহের সঙ্গে একাত্ম করার চেষ্টা লক্ষিত হয়। এ হেন কৃষ্ণকে রাধা ধরে রেখেছেন তাঁর অনুপম কলা চাতুর্যে। (৫৯০ সংখ্যক)

কৃষ্ণের লৌকিক বর্ণনার পরিচয়ও কবি দিয়েছেন কোন কোন স্থলে। কৃষ্ণের গাত্রবর্ণ কাজলের মতো কালো। ভ্রমরের মতো বা অন্ধকারের মতো নিচ্ছিদ্র। তাঁর গতিভঙ্গি কুটিল সর্পের মতো। বাঁশির মধুস্বর তাঁর পক্ষে বিষ নিশ্বাস। তিনি ব্রজধামের সর্প। সাপের মতই কৃষ্ণ চন্দনবৃক্ষে থাকতে চান। এখানে চন্দনবৃক্ষ রাধার বক্ষ। তাঁর শঙ্কায় ধর্ম পক্ষী পলায়ন করে। এখানে পরকীয়া রতিরঙ্গের সঙ্গে তুলনীত। রাধার রক্তিম অধর বাতাস পান করেন কৃষ্ণরূপ সর্প। তাঁর দংশনে রাধার বিষজ্বালা দূর হয়। (৫৯১ সংখ্যক)

তাছাড়া কৃষ্ণকে ৫৯৩ সংখ্যক পদে ধূর্ত স্বর্ণকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ৪৬২ সংখ্যক পদে কৃষ্ণের নারীবেশ বর্ণিত। কৃষ্ণ কখনো মহামরকত, কখনো জলধর, কখনো তিমির, কখনো তমাল বা কখনো মধুকরের সঙ্গে উপমিত (৫৭৪ সংখ্যক)

রাধারূপের ও বর্ণনা প্রাবল্য গোবিন্দদাস-এ দেখা যায়। তাঁর কপাল চন্দ্র তুল্য, সিন্দুর বিন্দু সূর্য, ঘন কেশরাশি যেন অন্ধকার রজনী। নয়নের মণি যেন কাজল রঞ্জিত পল্লবে বন্দী। তাঁর রক্তাক্ত অধরের হাস্য জ্যোৎস্না শোভামণ্ডিত। (১৮২ সংখ্যক)। অন্যত্র তাঁর তনু কনকলতা তুল্য (১৮৪ সংখ্যক)। কখনো শৃঙ্গারের অধিদেবী তুল্য (১৮৫ সংখ্যক ৯৮)। ২২৪ সংখ্যক পদটিতে রাধারূপের অসামান্য আলেখ্য এঁকেছেন কবি; তাঁর অঙ্গজ্যোতি বিদ্যুৎ তুল্য প্রভাময়। তাঁর রক্তাভ চরণ স্থলকমল, ভ্রুযুগলের চঞ্চল ভঙ্গি যেন যমুনার তরঙ্গ বিক্ষেপ, তাঁর চক্ষু নীল উৎপল আর

হাসি যেন শুভ্র কুমুদের অভিব্যক্তি। রাধার ভ্রূ-লতা ভুজঙ্গ হয়ে কৃষ্ণের হৃদয়ে দংশন করে (২২৯ সংখ্যক)। রাধা কখনো রত্নমুকুল তুল্য, কখনো বা লাবণ্যের সাগর, তাঁর দন্তরাজি বিদ্যুৎ চমকের মতো আর হাস্য অমৃত লহরী। তাঁর কটাক্ষ শরে কৃষ্ণের মন-প্রাণ-গুণ-ঐশ্বর্য-বুদ্ধি-দৃঢ়তা সবই লুঠ হয়ে যায়। (২৩০ সংখ্যক)

নিসর্গ প্রকৃতিতেও কবি অনেক সময় সচেতনতা আরোপ করে ব্যক্তি চরিত্র প্রকাশের কাজে লাগিয়েছেন। যেমন ৫২ সংখ্যক পদে রাধা-কৃষ্ণের মিলন দৃশ্যে সখীরা চন্দ্রালোক দেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন—এই ঘটনাকে কবি রূপায়িত করেছেন এই বলে যে রাধাকৃষ্ণলীলা এবং সে ব্যাপারে সখীদের আগ্রহ প্রত্যক্ষ করেই যেন নিশাকর কিছুটা সময় আরও উদিত থাকলেন।

দুহুঁজন - সেবন সখিগণ কেল।
চৌদিগে চান্দ হেরি রহি গেল।। (ওই)

শ্যাম রূপকে ৫২ সংখ্যক পদে নীল পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর এই পাহাড়কে বেস্টন করে আছে রাধারূপ সুবর্ণ মালিকা।

৭৫ সংখ্যক পদে কৃষ্ণের গাত্রে বিলাসজনিত ঘর্মবিন্দু দেখে কবির মনে হয়েছে যেন মেঘগাত্রে মোতির সজ্জা। নিসর্গ সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের স্বাভাবিকতাকে উপমাচিত্রের মাধ্যমে একাত্ম করে দেখানো হয়েছে এখানে।

বিরহপীড়িত রাধার মুখের চিত্রাঙ্কনে কবি লোক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপস্থাপিত করেছেন। জলবিহীন পদ্ম যেমন নীরস বিবর্ণ, তেমনি রাধার কৃষ্ণ-সঙ্গহীন মুখকান্তি। তাঁর লাবণ্যহীন গাত্রবর্ণ হল ঝামার মতন। এখানে ও কবির মৌলিক কল্পনা স্পষ্ট। (৬৬১ সংখ্যক)

আগেই বলা হয়েছে যে, গোবিন্দদাসের কবিভাষার একটি মৌল গুণ হল ধ্বনিঝঙ্কার। এমনকি প্রচলিত উপমা-উপকরণকেও তিনি শুধুমাত্র শব্দ-উপস্থাপনার গুণে নবত্ব দান করেছেন। বিরহদীর্ণ রাধার দেহ চন্দ্রকলার মতো ক্রমশ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হচ্ছে, চন্দন মার্জনা, চন্দ্র কিরণের শীতলতা, মৃদুমন্দ মলয় বাতাস, জলসিক্ত বসন, নীলোৎপল-কুসুম-পদ্মদল নির্মিত কিশলয় শয্যা—কিছুতেই রাধার স্থৈর্য সম্পাদিত হচ্ছে না। এই বহু পরিচিত উপমা চিত্রগুলি গোবিন্দদাস উপস্থিত করেছেন অনুপম ধ্বনিগমতায় ও ছন্দহিল্লোলে —

ও নিতি চাঁদ-কলা সম ধীয়ত
তোহে পুন চঢ়ব কলঙ্ক।।
চন্দন চন্দ মন্দ মলয়ানিল
নীর-নিষেচিত চীরে।
কুবলয় কুমুদ কমল দল কিশলয় -
শয়নে না বান্ধই থীরে।। (৬৬২ সংখ্যক)

গোবিন্দদাস : চিত্রকল্প

কবিভাষার একটি অন্যতম উপাদান চিত্রকল্প-নির্মাণ। শব্দ সমাবেশের অনন্যতাই চিত্রকল্প-নির্মাণের প্রধান উপাদান। গোবিন্দদাসের পদাবলীতে চিত্র সৃষ্টি প্রয়াস লক্ষণীয়। চিত্রধর্মের মাধ্যমে অনেক স্থলেই কাব্য-উপজীব্যতার বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কৃষ্ণ বিরহে রাধা কাতর। বিচ্ছেদ যাতনা যে কত কষ্টকর হয়ে উঠেছে এবং তাতে তাঁর যে রূপ পরিবর্তন ঘটেছে তা নিম্নোক্ত চিত্রটিতেই স্পষ্ট—

নীরস-সরসিজ ঝামর-বয়না (৬৬১ নং) অর্থাৎ নীরস পদ্ম ফুলের-মত রাধার মুখ হয়েছে। এই শুষ্ক, কঠিন মুখের চিত্রটি ফুঠে উঠেছে ঝামার উপমায়।

প্রকৃতি চিত্রকে কত চাতুর্যের সঙ্গে এবং সূক্ষ্মতার সঙ্গে চরিত্রের মর্ম উদঘাটনে হাতিয়ার করা যায় নিম্নোক্ত পদে তা লক্ষণীয়। কৃষ্ণ-রাধার নৈশ-লীলার মিলন ক্ষণ শেষ হতে চলেছে। কেননা রাত্রির নিঃসীম আঁধারে ঊষার কিরণ ভাতির স্পর্শচিহ্ন স্ফুটিত হচ্ছে। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক চিত্রটি রাধা-কৃষ্ণের আসন্ন বিচ্ছেদ চিত্রে আরোপ করা হয়েছে। রাধার নীল শাড়ীর আঁচলে বিরহ অনলের রক্তিমাভায় এই চিত্রটি অপূর্ব ব্যঞ্জনা পেয়েছে। যথা ঃ—

যামিনি - তিমির থীর নাহি হেরিয়ে
পরশি অরুণ - রুচি - রঙ্গ।
নাগরি নীল পটাঞ্চলে অঙ্ক।। (৫১ সং)

চিত্রগীত পর্যায়ের এই পদটিতে রাধার বিবর্ণ চেহারাকে বর্ষার মত্ত প্রেক্ষাপটে বৈপরীত্যে চিত্রিত করা হয়েচে। এই বৈষম্য ফোটাতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে ঝ বর্ণের ধ্বনি অনুপ্রাস—

ঝর ঝর জলধর - ধার।
ঝঞ্ঝা - পবন বিথার।।
ঝলকত দামিনি - মালা।
ঝামেরি ভৈ গেল বালা।। (১২৭ সং)

রাধার অপূর্ব রূপচিত্র অঙ্কিত হয়েছে নিম্নোক্ত পদটিতে। কৃষ্ণ রাধার লাবণ্যময় রূপ দেখে মোহিত। যমুনায় যাওয়ার পথে রাধাকে দেখেছেন কৃষ্ণ। রাধা চলেছেন তাঁর দীঘল কেশ আলুলায়িত করে। সেই দীর্ঘ কেশদাম লম্বিত হয়েছে নিতম্ব-অবধি। রসের আলসে তাঁর গতি ইতস্ততঃ। রাধার এই মদালস ভঙ্গিটি কবি অসামান্য চিত্রকল্পে মন্ডিত করেছেন—

মেলিয়া দীঘল কেশ ফেলিয়া নিতম্বে।
চলে বা না চলে রাই রস অবলম্বে।। (২৫১ সং)

মিলনের এই পদটির ভূমিকাংশটি প্রাকৃতিক পরিবেশের সুন্দর স্বভাব চিত্র। শীতের রাত্রি, উত্তুরে হাওয়ার এলোমেলো বিক্ষেপ, আকাশ থেকে শিশিরবিন্দু পাত হচ্ছে। এই রকম পরিস্থিতিতে কৃষ্ণ বেরোলেন অভিসারে।

হিম - ঋতু - নিশি দিশি দিশি বহ বাত।
হিমকর - শীকর - নিকর নিপাত।। (২৯৭ সং)

রাধার বর্ষা তিমিরাভিসারের এই পদটিতে আকাশে নতুন মেঘের আবির্ভাব ও ব্যাপ্তি, বাইরের গাঢ় অন্ধকার মিলে মিশে চমৎকার চিত্রে অভিব্যক্ত হয়েছে। রাতের আঁধার এত গাঢ় যে রাধা নিজ দেহ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন না। এই পর্যন্ত বহিরঙ্গ চিত্র। এরপর কবি এঁকেছেন এক অভিসারিকার

অন্তর চিত্র। রাধার হৃদয়ে উদিত হয়েছে শ্যামরূপ চন্দ্রের। ফলে চন্দ্রোদয়ে তাঁর মন্ময়রূপ সমুদ্র উদ্বেলিত এবং তাঁর তরঙ্গভঙ্গের বেগে রাধাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অভিসার-পথে -

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ।।
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহিঁ মনোভব - সিন্ধু।। (৩৪৬ সং)

বর্ষাভিসারের এই সমগ্র পদটিতেই চিত্রকল্পের নিপুণ প্রয়োগ দেখা যায়—কর্দমাক্ত পথে ব্যাঘ্র-সর্প প্রভৃতি জন্তুর উৎপাত। অঝরে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। বাতাস বইছে। এই অবস্থায় রাধা যাচ্ছেন বন্ধ কপাট অতিক্রম করে অভিসারে। তাঁর মাথায় নীল শাড়ীর অবগুণ্ঠন, কিন্তু তাতে বৃষ্টি আটকাচ্ছেনা। রাধার এই অভিসার যাত্রাকে কবি চিরন্তন অভিসারে উন্নীত করেছেন-হরি রহু মানস সুরধনী পার এই আপ্তবাক্যে। অর্থাৎ হরি রয়েছেন মানস গঙ্গার পারে, বহু দূরে। ঘন ঘন কড় কড় শব্দে বজ্রপাত হচ্ছে, শুনলেই কান ও প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে। চারদিকে বিদ্যুতের ঘন ঘন চমকে চোখ ধাধিঁয়ে যাচ্ছে। রাধা এসব উপেক্ষা করেও, দেহ কষ্ট উপেক্ষা করেও চলেছেন প্রেমের অভিসারে—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট। চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তঁহি অতি দরদর বাদরদোল। বারি কি বারই নীল নিচোল।।
এ সখি কইছে করবি অভিসার। হরি রহু মানস সুরধুনী পার।।
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত। শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত।।
দশ দিশ দামিনি দহন বিথার। হেরইতে উচকই লোচন তার।।
ইথে জনি অব তুহুঁ তেজবি গেহ। প্রেমক লাপি উপেখবি দেহ।। (৩৫৩ সং)

একই সঙ্গে অপূর্ব শব্দচিত্র ও উপমাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে ৩৫৭ সংখ্যক পদটিতে। শ্যাম - অনুরাগে রাধার সব কিছুই নীল বর্ণের। তাই অভিসারে যাওয়ার জন্য তিনি দেহ প্রসাধন করলেন নীল মৃগমদ দিয়ে। গলায় পরলেন উজ্জ্বল নীল হার, হাতের বলয়ও নীল এবং পরিধানের বস্ত্রও নীল রঙের। রাধার গৌরাঙ্গী বর্ণ এই সব কারণে শ্যামল বর্ণ ধারণ করেছে। তিনি নিজে মিশে গেছেন (বর্ণ রূপান্তরের ফলে) অমাবস্যার রাত্রির সঙ্গে এবং নিজেকে লনী অর্থাৎ ঘন অন্ধকারে গোপন রেখে চলেছেন অভিসারে। তাঁর নীল কেশদাম দুলছে কপোলে, কবি এই পটভূমি ও চরিত্রকে উপমিত করেছেন, এ যেন শ্যামরূপ সাগরে নীলপদ্ম—ফলে সবটাই অলক্ষ্য। কেবল মাত্র নীল ভ্রমরেরা ছুটছে সুগন্ধে আকুল হয়ে। তাদের মৃদু ঝঙ্কারে, পাঠক তো ছার, কবিকেই অনুমান করতে হচ্ছে যে রাধা অভিসারে চলেছেন। এই পদটিতে নীল বর্ণের আরোপ ও অমাবস্যার রাত্রিতে অভিসার এবং ধ্বনি অনুপ্রাস মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে—

নীলিম মৃগমদে তুনু অনু লেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়গণে ভুজযুগ মন্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল।।
সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরি ভেল শ্যামরি

কুঞ্জ - যামিনী ভয় ভাগি।।
নীল অলকাকুল অলিকে হিলোলত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনী জনু শ্যামর সায়রে
লখই না পারই কোই।।
নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দ দাস অতয়ে অনুমানল
রাই চলল অভিসার।। (ওই)

তিমিরাভিসারের এই পদটিতেও কবি সুক্ষ্ম সৌন্দর্যে চিত্রকল্পের যথাযোগ্য আরোপ করেছেন। রাধা নিজের চন্দ্রতুল্য মুখ গুরুজন নয়ন রূপ রাহু গ্রাস মুক্ত করতে নীল বসনে আবৃত করে চলেছেন অভিসারে। এদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ হচ্ছে অমাবস্যার গহীন রাত। ঘন অন্ধকার যেন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। এই অন্ধকারকে কবি চিত্রিত করেছেন 'দুরন্ত' শব্দ প্রয়োগ-এ। পুঞ্জীভূত অন্ধকারের চিত্রটি উদ্ভাসিত হয়েছে দুরন্ত শব্দের বিপজ্জনক চিত্রে। এই অন্ধকারে রাধাকে অভিসারে পথ দেখাচ্ছে মদন রূপ প্রদীপ। একদিকে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অন্যদিকে দুর্লঙ্ঘ্য আকাঙ্খা একদিকে প্রকৃতির বাহ্যিক বিরোধীতা অন্যদিকে অন্তরের তীব্র শক্তিমত্তা - এই বৈপরীত্যে চিত্রে পদটি অনন্য—

গুরুজন - নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ।
নীল নিচোলে ঝাঁপি মুখ - চন্দ।।
কুহু যামিনী ঘন তিমির দুরন্ত।
মদন - দীপ দরশায়ল পন্থ।। (৩৫৮ সং)

দিবাভিসারের এই পদটিতে অপূর্ব ধ্বনি অনুপ্রাসের মধ্যে বর্ষাকালের একটি মেঘলা দিনকে কবি রাত্রির পটভূমি করেছেন। দিনের চিত্রটি রাত্রির চিত্রকল্পে পর্যবসিত—

গগনহি নিমগন দিনমনি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি।।
ঐছন জলদ কয়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহিপার।। (৩৬১ সং)

অর্থাৎ সূর্যদেবের কান্তি মধ্য আকাশে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ফলে দিন রাতের তারতম্য অবলুপ্ত হয়েছে। কারণ চারিদিকে এমনই মেঘের ঘন আঁধার যে, কাছের লোককেও দেখা যাচ্ছে না। এই অনুষঙ্গে মোহিতলালের কটি পংক্তি মনে আসে—

মধ্য দিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে?
ধরণীর পরে বিরাট ছায়ার ছত্র ধরিল কে?[১১]

বাসক সজ্জায় রাধার মন অস্থির হয়ে উঠছে, কেননা কৃষ্ণের আসতে বিলম্ব হচ্ছে। তাই সখীকে তিনি এগিয়ে দেখতে বলছেন। হয়তো পথেই তাঁর সঙ্গে সখীর দেখা হয়ে যাবে, তবেই তিনি বাঁচবেন, তবেই সুরত অভিলাষ দ্বারা যৌবনের মন বাসনা মিটবে এবং আনন্দাশ্রুতে দুচোখ ভরে যাবে। রাধার এই ইঙ্গিত পুলকের সাক্ষী হবে তাঁর প্রেম-গভীর মন। এখানে রাধার উৎকণ্ঠা ও মানস-কল্পনার মাধ্যমে কবি রাধার অন্তর্দ্বন্দ্বের মর্ম চিত্রটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

একপদী ছন্দের স্বল্প আয়তনে ও শুধুমাত্র আভাস-দানকারী পংক্তির সজ্জায় রাধার দ্বিধা ও অভিলাষ অপূর্ব চিত্রকল্পে নির্মিত হয়েছে —

সজনী করহ পয়ান। পন্থ মিলব তুয়া কান।।
অনুকুল হোয়ে বিধাতা। তবহ জিয়ব ধনি রাধা।।
সেজ সফল তুহুঁজান। যেহিখনে করব শয়ান।।
যৌবন মন অভিলাষ। পুরব সুরত - বিলাস।।
আনন্দ লোরে ভরু আঁখি। পুলকে পুরব তনু সাখি।।[১২] (৪০৬ সংখ্যক)

বসন্তোৎসবে রাধা-কৃষ্ণ-সখীগণ আনন্দ করছেন। হোলি খেলায় লাল ফাগের রঙে রঞ্জিত তরুণ বৃক্ষ সকল। মাটির বুকেও রক্তিম আস্তরণ। ফলে জল স্থলের বর্ণই হয়ে গেছে একরকম, ফাগুয়া দ্রবীভূত লাল জলে পদ্মফুল ও রক্তবর্ণ লাভ করেছে, কবি গোবিন্দদাসের হৃদয়ও শেষ পর্যন্ত আরক্ত হল এই রক্তিম আনন্দ ছটায়। প্রকৃতি এখানে অপূর্ব চিত্রকল্পে সমতা প্রাপ্ত হয়েছে, এবং এই সমাবেশটি 'অরুণ' শব্দের একাধিকবার ব্যবহারে ও ত, র, ণ প্রভৃতি ধ্বনি অনুপ্রাসে হৃদয়গ্রাহী হয়েছে —

অরুণ তরুণ তরু অরুণিহ ধরণী।
স্থল জলচর ভেল সভে এক বরণী।।
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ
অরুণ হৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ।। (৫৪৫ সং)

রাস নৃত্যের নিম্নোধৃত পদটিতে কৃষ্ণের নৃত্যরত চিত্রটি চিত্রকল্পের সুন্দর দৃষ্টান্ত। গৌরাঙ্গী সখীদের মাঝে কৃষ্ণই একমাত্র শ্যামবর্ণ। তিনি অনর্থক অঙ্গভঙ্গি করে নৃত্য করেছেন আর তাঁর পাশে তাঁকে ঘিরে নাচছেন অসংখ্য ব্রজগোপী - এই দৃশ্যটিকে কবি চিত্রিত করেছেন কৃষ্ণরূপ মেঘের চঞ্চল বিক্ষেপ ও গৌরাঙ্গী গোপিনিদের বর্ণরূপ বিদ্যুৎমালার স্ফুরণের মাধ্যমে—

ঘন ঘন অঙ্গ ভঙ্গে নাচে নন্দবালা।
মেঘগন ঘেরি যেন খেলিছে চপলা।। (৫৬৭ সং)

বিরহের এই চিত্রটিতে কবি কৃষ্ণের প্রেমকে অল্প জলের সাথে তুলনা করেছেন। অথচ সন্তপ্ত প্রার্থীসংখ্যা অসংখ্য। তাঁরা স্বল্প প্রাণ পুঁটিমাছের মত, সুতরাং তাঁদের জীবন্মৃত অবস্থা। বিরহী ব্রজ বধুদের মর্মজ্বালা ও পুঁটিমাছের ক্ষীণ জীবীতার উপমা চিত্রটি কবি অত্যন্ত চাতুর্য সহকারে উপস্থাপিত করেছেন লোকাভিজ্ঞতার ভিত্তিতে—

থোর সরোবরে তপত জন আকুল
আকুল সফরী - পরাণ।
জীবন মরণ মরণ ধরু জীবন
গোবিন্দদাস ভালে জান।। (৬৩৭ সং)

বিরহিনী হৃদয়টি কবি নিম্নোক্ত পদটিতে পাঠকের সামনে মেলে ধরেছেন কয়েকটি অপূর্ব চিত্র মাধ্যমে। বর্ষাকালের আকাশে নতুন মেঘের উদয় অথচ সেই শ্যামলদেহ কৃষ্ণ রয়েছেন দূরে। এখানে আকাশের দূরত্ব আর মেঘ রাধার হৃদয় আর কৃষ্ণের দুরাবস্থানের সাম্যে পরিস্ফুট। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমক যেন রাধার অন্তরের কম্পমান চলচ্ছবি, চাতকের আকুল রব যেন রাধার হৃদয়ের উত্তাল আর্তির ধ্বনিরব। উন্মত্তের মত অবিরাম ভেকের চিৎকার আর রাধার বিরহদগ্ধ জীবনের

নিরবচ্ছিন্ন নিরাশা একসূত্রে প্রথিত—

উয়ল নব নব মেহ।
দূরে রহু শ্যামর দেহ।।
অহি ঘন বিজুরি উজোর।
হরি রহু নাগরি - কোর।।
চাতক পিউ পিউ বোল।
শুনইতে জিউ উতরোল।।
দাদুর উনমত ভাষ।
বিরহিণি জিবন হুতাশ।। (৬৪৮)

কবি রাধার ভাববিরহের সুন্দর চিত্রকল্প উপস্থিত করেছেন নিম্নোক্ত পদটিতে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকা ঝনকিত বর্ষার রাত। এদিকে কৃষ্ণ রয়েছেন দুরদেশে। মর্তে ভেকরব, গগনে মেঘ গর্জন, গাঢ়, ঘোর অন্ধকার - এই প্রকৃতি চিত্রটি প্রকৃত পক্ষে উৎকণ্ঠিত, প্রত্যাশা হত রাধার হৃদয়-এর নিস্তব্ধ মর্মলোককেই প্রকাশ করেছে। মুষল-ধারে বারিপাত হচ্ছে বজ্রপাত হচ্ছে নিরন্তর। রাধার মনে-ও হচ্ছে অবিরল অশ্রুপাত, তাঁর চিত্ত চমকিত হচ্ছে বারবার। ময়ুর ময়ুরীর মত নৃত্য ও প্রণয় চিৎকার আর গুরু গর্জনে বজ্রপাত পথিক পরাণকে আকুল করে তুলেছে। প্রকৃতি ও মানব সত্তাকে কবি এখানে আশ্চর্য অন্তরঙ্গ চিত্ররূপ দিয়েছেন—

এ সখি কি কহব করম হামার।
ঝাঁ ঝাঁ ঝনকে ঝনকে উঠে রজনী
দূর দেশে রহল গোয়ার।।
দুর দুর দাদুরু গগনে গরজ গুরু
গম্ভীর ঘোর আন্ধিয়ার।
ঝর ঝর ঝাঝরু ঝরকে ঝরকে ঝরু
জলধর চমকে বার বার।।
ভেক টেবাওই ডাকই চমকই
চমকই বিরহিণী - অঙ্গ।
শিখি সহিতে শিধিনি উনমত নাচত
ডাকত ডাহুক ঢঙ্গ।।
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাতিত
বধিত হি পথিক - পরাণ। (৭১১ সং)

সুতরাং দেখা গেল যে, কাব্যভাষার মধ্যে চিত্রকল্পের সাহায্যে গোবিন্দদাস যেমন একদিকে পারিপার্শ্বিক উপকরণ সমূহকে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তায় উপস্থাপিত করেছেন, অন্যএ সেই পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য শব্দচিত্রের ঐশ্বর্যকে কাজে লাগিয়েছেন এবং এখানে তাঁর কবিভাষার মৌলিকত্ব তথা শিল্পী মনের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে।

গ্রন্থসূত্র

১. বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত ঃ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ (১৯৬১), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৪৪২।

২. শঙ্করী প্রসাদ বসু ঃ মধ্যযুগের কবি ও কাব্য (১৩৭৯), পৃ. ১৪৩।

৩. কালিদাস রায় ঃ প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য (১৩৫৪), ২য় সং পৃ. ১৩৪।

৪. বৈষ্ণবদাস ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য প্রকাশিত, পদকল্পতরু (মোট ৫ খণ্ড), পদসংখ্যা-২৪২৪।

(গোকুলানন্দ সেন, ১৮শ শতক) সঙ্কলিত সতীশ চন্দ্র রায় সম্পাদিত (১৯৩১)

৫. বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত। ঃ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ (১৯৬১) কলি-বিশ্ব, পদ সংখ্যা-৪৭, পৃঃ উদ্ধৃত পার্শ্বস্থ সংখ্যা উক্ত গ্রন্থের পদসংখ্যা সূচিত করে। বি. মজুমদার।

৬. পদকল্পতরু, পূর্বোক্ত

৭. বি. ম, পূর্বোক্ত

৮. দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রঃ

৯. বি. ম. পূর্বোক্ত

১০. প্রত্যেক পংক্তিতে বর্ণ সজ্জা-গুরু-লঘু-গুরু-লঘু-লঘু (তিনটি পংক্তি) ও শেষ পংক্তিতে গুরু-লঘু-গুরু-ক্রমে। এই ছন্দই চর্চরী ছন্দ। দ্রষ্টব্য ড. ভোলাশংকর ব্যাস সম্পাদিত 'প্রাকৃত পৈঙ্গল (১৯৫৯), বারানসী ৫, ১ম খন্ড। পৃ. ২৮৪।

১১. স্মরগরল কাব্য গ্রন্থের 'কালবৈশাখী' কবিতা।

১২. বি. ম. পূর্ব্বোক্ত

কয়েকজন গৌণ পদকর্তাগণের কাব্যভাষা

বলরামদাস - বাসুঘোষ - জগদানন্দ - শশিশেখর - লোচনদাস

বলরামদাস : ভাষা

চৈতন্য-উত্তর বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন বলরাম দাস। ব্রজবুলি এবং বাংলা উভয় ভাষাঙ্গিকেই তিনি পদচারণা করেছেন। তাঁর রচনা রীতিতে বর্ণনাত্মক মনোভাব লক্ষণীয়। পদাবলীর ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারারই অনুবর্তন করেছেন তিনি। বিশেষত ব্রজবুলি ভাষার পদে। বাক্যসৌন্দর্য বর্ধনে বা শ্রুতিমাধুর্য সম্পাদনে শব্দের ধ্বনি পরিবর্তনের ওপর তাঁর দৃষ্টি ছিল। পদ রচনার ক্ষেত্রে ছন্দের সমতা রক্ষার জন্য তিনিও স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের ওপর বিশেষ নির্ভর করেছেন। যেমন —

মুগধ, লুবধ, করম - ভরম (১৩ সংখ্যক)[১]। এখানে পদান্ত অনুপ্রাসের ও ধ্বনিমিলের মাধ্যমে স্বরভক্তির বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণীয়। এছাড়া দেখি মরদনে, ধেয়াতি (২ নং), খুবধ (১০ নং), বেয়াধি (২৩, ১৪৫ ইত্যাদি) বিদগধ (২৪), পুরবে, গোপত, বরজ, করমের (২৭), মগন (৩১, ১৭৪) পরবন্ধ (২৮), অদভুত, উনমত (২৯), বিসরন (১২৬), তিরিষায় (১৫৪), পরমাদ, আশোয়াস (১৬২), তিরপিত (১৬৯), পরকাশবি (১৭২) প্রভৃতি। এখানে অনেক স্থলেই স্বরভক্তির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে কেবলমাত্র শ্রুতিমাধুর্য নয় ছন্দোসাম্য রক্ষার্থেও। যথা ঃ—

মান অলখী পরবেশ। (১০৩)।

অথবা,

'স্বামিবরত ছলে কানন আনলি
একলি প্রিয়সখি মোর। (৮৫)। এখানে 'পরবেশ' এবং
'স্বামিবরত' শব্দদুটির ছন্দোকলা মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে স্বরভক্তি হেতু।

পদকে শ্রুতিমধুর করে তোলবার জন্যে স্বরসঙ্গতির যথাযুক্ত প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায় বলরামদাসের পদাবলীতে। প্রধানতঃ অ, আ, ই, উ প্রভৃতি স্বরই অধিক ব্যবহৃত। যথা ঃ বলব, জানল (১৭১), মিলল (১৬৭, ১৬৮), টুটুল (৮৫), গুণপন (১০৩) আনালি (৩৪), আছিলা, দাঁড়াইলা (৩৫), যাইবা (১৩৫) নিরগুনি (১০১) বিমুখি (১০২) জুড়াকু (১৫৪) প্রভৃতি। পদান্ত মিলের জন্যও স্বরসঙ্গতি প্রযুক্ত হয়েছে কোন কোন স্থলে। যেমন—শুনইতে চমকিত সবহুঁ মতঙ্গঁ। চরণহি সোঁপল নিজ গতিভঙ্গ।। (৯১)

ছন্দমাত্রার সমতা বজায় রাখার কৌশল হিসেবে অনেক-স্থলে শব্দের বর্ণলোপও করেছেন কবি। এর ফলে বাক্যে কিছুটা ধ্বনিকোমলতা ও স্বরের প্রবহমানতা রক্ষিত হয়েছে। যথা ঃ 'পুন ধনি তেজলি দীর্ঘ নিশাস' (৬৫), 'অলখিতে আধ-কমল দিঠি অঞ্চলে হেরই হরি - মুখ - চাঁদ' (৭৫)। এরকম - উচার (৯১), উলসিত, উলাস, কটাখ (৯২), মনকাম (১৭১) প্রভৃতি।

শব্দরূপগত যে সব বৈশিষ্ট্য বলরামদাসের ভাষা ব্যবহারে বিশেষ ভাবে লক্ষিতহয় তার মধ্যে শব্দ - অন্তে 'য়া', 'ইয়া' প্রত্যয় যোগ উল্লেখ্য। যেমন, বিশেষ্য পদে ঃ কাঁতিয়া পাঁতিয়া,

ভাতিয়া, রাতিয়া (১), মণিয়া, ধ্বনিয়া, রজনিয়া (৬) প্রভৃতি। বিশেষণ পদে ঃ মোহনিয়া (৬) ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়ায় ঃ ঘাতিয়া, মাতিয়া, অপরাধিয়া (১), বরিখনিয়া, নিরখনিয়া, সেচনিয়া (৬), মুরছিয়া (৭) চিন্তিয়া (৬১) প্রভৃতি।

ক্রিয়াপদের নানা রূপের ব্যবহার করেছেন বলরামদাস। অতীতকালের ক্রিয়াপদে অনেক সময় 'ইলা'। প্রত্যয় যোগে ধ্বনিসাম্য ও কোমলতা সৃষ্টি করেছেন কবি। যথা ঃ 'এবে তাঁহা বিলাইলা...' (২৭), 'জগভরি গাওয়াইলা...' (ওই), ...'বচন হইলা হারা'। (৭৬) ইত্যাদি।

উত্তম পুরুষের অতীত কালের ক্রিয়াপদে প্রধানত ঃ 'লু'। 'লুঁ', 'নু' প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। যথা ঃ গেলু (১১৪), জানলু (৫৭), মলুঁ (২৫), ঠেকিনুঁ (৫৯), পুছলুঁ (৬৭), ঘুমলুঁ (৮৪), মুরছলুঁ (ওই), সোঁপলুঁ (৮৬), পায়লুঁ (১০৪), মরিলুঁ (১০৭), বাঢ়াইলুঁ (১০৮), ফেলিলুঁ, দড়াইলুঁ (১১৮), ঘুচাইলুঁ, ভাসাইলুঁ (১২০), খোয়ালুঁ (১২২), সমাদলুঁ (১৬২), খাইনু (১৬), লৈনু, ভুলিনু (৪০), দিনু, বিছাইনু (৯৬) ঢালিনু, তেজিনু, (১১৪) পাইনু (১৭৩) ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎকালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদে 'মু' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে যেমন ঃ দেখিমু, থাকিমু (১১৫) সাধিমু (১১৮) প্রভৃতি। বর্তমান কালের ক্রিয়াপদে অনেক সময় ছন্দোমাত্রা বৃদ্ধিতে বা ধ্বনিতরঙ্গ বৃদ্ধিকল্পে 'য'- ফলা ব্যবহৃত হয়েছে। এই সমস্ত ক্রিয়াপদগুলি লোকায়ত বাংলার কাছাকাছি বলে এতে পদাবলীর প্রচার গ্রাহ্যতাও বেড়েছে। সাধারণ মানুষের চেনা এই সমাপিকা ক্রিয়ায় লৌকিক শব্দগুলির মধ্যে আছে ঃ ধর‍্যাছে (১৯), খায়্যাছে (৪১) প্রভৃতি। অসমাপিকা ক্রিয়ায় 'য' ফলা এসেছে অন্তে। যথা ঃ লয়্যা, ধায়্যা (৩৭), খসয়্যা (৪১), আউলায়্যা (৮২), লোটায়্যা লোটায়্যা (১১০) বাঢ়ায়্যা (১১৯), অসমাপিকা ক্রিয়াপদে নাসিক্য বর্ণ 'ঞা' বা 'ঙ' র যোগও লক্ষিত হয়। এ সমস্ত শব্দও লোকায়ত গ্রাম্য সমাজের একেবারে কাছাকাছি। ফলে পদাবলী পল্লী বাঙলার সাধারণ পাঠকের কাছেও পৌঁছেচে। এবং ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যথা ঃ পাঞা (৩২), রচিঞা, বান্ধিঞা, সোপিঞা, চাঞা, দিঞা (৪৫), মিলাঞা (৫৮), ভেজাঞা, সাজাঞা (৫৯), জনমিঞা (৬১) পরাঞা (৮২) খুঞা (১২৩), যাঙ (৮) হারাঙ হারাঙ (১৬৯) প্রভৃতি। নাসিক্য বর্ণের জন্যে পদে ধ্বনি কোমলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

একই শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ—এ বিষয় প্রসঙ্গের মধ্যে জোর (force) এনেছেন কবি। এই সমস্ত দ্বিরুক্ত শব্দ গুলির মধ্যে আছে—যাচিয়া যাচিয়া, যত যত (২৭), কাতর কাতর (৫৭), চাপি চাপি (৬৩), চৌখে চৌখে (১২৩), গুণি গুণি (১৬৫) ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারাত্মক শব্দের ও বহুল ব্যবহার করেছেন বলরামদাস। এতে ধ্বনি ঝঙ্কার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনই শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টি হয়েছে। যথা ঃ গর গর, ঝর ঝর (৯), ঝলমল, টলমল (২৯), কেন হেন (২৭), হুলাহুলি (৩৭), গদগদ (৫৭), রুনুঝুনু (৮৯)। থর থর (১৩৯), ঢল ঢল (১৪৩), ছট ফট (১৫৪) ঝনন রনন (১৩৭), উড়ুউড়ু আনছান (১৩৮) প্রভৃতি।

পদান্তে বা পর্বান্তে কিছু কিছু অপরিচিত ধ্বনি মিলের ব্যবহার করেছেন বলরামদাস। এসবক্ষেত্রে শব্দগুলিকে মিলের জন্য ইচ্ছামত গড়ে নিয়েছেন কবি। যথা ঃ নিন্দন - ছন্দন, কদন - সদন (১০), ফোড়ই - তোড়ই (১৫৯) আমি - তপাসি (২৮), শঙ্কা-বঙ্কা (১৬৫), গায়নি - বায়নি, দোলনি - বোলনি (১৩৭), প্রেমা-মধুরিমা (১৭৩) প্রভৃতি। অন্যান্য কবিদের মতো বলরাম - দাসও কয়েকটি বিশেষ শব্দ ব্যবহারের প্রতি তাঁর প্রবণতা দেখিয়েছেন। যেমন, আনন্দের বাহক

হিসেবে শুক, শারি, কোকিল, (১৪৭, ১৪৮, ১৫০) রাধা বা কৃষ্ণের 'প্রেম'কে প্রকাশ করেছেন নানা উপমায় ও শব্দরূপকে, যথা ঃ প্রেম আমিয়া (১), প্রেমরতন ধন (২) প্রেমের ভান্ডার (৩), প্রেমভর গমন, প্রেমক সায়রে (৬), প্রেম ফল (১১), প্রেমের বন্যায়, প্রেমনাম ধন (১৩), প্রেম নদী (১৭) প্রেম আনন্দ (২৩), প্রেম ফান্দে (২৪) প্রেমরস (৩৩), প্রেমের তরঙ্গ (১২৮), পরান পুতলি (১১৬, ১২৩ প্রবৃতি)। এছাড়া, কুঞ্জ, মঞ্জির, গোকুল চাঁদ। প্রভৃতি শব্দাবলীর বহুল প্রসঙ্গ-প্রয়োগ দেখি তাঁর পদাবলীতে।

বলরাম দাস : ছন্দ

ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্রজবুলি ভাষার পদে কলাবৃত্ত রীতি এবং বাংলা - পদে মিশ্রবৃত্ত রীতি অনুসরণ করেছেন বলরামদাস। প্রথমে কলাবৃত্ত রীতির একপদী বন্ধের আলোচনা করছি। যথা ঃ

সখি নাহি। বোলহ। আর।
হাম ফল । পায়লুঁ। তাঁর।।
সহজেই। গতিমতি। বাম।
তৈছন। ইহ পরি। নাম।। (১০৪ নং পদ, পৃ. ৭৫৯)

উপরোক্ত দশ মাত্রার একপদী বন্ধে তিনটি পর্বে চার - চার - দুই (৪। ৪। ২।)ক্রমে ছন্দোবন্ধ লক্ষিত হয়। কিন্তু শেষ অপূর্ণ পর্বের স্বরান্ত উচ্চারণ করলে এবং দীর্ঘস্বরে (আ) রুদ্ধদলের দু' মাত্রা ধরলে ছন্দোবন্ধটি এগার মাত্রার একাবলী ছন্দে রূপান্তরিত হয় এবং চার - চার - তিন (৪। ৪। ৩।) পর্বমাত্রিক গঠন হয়।

কলাবৃত্তের একপদী বন্ধে তিন পর্বিক বারো মাত্রার চার - চার - চার (৪। ৪। ৪।) মাত্রা সাম্যের পদও লক্ষিত হয়। যথা ঃ

হেরতহি। করুকত। আদর।
পিরিতি বःরিখ করু। বাদর।।
পুছইতে। কুশল তোঃ হারি।
মুগধিনী। কহই না। পারি।। (পদ নং ৬৯, পৃ - ৭৪৯ - ৫০)

লক্ষণীয় যে এখানেও শেষ পর্বে দীর্ঘস্বরের দু' মাত্রা ধরা হয়েছে। হ্রস্বস্বরেও প্রয়োজনে দু' মাত্রা ধরা হয়েছে। এই পদটিতে পরবর্ত্তী অংশে মাত্রা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বন্ধেও বৈচিত্র্য আসছে। যথা ঃ

মাধব। কোনে কঃহব তচ্ছু। কাহিনী।
রসবতী। কোটি নায়িকা শিরো। মণি।। (ওই)

ছন্দোসাম্য রক্ষার্থে 'কাহিনী'র মতো 'মণি'তে লঘুস্বরেও দু' মাত্রা ধরা হয়েছে। এই অংশে মাত্রাসংখ্যা বারো থেকে ষোলতে চলে এসেছে। এবং পর্বগঠন হয়েছে চার - চার - চার - চার (৪। ৪। ৪। ৪।) ভঙ্গিতে। এই অংশটি আট - আট (৮।। ৮।) পদ মাত্রা ভাগে দ্বিপদীতেও পাঠ করা যায়। পদটির পরবর্ত্তী অংশে আবার পূর্ব্বাংশের মতো বারো মাত্রা ফিরে এসেছে। যথা ঃ

জানলু। আদর। রাই।
কহল কুঃশল থির। নাই।। (ওই)

অপূর্ণ পর্বে 'রাই', 'নাই' শব্দে হ্রস্ব স্বরেও দীর্ঘ উচারণে দু' মাত্রা ধরা হয়েছে। এখানে মাত্রা

123

সংখ্যা তিন পর্বে বারো (৪।৪।৪।)। এইভাবে একই পদে মাত্রা সংখ্যা - মাত্রাভাগে ও ছন্দোবন্ধে বিভিন্নতা বলরাম দাসের পদবলীতে দৃষ্ট হয়। এতে কাব্য পাঠেও বৈচিত্র্য এসেছে।

কলাবৃত্তের দ্বিপদীবন্ধের বেশী পদ বলরামদাসের পদে লক্ষিত হত না। দ্বিপদী বন্ধের মাত্রা গণনাতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। যথা ঃ

সাজল। রসবতি।। সহচরী। সঙ্গ।
মনমথ। সমর ম।। নহি মন। রঙ্গ।।
কালিন্দী কূলে নি।। কুঞ্জক। মাঝ।
রঙ্গ ভুঃমি অতি।। সুললিত। সাজ।। (৯০ নং পদ, পৃ-৭৫৫)

এখানে পদমাত্রাভাগ আট-আট (৮।।৮।) ভঙ্গিতে। শেষের অপূর্ণ পর্বে মাত্রাসাম্য রক্ষার্থে রুদ্ধদলের দু' মাত্রার গুরু উচ্চারণের সঙ্গে হ্রস্বস্বরের মুক্তদলেও প্রসারিত উচ্চারণে দু' মাত্রা ধরা হয়েছে। তাই 'সঙ্গ' 'রঙ্গ' প্রভৃতি অংশে গুরু-গুরু ভাবে চারমাত্রার ধরা হয়েছে। যেমন - সঙ্গ > সং (দু' মাত্রা) - গ অ (দু' মাত্রা)। উচ্চারণের সময় শ্রুতিধ্বনিতে এ পার্থক্য ধরা পড়ে।

দ্বিপদীর নিম্নোক্ত বন্ধটিতেও অপূর্ণ অংশে গুরু - লঘু - লঘু ক্রম গৃহীত হয়েছে। যথা -

গৌর মঃনোহর ।। নাগর। শেখর।
হেরইতে। মুরছই।। অসীম কুঃসুম শর।।
কাঞ্চন। রুচিতর।। রুচির কঃলেবর।
সুখ হেরি। রোয়ত।। শব্দ সুঃধাকর।। (৯ নং পদ)

এখানে 'শেখর', 'কলেবর' প্রভৃতি অপূর্ণ পর্বাংশে প্রথমটি দীর্ঘস্বরে গুরু উচ্চারণে দু' মাত্রা এবং পরবর্তী অংশে লঘু - লঘু বর্ণ ক্রমে দু' মাত্রা করে ধরা হয়েছে। এখানেও মাত্রা সংখ্যা ষোল। বন্ধ ক্রম আট -আট (৮।।৮।) ।এখানে প্রাচীন পদাকুলকের ষোল মাত্রায় চার - চার- চার - চার (৪।৪।৪।৪।)মাত্রাভাগের প্রভাব স্পষ্ট।

কলাবৃত্তের ত্রিপদী বন্ধের বৈচিত্র্যও বলরামদাসের পদে লক্ষণীয়। যথা ঃ—

কুসুমে খচিত। রতনে রচিত।
চিকন চিকুর বন্ধ।
মধুতে মুগ্ধ সৌরভে লুবধ
খুবধ মধুপবৃন্দ।। (১০ নং পদ)

কলাবৃত্তের এই লঘু ত্রিপদীবন্ধে মাত্রাভাগ ছয় - ছয় - নয় (৬।.৬।।৯।)। ছন্দসাম্য রক্ষার্থে দ্বিতীয় পংক্তিতে 'সৌরভে' শব্দে রুদ্ধদল সত্ত্বেও একমাত্রা ধরে তিনমাত্রা গণনা করা হয়েছে।

কলাবৃত্তের ত্রিপদী বন্ধে আট-আট-বারো (৮।।৮।।১২।) পদমাত্রা ভাগেরও দৃষ্টান্ত পাই। যথা ঃ—

রাই মুখ পঙ্কজ।। কুঙ্কুমে মাজল।।
বসনহি পুলক অগোর।
নিরমিত সিন্দর যতনে নিবারই
নীঝর নয়নক লোর।। (১৪০ নং পদ)

এখানেও শেষ পদে অ - 'গোর', 'লোর' শব্দে লঘুস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ ও দু'মাত্রা ধরে মাত্রা

সমতা রক্ষিত হয়েছে।

কোথাও কোথাও ত্রিপদীবন্ধে চকিতে সাত পদমাত্রা ভাগের ছন্দোরীতি ক্রম পড়েছে। বিদ্যাপতির সাত মাত্রার ছন্দ থাকলেও চৈতন্য পরবর্ত্তী পদকর্তাদের মধ্যে বলরামদাসের পদে এই বন্ধ পাই বিক্ষিপ্ত ভাবে। যথা ঃ

মিটল চন্দন।। টুটুল আভরণ।।
ছুটল কুন্তল। বন্ধ।
অম্বর খলিত গলিত কুসুমাবলি
ধুসর দুহুঁ মুখ চন্দ।। (পদ নং ৭২)

এখানে প্রথম পংক্তিতে সাত - সাত - দশ (৭।৭।। ১০।) পদমাত্রাভাগ লক্ষিত হয়। কিন্তু পরবর্তী পংক্তিতে সাত - নয় - এগার (৭।। ৯।। ১১।)। পদভাগে 'নরেন্দ্রবৃত্ত' ছন্দোবন্ধ এসে পড়ছে বলে মনে হয়।

কলাবৃত্তের চৌপদীবন্ধও বলরামদাস অনেক পদে প্রয়োগ করেছেন। যথা ঃ—

নাচত গৌর সুঃনাগর মনিয়া
খঞ্জন গঞ্জন।। জগজন রঞ্জন।।
রণরণি মঞ্জীর।। মঞ্জুল শুনিয়া।।
সহজই কাঞ্চন।। কাঁতি কঃলেবর
হেরইতে জগজন - মন- মো-হনিয়া। (পদ নং ৬. পৃ. ৭৩২)

এখানে প্রথম পংক্তিতে আট - আট দ্বিপদীবন্ধ থাকলেও পরবর্ত্তী পংক্তিগুলিতে আট - আট - আট - আট (৮।। ৮।। ৮।। ৮।) চৌপদী মাত্রাভাগ লক্ষনীয়।

কলাবৃত্তের দীর্ঘ চৌপদীবন্ধের রূপও বলরামদাস সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর পদাবলীতে। যথা ঃ

বিহরে আজু রসিক রাজ।।
গৌর চন্দ্র নদীয়া মাঝ।।
কুঞ্জ কেশর পুঞ্জ উজোর।।
কনক রুচির কাঁতিয়া।

কোটি কাম রূপ ধাম
ভুবন মোহিনী লাবণি ঠাম
হেরত জগত যুবতি উমতি
ধৈরজ ধরম ঘাতিয়া।। (পদ নং ১, পৃ. - ৭৩১)

এখানে পদমাত্রাভাগ বারো - বারো - বারো - দশ (১২।। ১২।। ১২।। ১০।)। পর্বান্তে ধ্বনি মিলের জন্য পদটিতে শ্রুতি মাধুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

শেষ অপূর্বর্ণ পর্বের সম্মোধনাত্মক তরঙ্গ দোলায় নিম্নোক্ত চৌপদী বন্ধের পদটিতে বলরামদাস বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। যথা ঃ—

নটবর নব কিশোর রায়।।
রহিয়া রহিয়া যায় গো।

125

ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে।।
ধূলি ধূসর শ্যাম অঙ্গে।।
হৈ হৈ হৈ বোলত ঘন।।
মধুর মুরলী বায় গো।। (৪৭ নং পদ, পৃ - ৭৪৩)

এখানে প্রথম পংক্তির পদমাত্রা ভাগ বারো - আট - দুই (১২।। ৮।। ২।) দ্বিপদীতে। পরবর্তী অংশে বারো - বারো - বারো - আট - দুই (১২।। ১২।। ১২।। ৮।)-এর চৌপদীতে। শেষ দুই মাত্রায় ছন্দে এসেছে নতুন তরঙ্গদোলা। ফলে পদপাঠে নতুনত্ব সঞ্চারিত হয়েছে।

মিশ্রবৃত্তের ত্রিপদী বন্ধেরও বেশ কিছু পদ বলরাম দাস রচনা করেছেন। যথা ঃ—

অঙ্গে অঙ্গে মণি। মুকুতা খেচনী।।
বিজুরী চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা।। সহজে চপলা।।
মদন মুরছা পায়।। (১১০ নং পদ, পৃ - ৭৬০)

পদটিতে ছয় - ছয় - আট (৬।। ৬।. ৮।) মাত্রাভাগের লঘু ত্রিপদী বন্ধ অনুসৃত। 'মুকুতা', 'মুরছা' - শব্দ দুটিতে স্বরভক্তি উচ্চারন - মাধ্যমে কলামাত্রার বৃদ্ধি করে ছন্দে মাত্রা সমতা রক্ষা করা হয়েছে।

মিশ্রবৃত্তের আর একটি ত্রিপদীবন্ধ আট - আট - দশ (৮।। ৮।। ১০।) পদমাত্রাভাগ অনুসৃত। যথা—

তোমরা কে বট ধনি।। পরিচয় দেহ আগে জানি।
এ হেন বিনোদ সাজে।। কোথা যাব কোন কাজে
বল বল বলগো তা শুনি।।
কমল বদন খানি চরণ কমল জিনি
কমল লোচনী কমলিনী (১৩৫ নং পদ, পৃ - ৭৬৬)

মিশ্রবৃত্ত - ত্রিপদীর নিম্নোক্ত পদটিতে বৈচিত্র্য দেখা যায়। যথা ঃ-

রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
হেলিয়া পড়িছে বায়।
অঙ্গ মোড়া দিয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া
ফিরিয়া ফিরিয়া চায় (১০৭ নং পদ. পৃ - ৭৫৯)

বাংলা ভাষার পদে বলরামদাস মিশ্রবৃত্ত ছন্দোরীতিরই ব্যবহার করেছেন। দশ মাত্রার দ্বিপদী বন্ধের এই পদটিতে পর্বমাত্রা ভাগের লক্ষন এবং একপদী বন্ধের ইঙ্গিত দেখা যায়। যথা ঃ-

হেথা দুতী। রাই সনে।। ছিলা।
শ্যাম চান্দে। দেখিতে পাঃইলা।
রাইয়েরে দেঃখায় শ্যাম।। চান্দে।
হেরি রাই। ফুকারিয়া।। কান্দে।। (৬৪ সং, পৃ - ৭৪৮)

এখানে পদভাগ আট - দুই (৮।। ২।)। পর্বভাগ চার- চার - দুই (৪। ৪। ২।) বলরামদাস যে ছন্দ নিয়ে সচেতনভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এই পদটি তার প্রমাণ - স্বরূপ। মিশ্রবৃত্তে এই ধরনের প্রয়াস অভিনব। ১১৩ সংখ্যক পদেও (সং পৃ - ৭৬৯) এই বন্ধ বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়।

প্রচলিত দ্বিপদী পয়ার বন্ধেরও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার বহু পদে লক্ষিত হয়। যথা ঃ-

ব্রজবাসি জন কান্দে। ধেনু বৎস শিশু।
কোকিল ময়ুর কান্দে। কত মৃগ পশু।।
যশোদা রোহিণী দেহ।। ধরনে না যায়।
সবে মাত্র বলরাম।। প্রবোধে সভায়।। (৫৬ নং, পৃ - ৭৪৫)

এখানে পদমাত্রা ভাগ আট - ছয় (৮।। ৬।) ক্রমে।

১১৪ নং পদটিতে (পৃ - ৭৬১) লঘু পয়ার বন্ধ ও সাধারণ পয়ার বন্ধ পর্যায় ক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ঃ-

কত নারী। আছয়ে গোঃকুলে।
অভাগিনী আমার কলঙ্ক হইল কুলে।
ঘৃতের প্রদীপ মাঝে কার।
কি জানি না জানিয়া ঢালিনু তৈলধার।।

প্রথম পংক্তিতে আট - দুই (৮।। ২।), পরের পংক্তিতে ব্যবহৃত পয়ার আট - ছয় (৮।. ৬।) বন্ধ।

এখানে প্রথম পংক্তিতে পাঁচ - পাঁচ - আট (৫।। ৫।। ৮।) পদ মাত্রাভাগের ত্রিপদীবন্ধ ও দ্বিতীয় পংক্তিতে ছয় - ছয় - আট (৬।। ৬। ৮।) পদমাত্রাভাগের লঘু ত্রিপদী বন্ধ ব্যবহৃত। মোট দশ পংক্তির এই পদটিতে প্রথম, পঞ্চম ও নবম পংক্তিতে ৫।। ৫।। ৮। বিভাগ এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও দশম পংক্তিতে ৬।। ৬।। ৮। পদমাত্রা বিভাগ ব্যবহৃত। এখানে ও বলরামদাসের শিল্পী মন নতুন ছন্দ - আঙ্গিকে বেছে নিয়েছে। পাঁচ মাত্রার পদভাগের মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদী ছন্দোবন্ধ ও তাঁর অভিনব প্রয়াস রূপে চিহ্নিত হবার যোগ্য।

বলরাম দাস : অলঙ্কার

অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বলরাম দাস স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রেখেছেন। শব্দালঙ্কার সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি প্রধানত ঃ জোর দিয়েছেন ধ্বনি অনুপ্রাসের প্রয়োগে। যথা ঃ—

গৌর মনোহর নাগর শেখর।
হেরইতে মুরছই অসীম কুসুমশর।।
কাঞ্চন রুচিতর রুচির কলেবর।
মুখহেরি রোয়ত শরদ সুধাকর।। (৯নং পদ, পৃ - ৭৩৩)

এখানে 'র' বর্ণের পদান্ত অনুপ্রাস ছাড়াও প্রথম পংক্তির শব্দান্তিক 'র'-এর ধ্বনি অনুপ্রাস এক বিচিত্র গতিশীল তরঙ্গ সঞ্চার করেছে।

পদান্ত মিলের সাহায্যে সুন্দর ধ্বনি আবর্তন সৃষ্টি করেছেন নিম্নোক্ত পদে। যথা ঃ

মধুতে মুগধ সৌরভে লুবধ
খুবধ মধুপ বৃন্দ।

অপাঙ্গ ইঙ্গিতে ভাঙর ভঙ্গিতে
অনঙ্গ রসিত সঙ্গ। (১০ নং পদ, পৃ - ৭৩৩)

কঞ্জ চরণ খঞ্জন গঞ্জন

মঞ্জু মঞ্জীর ভাষ। (ওই, পৃ - ৭৩৪)

এখানে প্রথম পংক্তিতে 'ম, গ, ধ,' দ্বিতীয় পংক্তিতে 'ঙ্গ, ভ, ত', এবং তৃতীয় পংক্তিতে 'জ্ঞ, ন, ম' বর্ণ বা যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের ধ্বনি অনুপ্রাস ছাড়াও' মুগ্ধ, লুব্ধ, খুব্ধ', 'ইঙ্গিতে, ভঙ্গিতে, রঙ্গিত' এবং 'কঞ্চ, খঞ্চ, মঞ্জু' প্রভৃতি শব্দের অনুপ্রাস পদটিকে ধ্বনি মাধুর্যের আধার করেছে।

৬৩ সংখ্যক পদটির (ওই, পৃ ৭৪৭-৪৮) প্রায় সব পংক্তির শুরুতেই আছে 'চ' বর্ণ ভিত্তিক শব্দ। ফলে 'চ' এর কচকচির সঙ্গে শ্রুতিমাধুর্যও সৃষ্টি হয়েছে। যথা ঃ—

সখি শ্যাম আকুল তুয়া লাগি।
চারু চিকন ঘন তনুরুচি জারণ
চন্ড বিরহে জ্বলু আগি।।

এখানে 'চ'-এর ধ্বনি অনুপ্রাস ছাড়াও কৃষ্ণের অনুবরুদ্ধ প্রণয় বিচ্ছেদ প্রকাশে 'চন্ড বিরহ' উপমাযোগ অভিনব ব্যঞ্জনা দান করেছেন পদটিকে।

৭২ নং পদে (ওই, পৃ-৭৫০) বৃত্ত্যনুপ্রাস ও ছেকানুপ্রাসের সুন্দর প্রয়োগ দেখা যায়। যথাঃ

মিটল চন্দন টুটল আভরণ
ছুটল কুনতলবন্ধ।
অম্বর খলিত গলিত কুসুমাবলি
ধূসর দুহুঁমুখ চন্দ।।

যুগল বিলাসের এই পদটিতে 'মি-টল-টু-টল-ছু-টল'-র মধ্যে বৃত্ত্যনুপ্রাস এবং 'খলিত-গলিত' -তে ছেকানুপ্রাস হয়েছে। এছাড়া উদ্ধৃতাংশের প্রায় সব শব্দেই 'অ' স্বরান্ত উচ্চারণ হেতু একটা স্থিরতা দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে 'ন্দ' ন্ত, ন্ধ, ন্ব, প্রভৃতি নাসিক্য যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহারে একটা ধ্বনি গাম্ভীর্য ও স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে। বিলাসের প্রবলতার পরে পরেই নায়ক নায়িকার ক্লান্তি ফুটিয়ে তুলেছেন কবি অসামান্য দক্ষতায় 'ধূসর' শব্দ প্রয়োগ করে।

অনুরূপভাবেই ৮৩ নং পদে (পৃ - ৭৫৩) রাধার দলিত-ক্লিষ্ট মুখের ক্লান্তির মলিন ছবি ফুটে উঠেছে 'ল, ম, ন'-র ধ্বনি অনুপ্রাসের কোমলতার সঙ্গে 'ত'র কাঠিন্য সংযোজিত হয়ে। যথা ঃ

দলিত - নলিন - সম মলিন বদন ছবি
অধরহি খন্ড বিখন্ড।

'নলিন-মলিন,' 'খন্ড-বিখন্ড'-এর মধ্যে ছেকানুপ্রাস লক্ষণীয়। রাসলীলার নিম্নোক্ত পদটিতেও রাধা-কৃষ্ণের লীলা চঞ্চলতা মূর্ত হয়েছে ধ্বনি ঝংকারে।

নুপুর ঘুঙ্গুর মধুর বোল
ঝনন রনন নটন লোল
হাসি হাসি কেহ করত কোন
ভালি ভালি বোলনি (১৩৭ নং, পদ. পৃ - ৭৬৭)

পুনঃ পুনঃ তরঙ্গাঘাত সৃষ্টি হয়েছে 'র, ন, ল'-র ধ্বনি অনুপ্রাসে, শব্দান্তিক ও পদান্তিক মিলের মাধ্যমে।

অর্থালঙ্কারের ক্ষেত্রে কবি প্রচলিত উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতিই বেশি ব্যবহার করেছেন।

যথা ঃ-

বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী।
দারুণ শাশুড়ি মোর জ্বলন্ত আগুনি।।
শাণান ক্ষুরের ধার স্বামী দুরজন। (১২৭ নং পত, পৃ - ৭৬৪)

রাধার চোখে শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়দের স্বরূপ উপমার মাধ্যমে কবি তুলে ধরেছেন। ননদিনী তাঁর কাছে বিষের চেয়েও জ্বালাকারি এবং পাপী। তার শাশুড়ি হচ্ছে প্রজ্বলন্ত অগ্নিতুল্য দহনকারী ও নিদারুণ। উপরন্তু স্বামী দুর্জন তুল্য। সম্ভবতঃ তাঁর কথাবার্তা শান দেওয়া ক্ষুরের মতোই ধারাল এবং হৃদয় বিদারক। কবির সমাজ জীবন সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত পাই উপরোক্ত উপমা প্রয়োগের ব্যাপারে। চৈতন্য - উত্থিত কৃষ্ণ প্রেমধারার সর্বব্যাপি প্রকাশ নিম্নোক্ত রূপকটির মাধ্যমে কবি ব্যক্ত করেছেন। যথা ঃ

প্রেমের বন্যা নিতাই হৈতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে
চৈতন্য - বাতাসে উথলিল। (৩৪ নং পদ, পৃ - ৭৪০)

নিত্যানন্দরূপ প্রেমবন্যা অদ্বৈত রূপ তরঙ্গ এবং চৈতন্য রূপ বাতাসে উত্তাল হয়ে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে স্বর্গ - মর্ত্য - পাতালে ধাবিত। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রূপকটি অভিনব তাৎপর্য পেয়েছে।

১৫৮ নং পদে (ওই, পৃ. ৭৭২) দেখি মথুরা পুরিতে রাধা তাঁর বিরহ দুঃখ বার্তা লিখে পাঠাতে চান। এক্ষেত্রে তাঁর মনকেই তিনি লেখনি করেছেন। হৃদয় রূপ কাগজে তাঁর বেদনা - ক্ষত জীবন - ভাষ্য লিখবেন মসীঘট রূপ আঁখিতে তথা অশ্রুরূপ কালিতে। এখানেও অলঙ্কার রূপক। কবি সুকৌশলে অলঙ্কার নির্মাণ করেছেন। যথা ঃ

মনেরে লেখনি করি মসীঘট আঁখি।
কলিজা কাগজ করি যত দিব লিখি।।

আর একটি পদে দেখি মাথুর বিরহ - কাতর রাধার মূর্ত্তি যেন কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রতুল্য। দুই আঁখি নির্গত জলধারা যেন শ্রাবণ মেঘের বর্ষাণ। এখানে অলঙ্কার উৎপ্রেক্ষা। যথা ঃ

অসিত পক্ষের শশী যেন দিনে দেখি।
শ্রাবণের ধারা যেন ঝরে দুই আঁখি। (১৬০ নং পদ, পৃ - ৭৭২)

চমৎকার তদগুণ অলঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে ১৫৩ সংখ্যক পদে (পৃ. ৭৭১) যখন রাধা ও কৃষ্ণ পরস্পরের প্রতি চেয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত একে অপরের বর্ণ প্রাপ্ত হয়েছেন। অর্থাৎ নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত উভয়ের মনে এমনই সঞ্চারিত হয়েছে যে বর্ণবিপর্যয় ঘটে গেছে। শ্যাম হয়েছেন গৌরবর্ণ ও রাধা শ্যামাঙ্গী। যথা ঃ

দোঁহে দোঁহে হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি।
রাই ভেল শ্যামরী শ্যাম ভেল গোরি।।

এছাড়া বলরামদাসের বিভিন্ন পদে দেখি বিচিত্র রূপকের ব্যবহার। যথা ঃ- ১১ নং পদে (পৃ. ৭৩৪) গৌর - জলদ - অবতার, নাচত উনমত ভকত - ময়ূর, কীর্তন কুলিশ, করম - ভুজঙ্গ, ১৭ সংখ্যক পদে (পৃ. ৭৩৫) প্রেমরূপ নদী, ৭৬ নং পদে (পৃ. ৭৫১) প্রেমরূপ তরঙ্গ প্রভৃতি।

বলরাম দাস ঃ চিত্রকল্প

গৌরাঙ্গের অপূর্ব রূপচিত্র এঁকেছেন কবি এই পদাংশে। তাঁর কোঁচকানো কেশে জড়িয়ে

আছে মল্লিকার মালা আর সেই লোভে ভ্রমরের দল সেখানে মালার মত শোভা করে জড়িয়ে আছেন —

কুঞ্চিত কুন্তর বেড়ি মল্লিকার দাম।
তাহে ভ্রমরের মালা শোভা অভিরাম।। (১৭ সং, পৃ - ৭৩৫)

গৌরাঙ্গের কৃষ্ণ অবতার রূপ এবং তাঁর পূর্ব রূপের তুলনাত্মক চিত্র কবি এঁকেছেন এই পদে।

পূরবে বাঁধন চূড়া এবে কেশহীন।
নটবর বেশ ছাড়ি পরিলা কৌপীন।।
গাভী দোহন ভাণ্ড ছিল বাম করে।
করঙ্গ ধরিলা গোরা সেই অনুসারে।। (২২ নং পদ, পৃ - ৭৩৬)

এখানে, কৃষ্ণরূপ চূড়াবাঁধা নটবর বেশী, গাভীদোহনভাণ্ড হাতে মনমোহন রূপ গৌরাঙ্গ এখন মুন্ডিত মস্তক, কোপীনধারী, করঙ্গ দন্ড হাতে, সন্ন্যাসী রূপ।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠচিত্রের অপূর্ব রূপাঙ্কন করেছেন কবি। কৃষ্ণের সাজ সজ্জায় রাখাল বালকের পরিচয় না ফুটলেও মাতৃহৃদয়ের উদ্বেগাকুল স্নেহাতুর চিত্রটি লক্ষণীয়—

কপালে রচিঞা দিল চন্দনের রেখা।
চূড়াটি বান্ধিঞা দিল ময়ুরের পাখা।।

কাছিঞা পরাএ পীত ধটি কটি মাঝে।
দুগাছি নুপুর দিল চরণ পঙ্কজে।।
না চলিতে চুয়ে ঘাম শ্রীমুখ কমলে।
পুন পুন মোছে রানী নেতের আঁচলে।। (৪৪ নং, পৃ - ৭৪৩)

খন্ডিতা রাধার অপূর্ব চিত্রাঙ্কন করেছেন কবি। পরনারী ভোগ্য কৃষ্ণকে দেখে তীব্র বাক্যবাণে জর্জরিত করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর নিজের অবস্থা বড় সঙ্গীন। সেই সঙ্গীন অবস্থা চিত্রিত হয়েছে তাঁর ভারসাম্যহীন টলমল পদক্ষেপের নুপুর নিক্কনে। যথা ঃ

টলমল চরণ যুগল মণিমঞ্জির
ঝনর ঝনর ঝন বাজে। (৯৮ সংখ্য, পৃ - ৭৫৭)

'ল, ম, র, ন, ঝ' এর ধ্বনির অনুপ্রাসও রাধার এই টালমাটাল অবস্থাকে তরান্বিত করেছে। রূপানুরাগের এই চিত্রে দেখি রাধাকৃষ্ণের নয়ন - ইঙ্গিতে মুগ্ধ। কৃষ্ণের ব্যঞ্জনাপূর্ণ দৃষ্টিতে রাধার তরঙ্গিত মনের সঙ্গে প্রাণও যেন দোলায়িত ঃ

কত ছাঁদে নয়ন ঢুলায়।
মন সনে পরাণ দোলায়।। (১১১ নং, পৃ - ৭৬০)

আমাদের কল্পনায় চামর (ছত্র) ঢুলানোর চিত্র আসে, কিন্তু নয়নকেও যে ঢুলানো যায় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কবি। চামর ঢুলানোয় আশে শান্তি, আর নয়ন ঢুলানোয় এসেছে মনের বিক্ষোভ। 'ঢুলানো' ব্যাপারটিতে অপূর্ব অর্থবৈচিত্র্য দান করেছেন কবি উপরোক্ত চিত্রকল্পনায়।

১১৬ নং পদটিতে দেখি (পৃ. ৭৬১) রাধার বুকে তুষের আগুন জ্বলছে কৃষ্ণের বাঁশী শুনে। আর তাঁর মধুর বচন শুনে রাধার মনে প্রাণে জেগেছে হিল্লোল। যথা ঃ

বাঁশীর ফুকে বুকের ভিতরে

তুষের আগুন জ্বলে।
মধুর বচনে হিয়ার হিল্লোল
পরাণ পুতলি দোলে।।

এই চিত্রকল্পটিতে কবি রাধার ইন্দ্রিয় বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়েছেন। বাঁশীর দুর্মর আহ্বানে তাঁর অন্তরে প্রেমের দহন চলছে। শ্রবণ থেকে মনে এই দহন তুষাগ্নির মত অন্তঃবাহী। আবার প্রেমাস্পদের মিষ্টি কথায় তাঁর প্রাণে জাগে উল্লাস। এখানেও দর্শন-শ্রবণ থেকে মনে সঞ্চারিত হয় খুশীর আবেশ। একদিকে জ্বালা অন্যদিকে প্রশান্তি দু'য়ে মিলে রাধাকে বিপর্যস্ত করেছে কবির কল্পনায়।

রাধার দ্বাদশ মাসিক বিরহের পদে কবি বলরামদাস নিসর্গ পটভূমিকে চিত্রকল্পের মাধ্যমে পরিস্ফুট করেছেন। যথা ঃ

পিকু - অলি - কাকলি - কুসুম - লতাবলি
দিনে দিনে জিউ করু অন্ত।।
বিকশিত কুসুম ভরল সব কানন
চৌদিশে ভ্রমর - ঝঙ্কার।
তরু পর কোকিল পঞ্চম গায়ই।
নিশি দিশি জীবন জার।।

(১৬৫ নং পদ. পৃ - ৭৭৪)

চৈত্র বিরহে নিসর্গের পটভূমিটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ময়ূর আর মৌমাছির কল-কাকলি বনভূমি মুখরিত করছে। লতায় লতায় ফুটেছে ফুল যা প্রকৃতিকে সাজিয়ে দিয়েছে। নবোদ্ভুত বিকশিত ফুলের চারদিকে ঘিরে ভ্রমরের গুঞ্জন ঝঙ্কার শ্রুত হচ্ছে। বৃক্ষে উপবিষ্ট কোকিলও কুহু স্বরে ডেকে চলেছে এই সুন্দর পরিবেশে। বসন্তের এই মাতাল আনন্দের মাঝে রাধার জীবনই শুধু বিরহদুঃখে জারিত হচ্ছে। প্রকৃতির মিলন চিত্রে যে নিবিড় আনন্দ জোয়ার, রাধার বিরহকে হৃদয়বিদারী বৈপরীতে তা উপস্থিত করেছে। এখানে কবি ভাবের মধ্যে বিসদৃশতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

গ্রন্থসূত্র

১। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : বৈষ্ণব পদবলী (সাহিত্য সংসদ, ১৩৮৬) পৃ-৭৩১। পার্শ্বস্থ সংখ্যা পদসংখ্যা সূচীত করে।

বাসুঘোষ : ভাষা ব্যবহার

পূর্ববর্তী মহাজন পদকর্তাদের পদাঙ্কানুসরণ করে বাসুঘোষ ও তাঁর পদ রচনায় ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় রীতিই গ্রহণ করেছেন। ছন্দের মাত্রা সমতা রক্ষাকল্পে এবং কাব্যভাষায় শ্রুতিমাধুর্য অনায়নে বহু শব্দের স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ-রূপ গ্রহণ করেছেন। ধ্বনি পরিবর্তনের এই সূত্রটি ব্রজবুলি পদেই বেশি ব্যবহৃত। বহু উল্লেখিত শব্দগুলি হল—

বজর[১] (৮০ নং পদ), জরজর (ওই, ২৮, ৮৫, ৮৬ প্রভৃতি সংখ্যক), স্বপন (ঐ, ৯৭ নং), দরপণ, সিরজিল (ওই, ২৭ নং), পরশংগ (ওই, ৩৫ নং), নিরমল (ওই, ২১ নং), জনমের (ওই, ৮৭ নং), ভরমে (ওই, ৪৫ সংখ্যক), করমের (ঐ, ১১৮ নং) সিনান (ওই, ১০১ নং) ইত্যাদি।

কোন কোন স্থলে বর্ণ বা স্বরাগমের সাহায্যে ও ভাষায় ছন্দে সামঞ্জস্য বিধান বা পদান্তমিল সৃষ্টি করার প্রয়াস লক্ষিত হয় বাসুঘোষের পদাবলীতে। যেমন ঃ—

'কন্যার' সঙ্গে পদান্ত মিল হেতু এসেছে 'ধন্যা' (১৭ নং পদ ওই) শব্দ। তেমনি, গোরা - 'ভোরা' (ঐ ২১ নং), 'মনে মনে' - নয়নে (ওই ৪৯ নং) জনা - কাঁদনা' (ওই ২৮ নং) প্রভৃতি।

বর্ণ বা স্বরলোপের সাহায্যেও কবি ছন্দের সঙ্গতি বিধানে বা শ্রুতিধ্বনিতে সামঞ্জস্য দান করেছেন। যথা ঃ

বিনামূলে (ওই, ৮৯ নং), অতমিত (ওই, ১১১ নং), চিত (ওই, ১০২ নং পদ) প্রভৃতি।

অনেক পদে দেখা যায় যে, শ্রুতিমাধুর্য হেতু বা শব্দমিল-সৃষ্টিতে স্বরসঙ্গতি প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন ঃ

মিলল (ওই , ১১ নং), ভুলল (ওই ৪৫ নং), ধীরি ধীরি (ওই ৫৬ নং), সাধিলি (ওই ৮৩ নং), কেনে (ওই, ৯৯ নং) ইত্যাদি। ধ্বনি পরিবর্তনের মতো শব্দরূপের ও বৈচিত্র্য বাসুঘোষের পদে লক্ষিত হয়। পদাবলীর গঠনসুষমা, ছন্দোমাত্রায় সমতা সামঞ্জস্য বিধানে বা পর্ব - পদের ধ্বনি মিল বিন্যাসের জন্য বহু শব্দ চিরায়ত প্রথা যুক্ত হয়েছে। যথা ঃ

বিশেষ্যপদে অর্থবিহীন 'য়া' 'উয়া' প্রত্যয় যোগ করে অনেক সময় ছন্দমাত্রায় সমতা রক্ষা করার প্রবণতা দৃষ্ট হয়-'গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া' ৪নং পদ, পৃ-১৬২), এই রকম ভাবে এসেছে - 'পুতলিয়া দিনমনিয়া, সুধবনিয়া, ধনিয়া' প্রভৃতি (৯ নং পদ, পৃ-১৬৩), 'দ্বিজমনিয়া' (৭০ নং, পৃ-১৭৪), 'ডগমগিয়া' (৭১ নং, পৃ-১৭৪), 'বন্ধুয়া', ইন্দুয়া, সিন্ধুয়া, সানন্দুয়া (২৩ নং, পৃ-১৬৬) প্রভৃতি। বিশেষণ পদে দেখা যায় প্রধানত ঃ ''ইয়া'' প্রত্যয়ান্ত শব্দ। যথা ঃ

''ধূসরিয়া'' (১ নং, পৃ-১৬৩), ''নিধনিয়া'' (৮৪ নং, পৃ-১৭৭) ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়ার ভাব বোঝাতেও ''ইয়া'' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়েছে, অবশ্য বর্তমান সময়েও এর প্রচলন রয়েছে। যেমন ঃ

''কচালিয়া'' (৫৬ নং, পৃ-১৭২), ''সোঙারিয়া'' (১৫, ২৬, ৭১ নং ইত্যাদি) অনেক স্থলে ''ইয়া'' ছাড়া ''এগা'' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। যথা ঃ

''মুছাএগা'' (২০ নং পদ), ''লোটাএগা লোটাএগা'' (৮২ নং), ''ভাসাএগা'' (৮২, ৯০ নং ইত্যাদি), পাএগা (৬ নং), মিশাএগা (৯৭ নং)। পাএগা (২৮ নং), নাচাএগা (৬৬ নং) প্রভৃতি। এর মধ্যে দিয়ে তৎকালীন কথ্য রূপটির পরিচয় ভেসে আসে।

উত্তম পুরুষের ক্রিয়া বোঝাতে ''লুঁ'' প্রত্যয় ব্যবহৃত। এটিও পূর্ব্বোক্ত পদকর্তারাও করে গেছেন। যথা ঃ ''চঢ়ায়লুঁ'' (৪২ নং), ''দেয়লুঁ'' (ওই), ''বনাইলুঁ'' (৪৫ নং) প্রভৃতি। তেমনি

একই অর্থ প্রকাশে "নু" প্রত্যয়েরও ব্যবহার দেখি। "নু" প্রতয়ান্ত ক্রিয়াপদে কবির আত্ম-আবেগ ও ব্যাকুলতার স্ফুরণ যেন বেশী বলে মনে হয়। যথা ঃ 'তেয়াগিনু' (৫৮ নং), বিছাইনু (৪৭ নং), তেজিনু (৫২ নং) প্রভৃতি।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বাসুঘোষ গতানুগতিক শব্দমালাকেই বেছে নিয়েছেন। তথাপি কাব্যে তারা নতুনত্ব ও ধ্বনিঝঙ্কার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে প্রয়োগ-নৈপুণ্য হেতু। যথা ঃ

'ঢুলু ঢুলু' (১০৮ নং), 'লঘুলঘু' (১৪ নং)। 'হুলাহুলি' (৪০ নং) প্রভৃতি। একেবারেই কথ্যভাষা ঘেঁসা বা লোকায়ত গ্রাম্য চলতি অনুকারাত্মক শব্দাবলীও তাঁর কবিভাষায় স্থান করে নিয়েছে। যথা ঃ

'আলু থালু, ইতিউতি' (৮১ নং), 'থরহরি' (৩৮ নং), 'হাবুডুবু' (১৭ নং), 'নিঙ্গাড়ি' (২৯ নং) ইত্যাদি। এই ধরণের কথ্য শব্দ তাঁর কবিভাষাকে জোরালো দিয়েছে।

বক্তব্য - প্রসঙ্গে প্রবাদ - প্রবচনের সাহায্যেও বাসু ঘোষ তাৎপর্য দান করতে চেয়েছেন। যথা ঃ গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ কালে বিষ্ণুপ্রিয়ার দেহের ডান পার্শ্ব ও ভান চক্ষু কম্পিত হচ্ছে। মেয়েদের কাছে ব্যাপারটি অর্থাৎ লক্ষণটি অমঙ্গল ও অশুভকারী। সুতরাং তাঁর আশঙ্কাতাড়িত হৃদয়টি এই প্রবচনে ব্যক্ত হয়েছে।—'নাচিছে দক্ষিণ অঙ্গ দক্ষিণ নয়ন' (৭৯ নং পদ, পৃ-১৭৬)। প্রায় একই প্রসঙ্গ এসেছে ৮০ নং পদে (পৃ-১৭৬)-'থাকি থাকি প্রাণ খে কাঁদে নাচে ডাহিন আঁখি'।

বাসুঘোষের রচনায় যে সমস্ত পদের বা পদগুচ্ছের ব্যবহারের প্রতি মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা হলো -'গুননিধি', 'নাগর', 'দ্বিজমণি', 'গৌরাঙ্গ গুণের নিধি', 'গোরাগুণ সোঙরিয়া', 'ভুমে দেয় গড়ি', 'গোরা নটরায়', 'পুলকে পুরল তনু', 'নদীয়া নাগর', 'পরাণ বিদরে', 'গোরা গুণমণি' প্রভৃতি।

বাসু ঘোষ : ছন্দ

বাংলা ও ব্রজবুলি - উভয় ভাষাঙ্গিকেই বাসুঘোষ পদ রচনা করেছেন। এবং বাংলা পদে মিশ্রবৃত্ত, ব্রজবুলি পদে কলাবৃত্ত রীতির প্রয়োগ করেছেন। বাংলা পদে ব্যবহৃত ছন্দোবন্ধগুলি হলো নিম্নরূপ ঃ

দ্বিপদী বন্ধ ঃ যথা —

সংকীর্তনে। নিত্যানন্দ।। নাচে।
প্রিয় পরিষদ গণ।। কাছে।।
গোবিন্দ মাধব ঘোষ।। গান।
শুনি কেবা। ধরয়ে পঃরাণ।। (১৫ নং পদ, পৃ - ১৬৪)

দশ মাত্রায় মিশ্রবৃত্তের এই পদটিতে কলাবৃত্তের মত পর্বভাগ প্রাধান্য লক্ষিত হয়। আট - দুই পদ মাত্রাভাগের (৮।। ২।) চেয়ে চার ÷ চার - দুই (৪। ৪। ২।) পর্বমাত্রা ভাগটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়। উল্লেখ্য যে, বলরাম - দাসের পদেও (৬৪ নং পদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ - ৭৪৮) এরকম বন্ধ দেখা যায়।

দ্বিপদী পয়ার বন্ধ ঃ যথা -

গোরা অভিষেক কথা।। অদ্ভুত কথন।
শুনিয়া পন্ডিত ঘরে।। ধায় ভক্তগণ।।

ধাওয়াধাই করি আসি।। নাচে কুতুহলে।
দুবাহু তুলিয়া জয়।। গোরাচাঁদ বলে।। (ওই, ১৯ নং, পৃ - ১৬৫)

এখানে মিশ্রবৃত্ত ছন্দের দ্বিপদী পয়ার বন্ধের আট - ছয় (৮।।৬।) পদ - মাত্রাভাগ দৃষ্ট হয়। তৃতীয় পংক্তিতে প্রচলিত চোদ্দ অক্ষর স্থলে পনের অক্ষর রয়েছে। তবে 'ধাওয়ধাই' শব্দটি সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে চার মাত্রা ধরা হয়েছে বলে মাত্রাসংখ্যার হেরফের ঘটেনি। পয়ার বন্ধের রূপ বৈচিত্র্যও বাসুঘোষের পদে দেখা যায়। যথা ঃ

বৃন্দাবনের লীলা গোরার।। মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরঃধুনীরে কহিল।।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবঃনের সমান।
সহচরগণ গোপী।। সম অনুমান।। (৭২ নং, পৃ - ১৭৪)

মিশ্রবৃত্তের এই পদটিতে প্রথম পংক্তিতে পদমাত্রা ভাগ হয়েছে দশ-ছয় (১০।।৬।) ভাগে। পরবর্ত্তী পংক্তিগুলিতে আট - ছয় (৮।।৬।) বন্ধ অনুসৃত। চতুর্থ পংক্তিতে আবার সাত - ছয় (৭।।৬।) পদভাগ দেখা যায়। সম্ভবতঃ গানের সময় মাত্রা পার্থক্য বিবেচ্য না হওয়ায় কবির ছন্দ সতর্কতার প্রয়োজন পড়েনি। অনেক স্থলে শিথিল প্রয়োগ দেখা যায়। যথা ঃ

কি করিব কোথা যাব।। গোরা অনুরাগে।
অনুক্ষণ গোরাপ্রেম।। হিয়ার মাঝে ভাগে।।
গৌরাঙ্গ পিরীতি ধনি।। বড়ই বিষম।
বাসু কহে নাহি রহে।। কুলের সরম।। (ওই, ৭৫ নং, পৃ-১৭৫)

এখানে দ্বিতীয় পংক্তিতে আট - সাত (৮।।৭।) মাত্রার পদভাগ দেখি। অবশ্য এটি ব্যতিক্রম। পদটি মূল মিশ্রবৃত্ত পয়ার এবং মাত্রা বিভাগ আট - ছয় (৮।।৬।) বন্ধে।

৩২ নং পদটিতে (ওই, পৃ-১৪৭) ও পয়ারের আট - ছয় (৮।।৬।।) বন্ধন কবি সর্বত্র রাখতে পারেননি। যথা ঃ

আহা মরি মরি সই।। আহা মরি মরি।
কি ক্ষণে দেখিনু গোরা।। পাশরিতে নারি।।

এই অংশে মিশ্রবৃত্তে আট - ছয় (৮।।৬।) বন্ধের শব্দভাগ থাকলেও পরবর্ত্তী অংশে পরিবর্তন ঘটেছে—

গৃহ কাজ করিতে তাহে।। থির নহে মন।
চল দেখি গিয়া গোরার।। ও চাঁদ বদন।।

এই অংশে দেখা যাচ্ছে পদভাগ হয়েছে নয় - ছয় (৯।।৬।) মাত্রা নিয়ে। যদি দলবৃত্তে পাঠ করা যায় তবে এই অংশটি তিন পর্বের চতুদল পর্বমাত্রায় (৪।৪।৪।) পর্যবসিত হয়। অর্থাৎ সমকালীন কথ্যবাংলার রূপটি সম্ভবতঃ এখানে এসে পড়েছে। তবে পদটি মূলতঃ মিশ্রবৃত্তে রচিত। ৪৪ সংখ্যক (ওই, পৃ - ১৭০) পদটিও মিশ্রবৃত্তে রচিত একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পদ। যথা ঃ

অরুণ নয়নে। ধারা বহে।
অবনত মাথে।। গোরা রহে।।

কমল পল্লব।। বিছাইয়া।

রহে পহুঁ ধেয়ান করিয়া।।

পদমাত্রাভাগ ৮।। ২। বা ৬।। ৪। রীতিতে করা যায়। তবে ছয় - চার ভাগে পড়লে এর অর্থগত দিকটি স্পষ্ট প্রকাশ পায়। যদিও উদ্ধৃত অংশের চতুর্থ পংক্তিটি আট - দুই বিভাগে ছাড়া পাঠ করা দুঃসাধ্য। বাসুঘোষও যে ছন্দ নিয়ে সময় সময় পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এই পদটি তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

মিশ্রবৃত্তের ত্রিপদী ছন্দোবন্ধ ও বাসুঘোষের পদাবলীতে দেখা যায়। যথা ঃ

আর এক দিন।। গৌরাঙ্গ সুন্দর।।
নাহিতে দেখিনু ঘাটে।
কোটি চাঁদ জিনি বদন সুন্দর
দেখিয়া পরাণ ফাটে।। (ওই, ২৯ নং, পৃ - ১৬৭)

এখানে পদমাত্রা ভাগ হয়েছে ছয় - ছয় - আট (৬।। ৬।। ৮) এই লঘু ত্রিপদী বন্ধে। প্রথম পদে তিনটি পর পর রুদ্ধদলের ব্যবহারে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

৩৭ সংখ্যক (ওই, পৃ-১৬৮) পদটিতেও লঘু ত্রিপদীর গঠন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যথা ঃ

গৌরীদাস সঙ্গে।। কৃষ্ণকথা রঙ্গে।।
বসিলা গৌরহরি।
ভাবে হিয়া ভোর ঘন দেয় কোর
দোহে গলা ধরাধরি।।

পদটির প্রথম পংক্তিতে পদমাত্রা বন্ধ ৬।। ৬।। ৬।। দ্বিতীয়াংশে বন্ধরুণ ৬।। ৬।। ৮।। প্রথম পংক্তির শেষ পদে 'গৌরহরি' অংশেও ত্রিপদী বন্ধের আর একটি বিভাগ এই রকম ঃ

মদন মোহন মানি।। গৌরাঙ্গ বদন খানি।।
রূপ হেরি কিনা হৈল মোরে।
সোনার বরণ তনু এই ছিল কালাকানু
নহিলে কি মন চুরি করে।। (ওই, ২৮ নং, পৃ. ১৬৬)

এখানে পদবিভাগ হয়েছে আট - আট - দশ (৮।। ৮।। ১০।) মাত্রাভাগে। পদ পংক্তিতে ধুয়া বা আখর বলা যায় প্লুতস্বর যোগ করেও কোথাও কোথাও ছন্দে মাত্রাসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। যথা ঃ

না জানিয়া না শুনিয়া।। পিরীত করিলুঁ গো
পরিনামে পরমাদ দেখি।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন।। মন বরিষয়ে গো
ওই ছন ঝুরয়ে দুটি আঁখি।। (ওই, ৭৬ নং, পৃ-১৭৫)

মিশ্রবৃত্তের এই ত্রিপদীটিতে আট - আট - দশ পদমাত্রা - বন্ধ (৮।। ৮।। ১০।।) দৃষ্ট হয়। তবে দ্বিতীয় পদের শেষে 'গো' এই আখরটির দু'মাত্রার সাহচর্যে মূল পদটি ছন্দোমাত্রা - সমতা রাখতে পেরেছে। অবশ্য 'গো' এই শব্দে কলাবৃত্ত রীতির দীর্ঘ স্বরধ্বনি - মাত্রা মানা হয়েছে। নইলে ছন্দোসমতা রক্ষা করা সম্ভবপর হতো না। বাসুঘোষ রচিত বাংলা ব্রজবুলি পদগুলির মধ্যে কলাবৃত্ত ছন্দোরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে কলাবৃত্তের একপদী বন্ধ ঃ

কহ সখি। কি করি উঃপায়।
ছাড়ি গেল। গোরা নটঃ রায়।।
ভাবি ভাবি। তনু ভেল। ক্ষীণ।
বিচ্ছেদে বাঁঃচিব কত। দিন।। (ওই, ৮৬ নং, পৃ - ১৭৭)

এখানে পর্বমাত্রার বিভাগ চার - চার - দুই (৪। ৪। ২।) ক্রমে। মোট কলামাত্র দশ। তবে উদ্ধৃতাংশের চতুর্থ পংক্তিতে 'বিচ্ছেদে বাঁচিব কতদিন' এই 'বিচ্ছেদে'কে তিন মাত্রার সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে পড়লে (বিচ - ছে - দে - র 'বিচ' - এই রুদ্ধদলকে এক কলা হিসেব ধরে) মাত্রাসাম্য বজায় থাকে।

১০৯ সংখ্যক (ওই, পৃ - ১৮২।।১৮৩) পদটিও একপদী বন্ধে। মোট মাত্রা সংখ্যা এগার। যথা ঃ

বিরলে বসিয়া। একেশ্বরে।
হরিনাম জপে। নিরন্তরে।।

এখানে পর্বমাত্রাবিভাগ ছয় - পাঁচ (৬। ৫।)। ছন্দ একাবলী। কিন্তু সর্বত্র এই বিন্যাস থাকেনি। পরবর্ত্তী অংশে দেখি।

সব অবতার শিরোমণি।
অকিঞ্চন জঃনের চিন্তাঃমণি।।
সুগন্ধি চন্দন মাখা। গায়।
এবে ধূলি বিনু আন নাহি ভায়।। (ওই)

উদ্ধৃতাংশের প্রথম পংক্তি দশমাত্রার। পর্বমাত্রা বিভাগ - চার - চার - দুই (৪। ৪। ২।)। দ্বিতীয় পংক্তি কলামাত্রা হিসাবে তের। পর্বমাত্রার বিভাগ ছয় - পাঁচ - দুই (৬। ৫। ২।)। তৃতীয় পংক্তি বারো মাত্রায়। পর্ববিভাগ ছয় - চার - দুই (৬। ৪। ২।)। চতুর্থ পংক্তিতে দু'মাত্রার অতিপর্ব সহ পর্ববিভাগ - দুই) চার - চার - দুই বা ২) ৪। ৪। ২।। মোট মাত্রা বারো। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে যে পদটিতে পংক্তি সজ্জায় অসমতা দেখা যায়। এতে কাব্যপাঠে যেমন বিঘ্ন ঘটে, শ্রুতিমাধুর্যেরও হানি হয়েছে বোধ হয়।

একাবলী ছন্দের আর একটি পর্ববিভাগ দেখি ৫১ নং (ওই, পৃ - ১৭১?) পদে। যথা ঃ

মঝু মনে। লাগল। শেল।
গৌর বৈমুখগৈ। ভেল।।
জনম বিঃফল মোর। গেল।
দারুণঃ বিহি দুখ। দেল।।

এখানে পর্বমাত্রা বিভাগ চার - চার - তিন (৪। ৪। ৩।)। মোট মাত্রা এগার। উদ্ধৃতির দ্বিতীয় পংক্তিতে 'গৌর' হলন্ত উচ্চারণে দু'মাত্রা ধরা হয়েছে মাত্রাসাম্য রক্ষার্থে। ষোল মাত্রার একপদী বন্ধের পদও বাসুঘোষ ব্যবহার করেছেন কলাবৃত্তে। যথা ঃ

আপন। জানি বঃনায়নু। বেশ।
বাঁধলু। যতনে উঃদাস করি। কেশ।।
চন্দন। তিলক দেঃয়লু মুঝে। ভাল।
কণ্ঠে চঢ়ায়লু। মোতিম। মাল।। (ওই, ৪২ নং, পৃ - ১৬৯)

এখানে পর্ববিভাগ চার - চার - চার - (৪। ৪। ৪। ৪।)। শেষ পর্বে দীর্ঘ - হ্রস্ব নির্বিশেষে

বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে দু'কলা মাত্রা ধরা হয়েছে। এই পদটি দ্বিপদী রীতিতেও আট - আট (৮।৮।) মাত্রাভাগে পাঠ করা যায়।

লঘু ত্রিপদী বন্ধের ব্যবহার কয়েকটি পদে দৃষ্ট হয়। যথা ঃ

দেখত ঝুলত।। গৌর চন্দ্র।।
অপরূপ দ্বিজমণিয়া।
বিধির অবধি রূপ নিরুপম
কষিল কাঞ্চন জিনিয়া।। (ওই ৭০ নং, পৃ - ১৭৪)

এখানে পদমাত্রা ভাগ ছয় - ছয় - দশ (৬।।৬।।১০।) রীতিতে। তবে উদ্ধৃত 'দ্বিজমণিয়াকে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে ছ' মাত্রা ধরতে হবে। কিন্তু 'জিনিয়া' তিন মাত্রাতেই পঠনীয়। কলাবৃত্তের দীর্ঘ ত্রিপদী বন্ধের পদও বাসুঘোষ রচনা করেছেন। যথা ঃ

নিরমল গোরাতনু কষিল কাঞ্চন জনু
হেরইতে ভৈ গেলু ভোর।
ভাঙ ভুজঙ্গম দংশল মঝু মন
অন্তর কাঁপয়ে মোর।। (ওই, ২১ নং, পৃ-১৬৫)

এখানে পদমাত্রা বিভাগ আট - আট - বারো (৮।।৮।।১২।)। 'কাঞ্চন' শব্দটি সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে তিন মাত্রা ধরতে হবে। নতুনবা ছন্দসাম্য থাকে না।

কলাবৃত্তের দীর্ঘ চৌপদী বন্ধের পদ বাসুঘোষের রচনায় বিশেষ দৃষ্ট না হলেও, নিম্নোক্ত পদটি চৌপদী বন্ধে—

চিত চোর। গৌর মোর।। প্রেমে মত্ত। মগন ভোর।।
অকিঞ্চন জন। করই কোর।। পতিত অধম। বন্ধুয়া।
ভুবন তারণ। কারণ নাম।। জীব লাগিয়া। তেজলধাম।।
প্রকট হইলা। নদীয়া নগরে।। যৈছে শারদ ইন্দুয়া।।
(ওই ২৩ নং পদ, পৃ-১৬৬)

এখানে পদমাত্রা বিভাগ বারো - বারো - বারো - দশ (১২।।১২।।১২।।১০। বা ৬।৬।। ৬।৬।।৬।৬।।৬।৪।) ক্রমে। তবে অকিঞ্চন শব্দে রুদ্ধদলে এক কলামাত্রা ধরে চারমাত্রা গণনা করতে হবে। তেমনি 'চিতচোর' শব্দে 'হ্রস্ব ই কার' বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে দু'মাত্রা ধরতে হবে।

কথ্য বা মৌখিক ও লোকায়ত ভাষার ব্যবহার বাসুঘোষের পদে থাকলেও কথ্যরীতির তথা দলবৃত্ত ছন্দের তেমন প্রয়োগ তাঁর পদবলীতে নেই। তাঁর কবিভাষায় মূলতঃ মিশ্রবৃত্ত ও কলাবৃত্ত ছন্দোরীতি লক্ষিত হয়। তবে কোন কোন পদে দলবৃত্ত ছন্দের আত্মপ্রকাশ হঠাৎ হঠাৎ ঘটে গেছে। যেমন ঃ

৬৪ নং পদের (ওই, পৃ - ১৭৩) মধ্যে

গোষ্ঠলীলা। গোরা চাঁদের। মনেতে পঃড়িল।

এই অংশে দল মাত্রার হিসাব সংখ্যাত চার - চার - চার - দুই (৪।৪।৪।২।) পর্বভাগে বা আট - ছয় পদভাগে (৮।।৬।) দলবৃত্ত পয়ার - বন্ধ লক্ষিত হয়। শব্দের আদিতে প্রস্বর বা ঝোঁকও পড়ে।

কিন্তু পরবর্তী অংশে মিশ্রবৃত্ত পয়ারবন্ধ অনুসৃত হয়েছে ঃ

ধবলী শাঙলী বলি। সঘনে ডাকিল।
শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ করিয়া ঘন। ঘুরায় পাঁচনি...

এখানে পদমাত্রাভাগ আট - ছয় (৮।. ৬।) পয়ারবন্ধে। আর একটি পদেও এমনি চকিতে লৌকিক দলবৃত্ত রীতি এসে পড়েছে। যথা ঃ

আজু কেন। গোরা চাঁদের। বিরস বঃয়ান।
কে আইল কে। আইল করি। ঝরয়ে নয়ান।।

(ওই, ৭৮ নং, পৃ - ১৭৬)

এখানে দল অনুসারে পর্ব মাত্রাভাগ চার - চার - চার - এক (৪।৪।৪।১।)। কিন্তু পরবর্তী অংশে মিশ্রবৃত্ত পয়ারের প্রচলিত রূপটি (৮।। ৬।) লক্ষিত হয়। যথা ঃ

চৌদিকে ভকতগণ।। কাঁদি অচেতন।
গৌরাঙ্গ এমন কেন।। না বুঝি কারণ।। ইত্যাদি (ওই)

বাসু ঘোষ : অলঙ্কার

অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাসুঘোষ প্রধানতঃ সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রথানুসরণ করেছেন। অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তা প্রাণবন্ত বা স্বতস্ফূর্ত হয়নি সর্বত্র। তাই সেক্ষেত্রে অলঙ্কার কবিভাষাকে নিস্প্রাণ বক্তব্যে পরিণত করেছে। তথাপি তাঁর প্রয়াস লক্ষণীয়।

শব্দালঙ্কার প্রয়োগে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন নিম্নোক্ত পদে। যথা ঃ

নিরমল প্রেমফল ফলে সর্ব্বকাল। (৩৫ নং, পৃ - ১৬৮)

এখানে অলঙ্কার ধ্বনি অনুপ্রাস। 'ম, ফ, ল' প্রভৃতি বর্ণের শ্রুতিমাধুর্য ছাড়াও শব্দান্তের 'ল' ধ্বনিতে পংক্তিতে যেমন পেলবতা এসেছে তেমনি যুক্ত হয়েছে উদাসীন ব্যাঞ্জনা। ৩৭ সংখ্যক (পৃ - ১৬৮) পদটিতে পদান্ত মিলের ধ্বনি - অনুপ্রাস বিশিষ্ট ধ্বনি ঝঙ্কার সৃষ্টি করেচে। যথা ঃ

সঙ্গে - রঙ্গে, ভোর - কোর, সম্বরিয়া - বসাঞা, মাল - তৎকাল,
হার - বার, বরণ - স্মরণ, ভাষ - গৌরিদাস, কয় - রসময়' প্রভৃতি।

গৌরাঙ্গের পাদবিক্ষেপ জনিত নুপুর ঝঙ্কার অনুপ্রাস - ঝঙ্কারে অভিব্যক্ত হয়েছে এই পদটিতে। যথা ঃ

রুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু নুপুর পায়।
পেথলু গৌরাঙ্গ বর নটরায়।। (৬১ নং, পৃ- ১৭৩)

একই শব্দের 'ঝুনু' পুনরক্তি ও এখানে ধ্বনিঝঙ্কার সৃষ্টির সহায়ক। তাছাড়া 'রুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু' অংশে 'উ' কার 'ন, ঝ' মিলে নুপুর নিক্কনকে শ্রৌতরূপ দান করেছে এবং 'উ' স্বরান্তে কবির মন্ময় অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে।

অর্থালঙ্কার ব্যবহারে সীমিত ক্ষেত্রেই তিনি দৃষ্টি নিয়েছেন। গৌরাঙ্গ বিষয়ক আক্ষেপানুরাগের নিম্নোক্ত পদটিতে দেখি উপমা-র মাধ্যমে কবি গৌরাঙ্গের দুঃখে সমব্যথী হয়েছেন। যথা ঃ

আষাঢ় শ্রাবণে যেন ঘন বরিষয়ে গো
ঐছন ঝুরয়ে দুটি আঁখি। (৭৬ নং, পৃ - ১৭৫)

আষাঢ়-শ্রাবণের বর্ষণের সঙ্গে অশ্রুবর্ষনের তুলনার মধ্যে নতুনত্ব নেই। তবে 'গো' এই প্লুতস্বরের সম্বোধন -মাধ্যমে কবিভাষায় কবির আত্মিক ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে। এ ব্যাকুলতা

গৌরাঙ্গের অশ্রুধারা সিক্ত মুখাবয়ব দেখে। কবির ব্যাকুল সম্বোধন পাঠক মনকেও ছুঁয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে রাধাবিরহ খণ্ডে প্রায় একই আওয়াজ বড়ু চন্ডীদাসের জবানীতে রাধার বিচ্ছেদ ব্যাকলতা তুলনা করতে -

"আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিসে যেহ্ন -
ঝরয়ে নয়নের পানী[২]

৭৯ নং (পৃ - ১৭৬) পদটিতে দেখি গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করে নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁর বিরহ - আশঙ্কায় জাহ্নবীর সাদা চলিষ্ণু জলধারা যেন স্তব্ধ হয়ে যেতে চলেছে। কোকিলের কুহু রবও মূক হয়ে গেছে। কবি বিশেষোক্তি অলঙ্কার দ্বারা এই বিষাদ চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন অনাড়ম্বর ভাষায় —

স্থগিত হইল কেন জাহ্নবীর ধারা।
কোকিলের রব নাহি হৈল মূক পারা।।

বিভিন্ন অনুষঙ্গে তাঁর কবিভাষায় প্রেমের রূপক অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ঃ

'প্রেম জলে করই সিনান' - প্রেমরূপ জল (১০৯ নং, পৃ-১৮৩)
'প্রেমমধু' (১১১ নং, পৃ - ১৮৩), 'প্রেম পরশমণি' (১১ নং পৃ-১৬৩
'প্রেমফল' (৩৫ নং, পৃ - ১৬৮), 'প্রেম রতনফল' (৪৬ নং পৃ-১৭০)
প্রভৃতি। এছাড়া - 'অনুরাগের ডুরি' (৩৩ নং, পৃ-১৬৮)

'কৃষ্ণনাম মধু' (৪১ নং, ১৬৯ পৃ) প্রভৃতি ও কাব্যভাষাকে অলঙ্কৃত করেছে রূপকের মাধ্যমে।

২৭ নং পদটিতে (পৃ - ১৬৬) গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনা করতে গিয়ে কবি ব্যতিরেক অলঙ্কারের সাহায্যে রূপমহিমা ব্যক্ত করেছেন।

কত চাঁদ জিনি মুখ সুন্দর অধর।।
কবির কর জিনি বাহু সুবলনী।
খঞ্জন জি'নিয়া গোরার নয়ন - চাহনি।।

....

রামরম্ভা জিনি উরু অরুণ চরণ।
নখমণি তিনি পূর্ণ ইন্দু দরপণ।। - অর্থাৎ শত চন্দ্র, হস্তি বাহু, খঞ্জন পক্ষী, রামকদলীবৃক্ষ, পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষাও গৌরাঙ্গের আনন - অধর, বাহু, চক্ষু - চাহনি, উরু, নখমণি সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠতর। তুলনাগুলি প্রাণহীন বর্ণনা ও স্মৃতি অনুকরণ মাত্র।

১৩ সংখ্যক, (পৃ - ১৬৩।১৬৪) পদটিতে গৌরাঙ্গের রূপাঙ্কনে কাব্যিক স্পর্শ ব্যক্ত হয়েছে ধ্বনিমাধুর্য ও ব্যতিরেক অলঙ্কারের সুষ্ঠ প্রয়োগে। যথা ঃ

উপমা নহিল যে কষিল বাণ সোনা।।
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম।।
তুলনা নহিল স্বর্ণ কেতকীর দল।

....

কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ গন্ধ মনোহরা।।

কষ্টি পাথরে যাচাই করা স্বর্ণের চেয়েও গৌরাঙ্গ উজ্জ্বল বর্ণের। মেঘের বিদ্যুৎ বা চম্পকদাম বা স্বর্ণকেতকীর পাপড়ি ও তাঁর রূপের উপমাযোগ্য হতে পারে না। তাঁর গাত্র গন্ধ কুঙ্কুম গন্ধ অপেক্ষা মনোহরণ কারী। উপরোক্ত পদটিতে কবির কিছুটা মুন্সীয়ানা ফুটেছে প্রথাগত উপমা বর্ণনাতেও ভাষার চমৎকারিত্ব সৃষ্টির দ্বারা।

বাসুঘোষ : চিত্রকল্প

চিত্র রচনার ক্ষেত্রেও বাসুঘোষ তেমন দক্ষতা দেখাতে পারেননি। চিত্রকল্পের ইন্দ্রিয়জ চেতনা ও তাঁর কবিভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেনি তাঁর কবি ব্যক্তিত্বকে মুখরিত করে। তার ওপর অধিকাংশ চিত্রই গতানুগতিক। তবু তার মধ্যেই তিনি প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছেন।

২ সংখ্যক (পৃ-১৬১) পদটিতে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গদেবের জন্ম সময়টি চিত্রায়িত করতে গিয়ে রূপকের উৎপ্রেক্ষার আশ্রয় নিয়েছেন —

গৌরাঙ্গ রূপ শশি (চন্দ্র) নদীয়ার আকাশে উদিত (জন্মগ্রহণ) হলে পর, পার্থিব আকাশের পূর্ণচন্দ্র যেন লজ্জাবশতই রাহু গ্রাস প্রাপ্ত হল। অর্থাৎ রাত্রির গাঢ় আঁধারে মুখ লুকিয়ে ফেলল। এছাড়া পদটিতে তৎকালীন (১৪৮৬ খৃ. অ.) নবদ্বীপ তথা বাংলাদেশের অস্থির সমাজ ধর্মবিপর্যয় রাষ্ট্র বিক্ষোভের অনিশ্চিত পটভূমিটিকে কবি রূপক চিত্রের মধ্যে দিয়ে এঁকেছেন। সেদিক থেকে পদটির চিত্ররূপের গুরুত্ব আছে।

গৌরাঙ্গের বাল্য জীবনের টুকরো টুকরো ছবি কবি অসাধারণ দক্ষতায় শিল্পমন্ডিত করেছেন কিছু কিছু পদে। যথা ঃ

হামাগুড়ি নানা রঙ্গে যায় শচীবালা।।
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর। (৫ নং, পৃ-১৬২)

গৌরাঙ্গ হামাগুড়ি দিয়ে নানা ভঙ্গিতে খেলছেন, আর তাঁর মুখ বেয়ে লালা ঝরে পড়ছে। এই আপাত সামান্য ব্যাপারটি গৌরাঙ্গদেবের মত মহাপুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে মূল্যবান হয়ে উঠেছে পাঠকের কাছে।

৫ নং পদটিতেও (পৃ-১৬২) অত্যন্ত সাধারণ ভঙ্গিতে গার্হস্থ্য জীবনচিত্র কবির তুলিতে রূপায়িত হয়েছে। যথা ঃ

হাঁটি হাঁটি পায় ... পায় যায় গুড়ি গুড়ি।
পথ আধ যাইতে ঠেকাড় করি পড়ে।।

শচীদেবীর হাত ধরে গৌরাঙ্গের এক পা এক পা করে হাঁটা ও ধুলোয় টাল হারিয়ে পড়ে যাওয়া - এই পরিচিত গৃহচিত্রটি দক্ষতার সঙ্গে কবি এঁকেছেন।

উপরোক্ত পদগুলিতে লোক - অভিজ্ঞতার স্পর্শ হেতু তা আমাদের কাছে অপরিচিত ঠেকে না। এবং এই ব্যঞ্জনা একেবারে নিরর্থক হয়ে পড়ে না। কিন্তু যেখানে কবি শুধুই কল্পনা রঙ্গিত অপার্থিব চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে গেছেন, আমাদের মনে হয় তা ব্যর্থ হয়ে পড়েছে। যথা ঃ

চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে নাচে তারাগণ।
ব্রহ্মা নাচে বায়ু নাচে সহস্র লোচন।।
অরুণ বরুণ নাচে সব সুরগণ।
পাতালে বাসুকি নাচে নাচে নাগগণ।।
স্বর্গ নাচে মর্ত্য নাচে নাচয়ে পাতাল।

পরম আনন্দে নাচে দল দিকপাল। (১৯ নং পদ, পৃ-১৬৫)

গৌরাঙ্গের অভিষেক পর্যায়ের এই পদে কবি এ কল্পচিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর অভিষেক সংবাদে সূর্য, চন্দ্র সহ নক্ষত্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অরুণ - বরুণ সহ স্বর্গের সুরগণ নৃত্যে মেতে উঠেছেন। মর্ত্যের মানুষ ও পাতালের বাসুকী সহ নাগ দেবতারাও বাদ যাননি। স্বর্গ - মর্ত্য - পাতাল আর দশ দিকের অধিপতি দিকপাল - গণও একত্রে নৃত্যপর। কবি স্বর্গ - মর্ত্য - পাতালে তাঁর কল্পনার অবাধ পক্ষবিস্তার করেছেন ভক্তির আতিশয্যে। ফলে চিত্রকল্পটি নেহাতই অবাস্তব হয়ে পড়েছে।

গৌরাঙ্গের একটি অপূর্ব রূপচিত্র কবি ২৯ সংখ্যক (পৃ-১৬৭) পদে অঙ্কন করেছেন। স্নানরত গৌরাঙ্গের কুঞ্চিত ঘন সন্নিবিষ্ট চুলে লেগে থাকা জল কণিকাগুলি যেন মেঘের অঙ্গে লেগে থাকা মুক্তাবিন্দু। যথা ঃ

কুটিল কুন্তল। তাহে বিন্দু জল। মেঘে মুকুতার দাম।

'কুটিল কুন্তল' অংশে কল্পনার নতুনত্ব দেখা যায়।

গৌরাঙ্গ-এর সন্ন্যাস গ্রহণে মাতৃহৃদয়ে তীব্র যন্ত্রণার উদ্রেক হয়। শোকে দুঃখে তাঁর বিধ্বস্ত অবস্থার চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি উল্লেখ করেছেন—'মড়া যেন রহিল পড়িয়া' (৯১ নং, পৃ-১৭৮) অর্থাৎ, মড়ার নিঃসঙ্গতা ও নিঃস্পন্দ স্তব্ধতার ভাবকল্পনা সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন শচীর শোক মাধ্যমে।

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যায়ের ৯৬ সংখ্যক (পৃ-১৭৯) পদটিতে মুন্ডিত মস্তক, কৌপীন ধারী ও কমন্ডুল ধৃত নিমাইয়ের সন্ন্যাসী রূপটি মূর্ত করেছেন কবি গভীর স্নিগ্ধতায়। তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণে বনের পশুপাখীও রোদন করছে সমগ্র নদীয়াবাসীর শোকানুষঙ্গে। এখানে ও অত্যন্ত সহজ ভাষায় সাবলীল ভঙ্গিতে অনাড়ম্বর চিত্রকল্পে বাসুঘোষ সন্ন্যাসের পবিত্র নির্মলতা ও মর্ত্য জীবের বিষাদ ভাবটি উপস্থিত করতে পেরেছেন।

গ্রন্থসূত্র

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : বৈষ্ণব পদাবলী (সাহিত্য সংসদ, ১৩৮৬, পৃ-১৬১) (পার্শ্বস্থ সংখ্যা পদসংখ্যা সূচিত করে)

২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত : বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (১৯৬৯), পৃ-২৬৬

জগদানন্দ : ভাষা ব্যবহার

অষ্টাদশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা জগদানন্দ। তিনি বৈষ্ণব পদ রচনার ক্ষেত্রে মূলত ঃ বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস-পদাঙ্কানুসরণে ব্রজবুলি ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন। এবং ব্রজবুলির ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টিতে ধ্বনি তাত্ত্বিক পরিবর্তন জনিত স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ, স্বরসঙ্গতি, বর্ণলোপ প্রভৃতির ব্যবহার করেছেন। তেমনি শব্দরূপের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পরিবর্তন সাধন করেছেন। প্রথমে ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রয়োগ আলোচিত হচ্ছে।

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের সাহায্যে কবি কলাবৃত্ত ছন্দে মাত্রাসমতা বজায় রাখা ছাড়াও উচ্চারণ জনিত উচ্চারণের সময়সীমা ইচ্ছামত বর্ধিত করেছেন এবং ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করেছেন। প্রধানতঃ এই ধরণের স্বরভক্তি বেশী লক্ষিত হয় তার কাব্যে—

নিগমন[১] (১১ নং পদ), মুরতি (১৩ নং পদ, বৈষ্ণব পদাবলী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৩৮৬)।

যতন (২ নং পদ, ওই), বরণাবলী, শবদ (৫ নং ওই), শরম (শ্রম), ঘরম (৮ নং ওই), দরপকি (দর্প-কি) ভসম (৯ নং, ওই), গুপত (৪১ সংখ্যক, ওই), দরপণ বেয়াধ, ধরম, গরবিত (২০ নং ওই) বেকত (৩৭ সংখ্যক, ওই), ধেয়াতি (৫০ নং, ওই), মরত (৫৩ নং, ওই), তিরপিত (৫৪ নং ওই), বিদগধ (ওই) প্রভৃতি।

স্বরসঙ্গতির ব্যবহার করেছেন ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি করতে। যথা ঃ মিলল (৩৮ নং পদ), নিতি নিতি (৫২ সংখ্যক, ওই) প্রভৃতি।

স্বরলোপ বা বর্ণলোপের সাহায্যে অনেকক্ষেত্রে ছন্দে মাত্রার সমতা জন্য পংক্তিমাত্রায় হেরফের ঘটানোর চেষ্টা করেছেন কবি। যথা ঃ 'দীঘ, নিশাস' (৪৬ নং পদ, পৃ - ৮৯৫), অসমতি, সমতি (ওই), ধরিতি (৩০ নং পদ), থীর (৭ নং), চিত (১২ নং ওই), অলখিত (১৯ নং) অগুলি (৪৫ নং পদ)।

শব্দরূপের যেসমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় তা হল 'লুঁ' প্রত্যয়ান্ত উত্তম পুরুষের অতীতকালের ক্রিয়াপদ। যথা ঃ

পেখলুঁ (৩১ নং পৃ - ৮৮৮), বুঝনুঁ (৩৩ নং, ওই), পিধয়লুঁ (৪৪ নং, ওই), আয়লুঁ (ওই) বেচলুঁ (৫৩ নং পদ) ইত্যাদি।

'ইয়া' প্রত্যয়াত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ ধ্বনিসাম্য সম্পাদনে, কখনো কখনো পদান্ত মিল সম্পাদনে। যথা ঃ

বিশেষ্য পদ ঃ সাথিয়া (৪৭ নং পদ), রসিয়া (৩৮ নং পদ) প্রভৃতি।

ক্রিয়াপদ ঃ সাঁতিয়া, মাতিয়া, ভাতিয়া, চাপিয়া, ছাপিয়া, ঝাঁপিয়া, কাঁপিয়া (৪৭ নং পদ), খসিয়া (৩৮ নং পদ) প্রভৃতি।

ধন্যাত্মক শব্দ ব্যবহারে ধ্বনি ঝঙ্কার ও তরঙ্গদোলা শ্রুত হয়। কলকল (২৬ নং), খল খল (৫৬ সংখ্যক), রুনুঝুনু (৫০ সংখ্যক), ছল-ছল (৪৩ নং পদ), ঝলমল (২২ নং পদ), টলমল (৩০ সংখ্যক), দরদর (৩৭ সংখ্যক) প্রভৃতি 'দ্বৈত শব্দের মধ্যে, 'ইতিউতি' (১৫ নং পদ, ৪২ সংখ্যক প্রভৃতি), ঢুলু-ঢুলু (৪১ নং পদ), মৃদু মৃদু (৮ নং পদ), বেরিবেরি (৩৪ সংখ্যক) প্রভৃতি অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে জগদানন্দের পদাবলীতে।

লৌকিক ব্যবহার্য শব্দগুলির মধ্যে যাঙ (৯ নং পদ), সোঙরি (৪৩ নং পদ), গোঙারি (১৯

142

নং পদ), গোঙার (৫৩ নং পদ), নিঙাড়ি (২০ নং পদ), মাজল (ওই) প্রভৃতি প্রধান।

পদের মধ্যেই শব্দমেলের ব্যবহারে জগদানন্দ অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যথা ঃ কলাবৃত্ত ত্রিপদী বন্ধের ১২ নং পদের প্রতি পদে পংক্তিতে দেখি—'শশধর - যশহর, মলিন - নলিন, বয়ন - নয়ন,' 'তরুণ - অরুণ, বসন - রসন, মোতি - জ্যোতি', 'চৌর - গৌর', 'দলিত - ললিত', 'রদন - ছদন', 'পরনি - বরনি', 'বিধিক - অধিক', 'অতএ - কতএ, যুবতি - উমতি' প্রভৃতি।

জগদানন্দ শব্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছিলেন কয়েকটি পদে। কৃষ্ণের প্রতি শঠতার অনুযোগ করে রাধা বলেছেন যে নানা কৌশলে কৃষ্ণ তাঁকে প্রেমে মজিয়েছেন এবং মিলন কালে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাধাকে আশাহত করেছেন। এই ব্যাপারটি বর্ণনা করতে গিয়ে কবি ছন্দাশ্রিত শব্দের প্রথম অক্ষর ধরে উপর-নীচ ও নীচ উপর এই ক্রমে আর একটি পদ রচনা করেছেন —

ন-বীন মি-লনে ত-নুধ - রি-তুহুঁ স-পতি অ-নেক কেলি।
র-সিক আ-শয়ে ন-গণি ধ-রম মা-নিনী গা-রিমা দেলি।।
হ-সিত বদনে ম-জালে ল-লনা প-রব ন্দ কত করি।
রি তি অ-লি সম নকর গ-মন নন্দের ন-ন্দন হরি।।
প্র-ণত ব-নিতা এ সব যু-বতী তু-লনা আ-সিবে কিসে।
ভুলাঞা র-মণী ক-মল ন-য়নী আ-শাহ ত-কল্যে শেষে।।
তু-ষিয়া আ-দরে ক-ত প-রকারে পা-সর গ-রব-অন্ধ।
মি-নতি কি-কর রিতিনা চ-লহ অ-সুখী জ-গদানন্দ।। (৬০)

"নরহরি প্রভু তুমি। কি আর বলিব আমি। তনমন এক কারি। চরণ যুগল ধরি। সমাপণ তুয়া পা অ। জগত আনন্দ গায়।।" - এই ধরণের শব্দ - খেলা কবি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে করেছেন। কোথাও পাঠ - ভ্রম ঘটার অবকাশ রাখেননি। জগদানন্দকে তাই শব্দের কারিগর বললে অত্যুক্তি হবে না।

জগদানন্দ : ছন্দ

অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তা জগদানন্দকে ছন্দ সচেতন কবি বলা যায়। তাঁর রচনার বেশীরভাগই ব্রজবুলি ভাষায় লেখা। এবং তাই ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কলাবৃত্ত রীতি অনুসৃত।

কলাবৃত্তের দ্বিপদী বন্ধ এই রকম—

অপরূপ। সব সুল।। খন যুত। অঙ্গ। ৮।। ৭।
নিরখিতে। মুরছিত।। কোটি অনঙ্গ।। ৮।। ৭।
অবিদিতে। বিদিত সব।। জানি ৯।। ৩।
গুপতে। মুরারি। গু।পতে কহ। আনি।। ৮।। ৭ (৩ নং পদ, পৃ - ৮৭৫)

এখানে পদমাত্রা ভাগ আট - সাত (৮।। ৭।) সংখ্যায়। তবে "অবিদিতে বিদিত সব জানি" অংশে নয় - তিন (৯।। ৩।) ভাগ লক্ষিত হয়। কলাবৃত্ত দ্বিপদীর আর একটি রূপ দেখা যায় তাঁর পদে। যথা ঃ

ক্রোড়ে মিলল ব্রজ দুলালী।। ৬।৬।।
পড়ু মুরলী। খসিয়া। ৬। ৪।

143

কুসুম পুঞ্জ। নবীন কুঞ্জে।।
গাওত কোকিল। রসিয়া।। (৩৮ নং পদ. পৃ - ৮৯১)

এখানে পদমাত্রাভাগ হয়েছে বারো-দশ (১২।।১০।) সংখ্যায়। দীর্ঘ দ্বিপদীর এই পদটিতে 'পড়ু' এই লঘু উচ্চারণে দু'মাত্রার শব্দটিকে মাত্রাসাম্যের জন্য দীর্ঘ উচ্চারণে তিন মাত্রায় পাঠ করা প্রয়োজন।

কলাবৃত্তের ত্রিপদী বন্ধেও জগদানন্দন বহু পদ লিখেছেন। ত্রিপদীতে ব্যবহৃত বন্ধগুলি এই প্রকার। যথা ঃ

পাপে পুরল পৃথিবী পরিসর ৭।।৭।।
পেখি পরম দয়াল। ১০।
প্রেম - পয় পরি - পূর্ণ পয়োনিধি
প্রকট পরণত - পাল।। (২৪ সংখ্যক, পৃ - ৮৮৪)

ত্রিপদী বন্ধের আর একটি রূপ এই রকম ঃ

দিঠি পদ করতল।। তালু স্বাদন - থল।। ৮।।৮।।
বদন ছদন নখ রঙ্গ। ১১।
উর অরু শ্রীমুখ। । কটি কিবা সুনাসিক।।
সুললিত কাঁধ সুতুঙ্গু।।(৪ নং পদ, পৃ - ৮৭৬)

এখানে পদমাত্রাভাগের সংখ্যা আট - আট - এগার (৮।।৮।।১১।)। তবে সর্বত্র এই ভাগ রক্ষিত হয়নি। কোথাও কোথাও প্রথম পদটি সাত (৭) মাত্রার। যথা ঃ

কটি সুললাট।। চারু উর পরিসর ৭।।৮।
নিরখত গুপত মুরারি।। ১১। (ওই)

এখানে পদভাগ - সাত - আট -এগার (৭।।৮।।১১।)। এই পদটির শেষ পংক্তিতে সাত - সাত - এগার (৭।।৭।. ১১।) মাত্রাভাগ লক্ষ্য করা যায়। যথা ঃ

অঙ্গুলি পরব রোম ত্বচ কচ ৭।।৭।।
রদন জগত বিনি ধারি।। ১১।

কলাবৃত্তের চৌপদী বন্ধেরও বেশ কিছু পদ আছে জগদানন্দের, এবং ছন্দের ব্যবহারে তাঁর পারদর্শিতা লক্ষিত হয়। চৌপদীবন্ধের একটি লঘুরূপ দেখা যায়। যথা ঃ

নরহরি নাম।। অন্তরে অছু।। ভাবহ হবে।। ভবসাগরে।। পার। ৬।।৬।।৬।।১০।
ধররে শ্রবণে।। নরহরি নাম।। সাদরে চিন্তামণি উহ। সার।।
(৫৯ সংখ্যক পদ, পৃ - ৯০১)

এখানে পদমাত্রা বিভাগ ছয় - ছয় - ছয় - দশ (৬।।৬।।৬।।১০।)। তবে এই ভাগে পদটির পাঠ অস্বস্তিকর মনে হয়। বরং একে ত্রিপদীর দীর্ঘ বন্ধে রূপায়িত করলে ভাল লাগে। যথা ঃ

নরহরি নাম অন্তরে অছু ভাবহ।। হবে ভব সাগরে। পার ৮।।৮।।১২।
ধররে শ্রবণে নরঃহরি নাম সাগরে।। চিন্তামণি উহ। সার।। (ওই)

এখানে পদবিভাগ আট - আট - বারো (৮।। ৮।। ১২।) মাত্রায়। সম্ভবতঃ এই পাঠে স্বরক্ষেপেও অসুবিধা ঘটে না। কলাবৃত্তের দীর্ঘ চৌপদি বন্ধের সুন্দর অনায়াস ব্যবহার করেছেন জগদানন্দন। শ্বাস-গ্রহণের দীর্ঘ রেশ এই পদে ব্যবহৃত ছন্দ কৌশলকে মাধুর্য দান করেছে। এই

রূপের একটি পদ উদ্ধৃত করছি ঃ

অকরুণ পুন। তরুণ অরুণ।। ৬। ৬।।
উদিত - মুদিত। কুমুদ - বদন।। ৬। ৬।।
চমকি চুম্বি। চঞ্চরি পদু - ।। ৬। ৬।।
মিনিক - সদন।। সাজে। ৬। ৪।
কি জানি সজনি। রজনি ভোর।।
ঘু ঘু ঘন। ঘোষত ঘোর।।
গত যামিনি। জিত দামিনী।
কামিনি কুল লাজে। (৪৯ নং পদ, পৃ - ৮৯৭)

এখানে পদভাগ যথাক্রমে বারো - বারো - বারো - দশ (১২।। ১২।। ১২।। ১০।)।

প্রত্ন কলাবৃত্তে স্বরবর্ণের লঘু - গুরু উচ্চারণ ও মাত্রা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কবির কিছু স্বাধীনতা আছে। নিম্নোক্ত চৌপদী বন্ধের একটি পদভাগে লঘুস্বরে দু'মাত্রা গণনা করে ছন্দ সমতা রক্ষা করা হয়েছে। যথা ঃ—

কে বুঝে রঙ্গ। না হয় ভঙ্গ।। ৬। ৬।।
শশি সরোরুহ। একই সঙ্গ।। ৬। ৬।।
চকোর অ - লি। করত কেলি।। ৬। ৬।।
অমিয়া মধুতে মাতিয়া। ৬। ৪। (৪৭ সংখ্যক পদ, পৃ-৮৯৫)

এখানে 'চকোর অলি'-র 'অলি'কে দীর্ঘ উচ্চারণ করে দু'মাত্রা ধরা হয়েছে। কলাবৃত্ত চৌপদী বন্ধের আর একটি রূপে আট - আট - আট - আট - বা ৮।। ৮।। ৮।। ৮। বন্ধ দেখা যায়। যথা ঃ—

বলী কলিকাল।। কাল - ভুজগাধিপ।। ৮।। ৮।।
বলে কলে কবল ক।। রল সব দেশ। ৮।। ৮।
অহনিশি বিষয় বিষম বিষ - পরবশ।।
ন পরশ ভুজগ - দলন - রসলেশ।। (২৫ সংখ্যক, পৃ - ৮৮৪)

প্রথম পদভাগেই 'বলী' কে দীর্ঘ উচ্চারণে চার মাত্রা ধরা হয়েছে। কলাবৃত্তের চৌপদী বন্ধের ব্যাপ্তি কতদূর হতে পারে জগদানন্দ তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন নিম্নোক্ত পদটিতে। যথা ঃ—

(আলিরি)
হোতু মনহুঁমে। হুলাস সুলছন ৭। ৭।।
বাম নিজ ভুজ উরোজ ঘন ঘন ৭। ৭।।
ফুরই চূর সঞে প্রাণ - পিউ কিএ ৭। ৭।।
অদুর আওব রে। ৭। ২।
যবহু পঙ্গুঁ পর দেশ তেজব
অগেনি লেখ সন্দেশ ভেজব
তবহু বেশ বিশেষ বিভূষণ
সবহুঁ ভাওব রে।। (২৬ সংখ্য, পৃ - ৮৮৫)

এখানে পদবিভাগ রয়েছে চোদ্দ - চোদ্দ - চোদ্দ - সাত সহ অতিপর্ব দুই অর্থাৎ ১৪। ১৪।।

145

১৪।। ৭।। ২। ভাগে। তবে অতিপর্বকে অপূর্ণ পদে যোগ করলে দাঁড়ায় ১৪।। ১৪।। ১৪।। ৯।।

জগদানন্দের বাংলা ভাষারীতির পদের সংখ্যা খুবই কম। তাই বাংলা পদের অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দ নিয়ে তাঁর ভাবনা গতানুগতিক। মিশ্রবৃত্তের নিম্নোক্ত রূপবন্ধ তাঁর পদে পাই।

মিশ্রবৃত্তের দ্বিপদী (পয়ার) বন্ধের পদ ঃ

দেখ দেখ গোরাচাঁদ।। নদীয়া নগরে। ৮।. ৬।
গদাধর সঙ্গে রঙ্গে। সদাই বিহরে।। ৮।। ৬।
বামে গদা ধর দক্ষিণে নরহরি।
সুরধনী তীরে তীরে।। নাচে ফিরি ফিরি।।
(২১ সংখ্যক - পৃ - ৮৮৩)

এখানে তৃতীয় পংক্তিতে 'দক্ষিণে' শব্দটিকে কলাবৃত্তের মত চার মাত্রায় ধরে নিতে হবে। মিশ্রবৃত্তের ত্রিপদী বন্ধের পদ ঃ

নবীন মিলনে।। তনু ধরি তুঁহ।। ৬।। ৬।।
সপতি অনেক। কেলি। ২।
রসিক আশয়ে নগণি ধরম ৬।। ৬।।
মানিনি গরিমা। দেলি।। ৬। ২। (৬০ সংখ্যক পদে, পৃ - ৯০২)

এখানে পদমাত্রাভাগ হয়েছে ছয় - ছয় - আট (৬।। ৬।। ৮।) সংখ্যাতে। অর্থাৎ ত্রিপদীর লঘুরূপবন্ধ অনুসৃত হয়েছে এখানে।

মিশ্রবৃত্তের ত্রিপদীর আট - আট - দশ বা ৮।। ৮।। ১০। রূপের দীর্ঘ বিভাগ নিম্নোক্ত পদে লক্ষিত হয়। যথা ঃ

নিধুবনে দুহুজনে।। চৌদিকে সখীগণে।। ৮।। ৮।।
শুতিয়াছে রসের আলসে। ১০।
নিশি শেষে রসমুখী।। উঠিলেন স্বপ্নদেখি।।
কাঁদি কাঁদি কহেন বঁধু পাশে।। (৫৪ সংখ্যক, পৃ - ৯৩৩)

এখানে ত্রিপদীর ৮।। ৮।। ১০। বন্ধ অনুসৃত। তবে 'চৌদিকে' শব্দে তিনমাত্রার স্থলে চার মাত্রা ধরতে হবে। তেমনি 'কাঁদি কাঁদি কহেন বধু পাশে' - পদ্যাংশে এগার মাত্রার স্থলে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে দশ মাত্রা পাঠ করতে হবে।

৩২ সংখ্যক পদে কলাবৃত্তের ত্রিপদী বন্ধে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। প্রথম দু'-পংক্তিতে যথাক্রমে ৬।। ৬।। ৯। ও ২।) ৬।। ৬।। ১০। বিভাগ। পরবর্তী পংক্তিতে তা হয়েছে ২।) ৭।। ৭। ১০।। যথা ঃ

আজু এক অপ।। রূপ রূপক।। ৬।। ৬।।
ভূপদরশন ভেল। ৬। ৩।
(জনু) মেলি জলধর।। ধরণী উপর।। ২) ৬।. ৬।।
সৌদামিনী ..... করু। কেল।। ৭। ৩।
(জনু) বিকচ কাঞ্চন কমলে বিলসই ২) ৭।। ৭।।

চপল খঞ্জন জোর। ১০। (৩২)

ছন্দের মধ্যেও অপূর্ব শব্দঝঙ্কার ও ধ্বনি প্রবাহ সৃষ্টি জগদানন্দকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। সর্বদাই তিনি ছিলেন ধ্বনি সচেতন শিল্পী।

জগদানন্দ : অলঙ্কার

জগদানন্দ ব্রজবুলি ভাষায়ই প্রধানত পদ রচনা করেছেন। ব্রজবুলি ভাষার বড় সম্পদ এর শব্দ ব্যবহারে ধ্বনিঝঙ্কার সৃষ্টি হওয়া। কবিও এর ব্যতিক্রম নন। এই ধ্বনিঝঙ্কার থেকেই তাঁর পদে এসেছে শব্দালঙ্কার। এবং অর্থালঙ্কারও কবি মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন। প্রথমে শব্দালঙ্কার ব্যবহার কৌশল লক্ষণীয়।

জগদানন্দের কিছু পদে এক একটি বিশেষ বর্ণনা প্রাধান্য হেতু সেই বর্ণের অপূর্ব ধ্বনিসাম্য শ্রুত হয়। যেমন -'ন' বর্ণের শব্দ

নিতুই নৌতুন নিগূঢ় নিজরস নীরনিধি নিরমাই।
নিয়ত নিমগণ ন জানে নিশিদিন নদিয়ানন্দ সদাই (১১ নং পদ, ওই, পৃ৮৭৯)

নিজ রসরূপ সমুদ্রে গৌরাঙ্গ সর্বদা নিমজ্জিত থাকেন। 'ন' এর ধ্বনি অনুপ্রাসে পদটিতে গুন গুন সুর উঠেছে। এই রকম আরও পদের মধ্যে 'চ' বর্ণ সমৃদ্ধ (১৩ নং, পৃ - ৮৮০) ও 'প' বর্ণের পদ (২৪ নং পদ, পৃ - ৮৮৪) লক্ষণীয়। ২ নং পদটিতে (৮৭৫ পৃষ্ঠা) সুন্দর অনুপ্রাস অলঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে।

ঘন ঘন গগনে মগন রজনীকর
কর দর শাই রুদত একতান।।

এখানে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে আবৃত চন্দ্রের অবস্থানকে 'গ, ঘ'-এর ধ্বনি অনুপ্রাসে গাম্ভীর্য দেওয়া হয়েছে। গৌরাঙ্গের কান্নার সুর 'ন, র' ধ্বনির অনুপ্রাসে প্রাণ পেয়েছে।

৪৫ সংখ্যক পদটিতেও (পৃ - ৮৯৪) 'ম, ন, ঞ' এর ধ্বনি অনুপ্রাস পদটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। যথা ঃ

মৃগমদে তনু অনু রঞ্জন মঞ্জন
অঞ্জনে কঞ্জনয়ান।।

বৃত্ত্যনুপ্রাসের ব্যবহারেও পদে ধ্বনিমাধুর্য ও শ্রুতি মাধুর্য এনেছেন—

হতশায়ক দুখদায়ক রতি নায়ক ভাগে।
(৪৮ সংখ্যক, পৃ - ৮৯৬)

রসালসের আলস্যরূপটি এখানে 'য়, ক' আশ্রয়ে মন্থর। অবশ্য এর পূববর্ত্তী বর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণও (শা-য়ক, দা-য়ক, না-য়ক) একে তরান্বিত করেছে।

জগদানন্দ

জগদানন্দের পদে অর্থালঙ্কারও ব্যবহৃত হয়েছে - লক্ষ্য করা যায়। উপমা রূপক ব্যতিরেক সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার তাঁর পদে ব্যবহৃত। উপমা অলঙ্কারের সাহায্যে গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনা করতে ১৬ নং পদে (পৃ - ৮৮১) এনেছেন - বদনের উপমায় শারদ ইন্দু, দন্তের উপমায় কুন্দ ফুল, পাতলা অধরের উপমায় নব বন্ধুক ফুল এবং নয়নের উপমায় ইন্দীবর ও চরণের ছাঁদের উপমায় অরবিন্দ (রক্ত পদ্ম)। অবশ্য এই উপমা ব্যবহারে মৌলিকতা নেই।

৪৯ সংখ্যক পদে (পৃ - ৮৯৭) উপমার নতুনত্ব ও চমৎকারিত্ব আছে। এখানে দেখি -

147

"গত যামিনী জিত - দামিনী
কামিনী কুল লাজে।।" —অর্থাৎ কামিনী কুলকে লজ্জায় ফেলে রাত যেন বিদ্যুতের মত দেখা দিয়েই অন্তর্হিত হোল। মিলন রাত্রির স্থায়িত্ব বিদ্যুতের মত ক্ষণিক বলে মনে করেছেন কবি এই চমৎকার উপমায়। ৭ সংখ্যক পদে (পৃ - ৮৭৭ - ৭৮) গৌরাঙ্গের দেহের উপমায় কবি এনেছেন স্থির বিদ্যুৎ-এর চিত্র। থীর বিজুরিসম অঙ্গ।

১২ সংখ্যক পদে (পৃ - ৮৮০) ব্যতিরেক অলঙ্কার প্রয়োগে গৌরাঙ্গের অনুপম রূপলাবণ্য কবির তুলিতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। যদিও এই বর্ণনা গতানুগতিক প্রথাগত অলঙ্কার প্রয়াসেই সীমাবদ্ধ, তবু কোন কোন বর্ণনায় চমৎকারিত্ব লক্ষণীয়—

'জীতলি শীতল কিরণে হিরণ - মণি
দলিত ললিত হরিতাল।।' —গৌরাঙ্গ তাঁর শীতল অঙ্গলাবণ্যের দ্বারা উপমান স্বর্ণ ও মণির দীপ্তিকে ম্লান করেছেন। তিনি লালিত্যে এতই মধুর যে দলিত হরিতাল ও তার সমকক্ষ নয়। 'ল' এরধ্বনি অনুপ্রাস ও কোমলতা পদটির অলঙ্কারকে গভীরতা দিয়েছে।

রূপক অলঙ্কারেও কবি চাতুর্য দেখিয়েছেন। লৌকিক উপাদান গ্রহণ করে বর্ণনীয় বিষয়ের জনপ্রিয়তাও বর্দ্ধিত করেছেন। ৫১ সংখ্যক পদটিতে (পৃ - ৮১৮) দেখা যায় রূপক অলঙ্কারের ব্যবহার—

"নন্দের দুলাল চাঁদ পাতি রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে।।
দিয়া হাস্য সুধাচার অঙ্গছটা আঠা তার
আঁখি - পাখি তাহাতে পড়িল।
মনমৃগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে
শূন্য দেহ - পিঞ্জর রহিল।।
চিত্ত শালে ধৈর্য্য হাতী বান্ধা ছিল দিবারাতি
ক্ষিপ্ত হইল কটাক্ষ - অঙ্কুশে।
দম্ভের শিকল কাটি চারিদিকে গেল ছুটি
পলাইয়া গেল কোন দিশে।"

এখানে শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাধের সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি। রূপের ফাঁদ পেতে তিনি কদমতলায় অপেক্ষমান। ফাঁদ পেতেছেন তাঁর হাসিসুধা রূপ চার বা খাদ্য এবং তার অঙ্গ ছটা রূপ আঠা ছিল ফাঁদে। রাধার আঁখি রূপ পাখি সেই ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে। রাধার মন রূপ হরিণী তাঁর দেহ রূপ পিঞ্জর শূন্য করে রূপজালে আবদ্ধ হয়েছে। তাঁর চিত্তশালায় বাঁধা ধৈর্য রূপ হস্তী কৃষ্ণের কটাক্ষ-রূপ অঙ্কুশাঘাতে ক্ষিপ্ত। রাধার দম্ভ রূপ শিকল কেটে মন যে কোনদিকে পালিয়েছে তার নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। উপরে বর্ণিত রূপকের মাধ্যমে রাধার আক্ষেপানুরাগটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

গৌরাঙ্গের মুখ সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি সন্দেহ অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন।

'মুখকিএ কমল কমল নহ মুখ কি এ
মুখ নহ কমল বা হোয়।' (১৯ নং পদ, পৃ - ৮৮২)

এখানে গৌরাঙ্গের মুখ কি পদ্ম, না পদ্ম নয় মুখ - একবার মনে হয় মুখ একবার মনে হয় পদ্ম। এই উপমেয় ও উপমানে সন্দেহ থেকেই এই অলঙ্কার সৌন্দর্য লাভ করেছে।

৮ নং পদে (পৃ - ৮৭৮) সমাসোক্তি অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রমক্লান্ত গৌরাঙ্গের দেহ নির্গত ঘর্ম জল শীতল পবনে পান করছে। মৃদু শীতল মলয় বাতাসের উপর সচেতনতার আরোপ করা হয়েছে এখানে। যথা ঃ

'ছরম ঘরম জল পিবি চলু মৃদু মৃদু
শীতল মলয় সমীর।।'

প্রচলিত অলঙ্কার গুলিই পুনঃ রচনা করলেও কবি প্রকাশ চাতুর্যে নবত্ব দান করতে সক্ষম হয়েছেন। এখানেও তাঁর শব্দ প্রযোজনায় দক্ষতার পরিচয় স্পষ্ট।

জগদানন্দ : চিত্রকল্প

গৌরাঙ্গের জন্মগ্রহণ কালে নদীয়ার মানস প্রকৃতির সুন্দর চিত্র উপস্থিত করেছেন কবি ১ নং পদে (পৃ - ৮৭৫)।

নদীয়া - ভূধরে - নীল অম্বরে
গৌর দরশন দেল।
উদয় - ভুভৃতে রাহু কবলিত
আধশশি উগি গেল।।'' —উদয়াচলে রাহুগ্রস্ত অর্ধশশি উদিত হল। ওদিকে নদীয়ার (নবদ্বীপ) নীল আকাশে গৌরাঙ্গ দর্শন দিলেন। গৌরাঙ্গের সঙ্গে চন্দ্রের এবং তৎকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ রাহুগ্রস্ত অন্ধকার আকাশের প্রেক্ষাপট কল্পনায় ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

১০ নং পদে (পৃ - ৮৭৯) গৌরাঙ্গের দেহকান্তির অপূর্ব চিত্র উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে কবি উপস্থাপিত করেছেন। অবশ্য উৎপ্রেক্ষার সংশয় অপেক্ষা চিত্রের অপূর্ব দীপ্তি এখানে প্রকট। যথা ঃ

'আধ অম্বর আধ সম্বর আধ অঙ্গ সুগোর।
(জনু) জলদ সঞে অতি বাল রবিছবি নিকসে অধিক উজোর।।'

—গৌরাঙ্গের অর্ধবক্ষ অর্ধ বস্ত্রে আবৃত, তাই তাঁর গৌরতনু অর্ধ প্রকাশিত। এই অর্ধস্ফুট দীপ্ত অবস্থাটি যেন মেঘের সাথে মিলে প্রভাত সূর্যের রশ্মিচ্ছটার উজ্জলতর প্রকাশের মত দীপ্তিতে ভাস্বর।

রাধার পূর্বরাগের এই অংশে চিত্রকল্পের সুন্দর আরোপ দেখা যায়

না হেরি ধেনু ধুসর ধুলিধারা। গগনহি পৈঠল করু আঁধিয়ারা।।'

(৩৫ নং পদ, পৃ - ৮৯০)

কৃষ্ণকে দেখতে উন্মত রাধা ছুটেছেন। কিন্তু দেখলেন যে, ধেনুর পাল দৃষ্টি বহির্ভূত হয়েছে। শুধু তাদের যাওয়ায় খুরের আঘাতে উত্থিত ধূলিজালে গগনে আঁধার নেমে এসেছে। সেই আঁধারে কৃষ্ণ দৃষ্টি - অন্তরালে চলে গেছেন।

নিম্নোক্ত পদটিতে দেখি রাধার মান অত্যন্ত প্রবল। সেই প্রবল মান কৃষ্ণের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তিরোহিত হল। রাধার এই ভাবটি বোঝাতে কবি অপূর্ব কৌশলে চিত্র ব্যবহার করেছেন - রাধার মান মেঘের তুল্য, কৃষ্ণের নিশ্বাস পতনে তা উড়ে গেল এবং রাধার মনের মেঘ তিরোহিত হয়ে উজ্জ্বল চন্দ্রতুল্য মুখ প্রকাশিত হল—

মান জলদ সঞে নিকসয়ে মুখশশী
কানুক দীঘ নিশাসে। (৪৬ সংখ্যক পদ, পৃ - ৮৯৫)

গ্রন্থসূত্র

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : বৈষ্ণব পদাবলী (সাহিত্য, সংসদ, ১৩৮৬) পৃ-৮৭৫ পার্শ্বস্থ সংখ্যা পদসংখ্যা সুচিত করে।

শশিশেখর : ভাষা

চৈতন্য পরবর্তী অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি শশিশেখর। পদাবলী রচনায় তিনি ব্রজবুলি এবং বাংলা উভয় ভাষা মাধ্যমই ব্যবহার করেছেন। ব্রজবুলির সঙ্গে সংস্কৃত পদ এবং সংস্কৃত ভাষার পদও তাঁর পদ রচনায় দেখা যায়। ভাষা ব্যবহার - ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কবিদের মত তিনিও ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে স্বরভক্তি, স্বরসঙ্গতি প্রভৃতি গ্রহণ করেছেন রচনার নানা প্রয়োজনে।

তাঁর ব্যবহৃত কিছু স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের উদাহরণ ঃ

মুকুতা[১] (১নং পদ) শিরিফল (৫ সংখ্যক), অদভুত (৬ নং পদ), পরমাদ, তপত (৬ নং পদ) উলটা (৭ সংখ্যক পদ), দরশন (১২ নং পদ), কিরিতি (১৩ নং পদ), পরকাশ (২৫ নং পদ) পরবন্ধক (১৪) জনমে (২৬ নং পদ), নিরমল (২৯ সংখ্যক পদ) ভরম (১ নং পদ) প্রভৃতি। এখানে যুগপৎ ছন্দমাত্রা ও ধ্বনিমুধুরতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। স্বরসঙ্গতির দৃষ্টান্ত—

ভুলল (১ নং পদ), সমানা (৪ নং পদ) চলল, মিলল (৫ নং পদ) নিতি (২৩ সংখ্যক) ইত্যাদি।

ছন্দসাম্য রাখার প্রয়োজনে স্বরভক্তির মধ্যেও বর্ণলোপ কবি ব্যবহার করেছেন। যথা - উলসিত (২১ নং পদ), নিরলজ (১৫ নং পদ) ওঠ (৫ নং পদ) ভমর (৬ নং পদ) ইত্যাদি। শব্দরূপের উল্লেখ্য ব্যবহার হল ক্রিয়া পদের শেষে উত্তম পুরুষে 'লুঁ' প্রত্যয় যোগ করা। যথা - পেখলুঁ (১ নং পদ), রহিলুঁ (১০ সংখ্যক) আইলুঁ, গাঁথিলুঁ, ধরিলুঁ, পাইলুঁ (১২ নং পদ) মলুঁ (২৩ নং পদ), খোয়লুঁ (২৯ সংখ্যক) প্রভৃতি।

১ নং পদের প্রত্যেক পংক্তির শেষ শব্দটিতে অনুস্বার যোগ করেছেন কবি। যথা ভরমং, শ্যামং, বাঘং, দামং, শোভং। সম্ভবতঃ সংস্কৃতায়িত করা প্রচেষ্টা। ধ্বন্যাত্মক শব্দের মধ্যে আছে, লঁহু, লহুঁ, (৬, ৭ নং পদ ইত্যাদি) ঢুলু ঢুলু (১৬ নং পদ) ধব ধব (৩ নং পদ), কাক্কা কাক্কা (৩ নং পদ) ইত্যাদি।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি প্রধানতঃ পূর্বসুরীদেরই অনুসরণ করেছেন।

শশিশেখর : ছন্দ

ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শশিশেখর অত্যন্ত সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। জয়দেবের বিদ্যাপতির ও গোবিন্দদাসের কলাবৃত্ত ছন্দের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

কলাবৃত্তের বিভিন্ন বন্ধের মধ্যে আছে একপদী বন্ধ ৫ পর্বমাত্রা ভাগের ছন্দ—

নৃপতি সুখ। বাঞ্ছ যদি। ৫। ৫
ব্রজে কি মন। মানে না। ৫।৫।
গোপ কুলে। বসতি কেবা।
নন্দ ঘোষে। জানেনা।। (৩১ সংখ্যক, পৃ - ১৩৫৩)

এখানে পর্বমাত্রা ভাগ পাঁচ - পাঁচ - পাঁচ - পাঁচ বা ৫।৫।৫।৫। - এই রূপে।

150

কলাবৃত্তে একপদীতেও ৬ পর্ব মাত্রার পদ রচনা করেছেন শশিশেখর। যথা ঃ

আওয়ে ছি—। দাম চন্দ্র। ৬।৬।
রঙ্গিয়া পাগুড়ি। মাথে। ৬।৪।
সুবলার্জুন। অংশুমান।
দাম বসুদাম। সাথে।। (২নং পদ, পৃ - ১০৪৪)

এখানে পর্বমাত্রাভাগ ছয় - ছয় - ছয় - চার - বা ৬। ৬। ৬। ৪। ভাগে। তবে 'রঙ্গিঁয়া' শব্দটিকে সংশ্লেষিত উচ্চারণে তিন মাত্রা পাঠ করতে হবে।

কলাবৃত্তের একপদী বন্ধের ছোট রূপ পাই নিম্নোক্ত পদে। যথা ঃ

হরি - অভিসার। কাজে। ৬। ৩
উলটা সকল। সাজে।।
মাথে মুকুতার। মালা।
হিয়াতে হেম - মেঃখলা।। (৭ নং পদ, পৃ - ১০৪৬)

কলাবৃত্তের ত্রিপদী বন্ধের বেশ কিছু পদ ব্যবহার করেছেন কবি। প্রথমে ত্রিপদীর আট - আট - বারো বন্ধ—

কি করবি। দসদিন। দুঃখ লালটে ছিল।। ৮।। ৮।।
চিরদিনে। যে লিখল। ধাতা। ১২।
তাকর। লাগি নিজ।। দেহ খোয়ায়বি।।
খায়বি। সখচরি। মাথা।। (৩০ নং পদ, ১০৫০ পৃষ্ঠা)

এখানে ত্রিপদী ৮।। ৮।। ১২। বন্ধটি প্রয়োগ করেছেন কবি।

ত্রিপদির আর একটি দীর্ঘ রূপ ব্যবহার করেছেন কবি। এক্ষেত্রে পক্ষ পার্বিক মাত্রা বিভাগ করে দশ পদমাত্রার রূপ বন্ধ অনুসৃত। এই ছন্দের বন্ধে জয়দেবের বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদীঃ'' (গীত গোবিন্দম্, দশম সর্গ, শ্লোক-২) পদের ছন্দ অনুসারিত। যথা ঃ

সাতল তছু। অঙ্গ দেখি।। সঙ্গ-সুখ। লালসে।। ১০।। ১০।।
খোয়লুঁ কুল। ধরম-গুণ। নাশে। ১৪।
সোই যদি তেজল কি।। কাজ ইহ। জীবনে।।
আনহ সখি। গরল করি। গ্রাসে।। (২৯ নং পদ, পৃ - ১০৫২)

এখানে ছন্দ বন্ধে পাঁচ পর্বমাত্রার বিভাগ পরলে এর রূপটি হয় - ৫। ৫।। ৫। ৫।। ৫। ৫। ৪। বা ১০।। ১০।। ১৪। অর্থাৎ এই রূপটিকে খুব সহজেই জনপ্রিয় করা যায় জয়দেবের অনুসঙ্গে।

চৌপদী বন্ধের কলাবৃত্ত ছন্দেও আপনার ছন্দ সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছেন কবি—

আজি অদভূত। তিমির রঙ্গ।। ৬। ৬।।
আপনি না চিনি। আপন অঙ্গ।। ৬। ৬।।
নিরখি রাইক। মন-মাতঙ্গ।। ৬। ৬।।
অঙ্কুশা নাহি। মান রি। ৬। ৪।
সাজল ধনি। শ্যাম - বিহার।।
শিখিলিকৃত। কবরি - ভার।।

নীলোৎপল। রচিত হার।।
কণ্ঠহি অনুপাম রি।। (৬ নং পদ, পৃ - ১০৪৬)

এখানে ছন্দবন্ধো ১২।। ১২।। ১২।। ১০।।

বাংলা পদের সংখ্যা শশিশেখরের কম হলেও ছন্দের বৈচিত্র্য তিনি সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রে মিশ্রবৃত্ত (অক্ষর বৃত্ত) রীতিই ব্যবহৃত।

মিশ্রবৃত্তের ১১ মাত্রার পদ এইটি ঃ

তনু পরচিঞা। রসের ভরে। ৬। ৫।
আপনার তনু। ধরিতে নারে।। ৬। ৫।
সখীগণ সঙ্গে। সঙ্গীত গায়।
কেহ তাল ধরে। কেহ বাজায়।। (৯ নং পদ, পৃ - ১০৪৭)

মিশ্রবৃত্তরীতির দ্বিপদী প্রয়োগ (পয়ার) এই পদটিতে দেখা যায়। যথা ঃ

কুলের বাহির হৈয়া।। কেনে বা আইলুঁ। ৮।। ৬।
সুগন্ধি ফুলের মালা।। কেনে বা গাথিলুঁ।।
কেনে বা কুসুম শেজ।। সাজাইলি তোরা।
কেনে বা চন্দন ভরি।। ধরিলুঁ কটোরা।। (১২ নং পদ, পৃ - ১০৪৭)

এখানে পদমাত্রা বিভাগ - ৮।। ১২।। মিশ্রবৃত্তের ত্রিপদী বন্ধটি এইরকম ঃ

এই যে নাগরী।। আধারিল হরি ৬।। ৬।
নিশ্চয় কহিলুঁ তোরে। ৮।
প্রাণের গোবিন্দ।। পাইয়া আনন্দ
সঙ্গতি লইল যারে।। (২৫ নং পদ, ১০৫১ পৃষ্ঠা)

এখানে ত্রিপদীর লঘু রূপটি অর্থাৎ ৬ - ৬ - ৮, তিনি অনুসরণ করেছেন কবি।

আবার নিম্নোক্ত পদটিতে দলবৃত্তের মত ছন্দ ব্যবহৃত।

বাজীকর। বেশ করত। বৃন্দাবন। চান্দ। ৪।৪।৪। ২।
কণ্ঠে ছিদ্র। কড়ির মাল। জগমোহন। ফান্দ।। (২০ সংখ্যক, পৃ-১০৫১)

শশিশেখর : অলঙ্কার

অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে শশিশেখর শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার দুদিকেই নজর দিয়েছেন। শব্দালঙ্কারের মধ্যে ধ্বনি অনুপ্রাস প্রধান যথা ঃ—

অঙ্গাকৃতি ভঙ্গী বাঁকা বঙ্কিম সুচাহনি।

করেতে বাঁশী আধরে হাসি শোভং।
(১ নং পদ, পৃ - ১০৪৪)

এখানে 'ঙ্গ', 'ক', 'ব', 'ল' প্রভৃতির ধ্বনি অনুপ্রাস সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণের রূপের মধ্যে যে প্রচন্ড আকর্ষণীয় ক্ষমতা আছে তাকে কবি ধ্বনিমাধুর্যে ব্যক্ত করেছেন। অর্থালঙ্কার ঃ ৬ নং পদে (পৃ-১০৪৬) অভিসারিকা রাধার সুন্দর চিত্র উপস্থিত করেছেন কবি উৎপ্রেক্ষা-র সাহায্যে—

'নীল বসন সোনার গায়—
মেঘে কি বিজুরি লুকিয়া যায়' — রাধার সোনারবর্ণ দেহে নীল

বসন যেন মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ রেখার ন্যায় প্রতিভাত।

১৬ নং পদটিতে (পৃ - ১০৪৮) খন্ডিতা রাধা অন্যনারী উপভুক্ত কৃষ্ণকে তীক্ষ্ম ব্যঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত করেছেন। কৃষ্ণের অলস - মলিন দেহকে রাধার ধারালো সমীক্ষা দৃষ্টি পর্যুদস্ত করেছে। যথা ঃ

তরুণারুণ নয়নাম্বুজ ঢুলু ঢুলু ঢুলু অলসে।
দেখ্য দেখ্য দেখ্য পড়িবা পড়িবা শুতি রহ যায়্যা দিবসে।।
ঝামর বদনাম্বুজ দেখি সিন্দুরে কাজরে মাখা।
কামিনী - কুচ কঙ্কুম সহ বুকে যাবক - রেখা।।

—কৃষ্ণের দীর্ঘ সূর্য তুল্য পদ্মাক্ষি আলস্যে ঢুলু ঢুলু, তাঁর শয়ন কাতর শরীর দিবসেই ঘুমন্ত মলিন কমল তুল্য মুখ মন্ডলে কাজল ও সিন্দুর লেগে গেছে। বুকে পরনারীর কুচ - কুঙ্কুম এবং পদশোভার আলতার দাগ লেগেছে। এখানে উপভুক্ত মলিন কৃষ্ণের উপমাচিত্র কবি এঁকেছেন খন্ডিতা রাধার দৃষ্টিতে। এছাড়া 'ন, ল, র, ক, ম,' প্রভৃতি ধ্বনি সুষমা ধারাবাহিক উপমাপ্রয়োগ পদটিকে অলঙ্কার চিত্রের সাম্য দান করেছে।

৮ নং পদে (পৃ ১৩৪৬) কৃষ্ণ রাধার পায়ের উপমায় শিরিষ ফুলের কোমলতাকে উপমিত করেছেন সুন্দর ভঙ্গীতে। যথা ঃ —

"শিরীষের ফুল হইতে কোমল
রাতুল চরণ তোর।।

শশিশেখর : চিত্রকল্প

অভিসারিণী রাধার ব্যাকুল মানসিকতার জীবন্ত আলেখ্য এঁকেছেন শশিশেখর ৭ নং পদে (পৃ - ১০৪৬)। উৎকণ্ঠিত রাধা অভিসার যাত্রায় নিজেকে সাজিয়েছেন, কিন্তু তাঁর খেয়াল নেই যে সাজসজ্জা সবই উল্টো করে বসে আছেন। যথা ঃ

মাথে মুকুতার মালা। হিয়াতে হেম - মেখলা।।
চরণে কঙ্কণ পরি। ত্বরিতে চলিলা গোরি।।
নূপুর পাণির মুলে। অঞ্জন রঞ্জন ভালে।।
সিদুঁরে অরুণ আঁখি। চিবুকে চন্দন মাখি।।

রাধিকা মাথায় পরেছেন মুক্তোমালা, যা কিনা গলদেশের শোভাবর্ধক, কটিদেশের মেখলা তুলে এনেছেন বক্ষে, পায়ের নিক্কনকারী নুপুর শোভিত হচ্ছে হাতে, কাঞ্চনবর্ণ কপাল চোখের কাজলের সাহায্যে রঞ্জিত করেছেন, আর লালাটের সিঁদুর পরেছেন চোখের কাজল রূপে, যে চন্দনে গাত্র মার্জনা হয় তার সাহায্যে গন্ডদেশ মার্জনা করেছেন। এই ভাবে এক কিম্ভুতকিমাকার বেশে রাধা দ্রুত চলেছেন অভিসারে। রাধার এই রোমান্টিক আত্মসমাহিত রূপটি কবি অপূর্ব কৌশলে চিত্রায়িত করেছেন তাঁর পঞ্চেন্দ্রিয় বিকল করে দিয়ে। কবির উপস্থাপনাও পদান্ত ধ্বনিমিলের মধ্যে দিয়ে হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। কৃষ্ণের বিচিত্র রূপসজ্জার একটি হলো বাজীকর বেশ ধারণ। বাজীকরের রূপচিত্র আঁকতে গিয়ে কবি বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন।[২] কৃষ্ণের এই রূপটি কবির ভাষায় ঃ—

বাজীকর বেশ করত বৃন্দাবন চান্দ।
কণ্ঠে ছিদ্র কড়ির মাল জগমোহন ফান্দ।।

বাহু দন্ডে স্ফটিক মাল বাঁধন বহু ছান্দে।
গিরি গৈরিক তনু - লেপন ভার করল কান্ধে।।
যুগল পানি পাদমূলে লৌহাঙ্গদ বালা। কর্ণমূলে কিয়ে শঙ্খ কুন্ডল করু খেলা।।
মল্লছান্দে পিন্ধল হরি জীর্ণমলিন বাস। শিরে বান্ধল পাগ লট পটি শশিশেখর হাস।।
(২০ সংখ্যক, পৃ-১৩৫৩)

কৃষ্ণের গলায় দুলছে জগতের ফাঁদ স্বরূপ ফুটো কড়ির মালা। তাঁর বাহুতে স্ফটিক - মালা বহু ছাঁদে বাঁধা এবং হাতে যাদু দন্ড। গায়ে লেপেছেন গৈরিক বর্ণের ছোপ, দু পায়ে ও হাতে লোহার বালা। কর্ণমূলে পরিধান করেছেন শাঁখের কুন্ডল। সর্বোপরি মাথায় পাগড়ি বাঁধা রয়েছে যা তাঁর নড়াচড়ার সময় লটপট করছে। এই সব অলঙ্কার ও জীর্ণ বেশ পরিধান করেছেন মল্লবীরদের মতো ছন্দে। কবি নিজ অঙ্কিত এই কৃষ্ণমূর্তি দেখে নিজেই হাসছেন, অতএব পাঠকের এবং দর্শকের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এই চিত্রাঙ্কনের মধ্যে দিয়ে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, গোষ্ঠী চেতনার মধ্যে থেকেও কবির কল্পনা প্রবণ মনটি নিরস বিশুষ্ক হয়ে যায়নি। বা, বৈষ্ণবদর্শনের অলৌকিক পরিমন্ডলে থেকেও সমাজ - সংসার তথা লোকজীবন তাঁর কাছে অদৃশ্য হয়ে যায়নি। যদিও চিত্রকল্প হিসেবে এটি আধুনিক অর্থে সার্বিকভাবে সফল হয়নি, তথাপি কিছুটা সীমাবদ্ধ অর্থে - এর আবেদন স্বীকার্য।

৫ নং পদটিতে (পৃ-১০৪৫) রাধার অভিসারিকা রূপটি কবি অপূর্ব কৌশলে সৌন্দর্য - মন্ডিত করেছেন। যথা ঃ

নিশি সঙ্গে অঙ্গ মিশাল করি।
শশি কহে কুঞ্জে মিলল গোরি।।

তিমিরাভিসারের পদটিতে রাধা নিসর্গের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিধান করেছেন মেঘ - রুচি শাড়ী।

বরলামের গোষ্ঠ সজ্জায় নিম্নোক্ত পদটিতে কবি রাখাল বালকের চিত্র এঁকেছেন সাদামাটা ভঙ্গিতে, কিন্তু গভীর হৃদয়াবেগ ফুটে উঠেছে এতে -

বুক বাহি পড়ে। মুখের লালা। শ্বেত কমলের মধুরে।। (৩ নং পদ, পৃ. ১০৪৫)

বালকের মুখ নিঃসৃত লালা বুক বেয়ে ঝরে পড়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারটি কবির চোখে দৃশ্যময় হয়ে উঠেছে অন্য মাধুর্যে-যেন শ্বেত পদ্মের মধু নিঃসৃত হচ্ছে। নিতান্ত ঘরোয়া ভাবটি, তুচ্ছ ব্যাপারটি কবির মমতা স্পর্শে চিত্রময় হয়ে উঠেছে। এখানেই তাঁর কবিভাষা ও কবি ব্যক্তিত্বের উদ্দীপনা পরিস্ফুট।

গ্রন্থপঞ্জী

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : বৈষ্ণব পদাবলী (সাহিত্য সংসদ) ১৩৮৬, পৃ-১০৪৪। (পার্শ্বস্থ সংখ্যা পদসংখ্যা সূচিত করে)

২. M. H. Abrams : A Glossary of Litarary Terms (3rd Edn, 1970), P-76. [Imagery is used more narrowly, to signify only descriptions of visible objects and scenes, especially if the description is vivid and particularised...]

লোচনদাস : ভাষা

চৈতন্য - পরবর্তী পদকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লোচনদাস (১৬শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) । বৈষ্ণব পদবলী সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অবদান লৌকিক ছন্দ তথা দলবৃত্ত ছন্দ - প্রবর্তনে। তবে তাঁর হাতে এই ছন্দটি অনায়াস ভঙ্গীতে উপস্থিত হয়েছে ভাষা ব্যবহারের কৌশলেও। তাঁর পদাবলীর ভাষাও লৌকিক ছন্দোপযোগী।

লোচনের ভাষায় লক্ষণীয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাপিকা বা অসমাপিকা ক্রিয়ার বর্তমান কালের রূপে 'ইয়া' প্রত্যয়ের 'য' ফলায় রূপান্তর। যথা ঃ পর‍্যাছে, দুল্য, বাজ্যা, চল্যা, ভর‍্যা)২নং) ১, শুন্যাছ, কঁদ্যা, ভাস্যা (৯), দাঁড়ায়্যা (৪৩) ঠার‍্যা, আখ্যা (৪৭), পায়্যা (৫০), লাগ্যা (৫২) ঢাক্যা, ক্যড়্যা, ধুল্যা (৫৬) ইত্যাদি। উপরোক্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখি কবি লোকায়ত গ্রামীন সমাজের কথোপকথনের ভাষাই যেন পদাবলীতে সংযোজন করেছেন। বহু গ্রাম্য শব্দও নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর পদে। যথা ঃ ঝুঁটা (চুলের খোঁপা) (২), হুড় পড়িয়াছে সরুয়া কাঁকালি (কোমর) (৪), রান্ধন, বাঁটন (৯), উলখুল (৪৫), খর খরাইতে কাঁপে (৪৯), মায়্যা (মেয়ে) (৫৮) ইত্যাদি। এছাড়া কিছু স্ল্যাঙ্গ (Slang) জাতীয় শব্দও ব্যবহৃত হয়েচে। যথা ঃ থুবরা, গবরাখাগী, ছারকাপালী (৫০), ডিঙ্গর (৫৫), বিড়ালনী (৫১), পাপিষ্ঠা মাগী, ঠেটাঁ বুড়ী, মর্দ (৫৮) প্রভৃতি। শব্দগুলিকে লোচন অদ্ভুতভাবে তাঁর পদাবলীতে সংযোজন করেছেন। সম্ভবতঃ এজন্যই লোকসমাজে তাঁর পদ ধামালি ঢঙে পৌঁছেছিল। তাঁর সবিশেষ কৃতিত্ব যে এই ধরণের শব্দাবলী যুক্ত পদকে তিনি আপন কবি ব্যক্তিত্বে তুলে ধরেছেন। লোচনের ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য ও এই যে তিনি হাতের কাছে পাওয়া গ্রাম্যশব্দকেই পদাবলীর রচনা মাধ্যম করেছেন। এটি তাঁর কবি মনের সাহসেরও পরিচায়ক।

লোচনদাস : ছন্দ

লোকায়ত ভাষার ব্যবহারে যেমন লোচন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তেমনি ছন্দ - ব্যবহারেও তিনি বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছেন। প্রচলিত ব্রজবুলি প্রভাবিত কলাবৃত্ত বা গুরুগম্ভীর বাংলা মিশ্রবৃত্ত ছন্দোরীতির পরিবর্ত্তে তিনি ব্যাপকভাবে অনুশীলন করেছেন দলবৃত্ত ছন্দের। দলবৃত্ত বন্ধের পদের মধ্যে আছে—

শ্রবণ হরিয়া নিল। বংশী।
মন মনমথ অহি দংশী।।
শ্যাম দু আঁখর মন্তর।
জপে কাঁপে বহু অন্তর।। (৩৭)

এখানে দলমাত্রা ভাগ হয়েছে আট - দুই ভাগে। অবশ্য সর্বত্রই একই বিভাগ নেই।

একপদী বন্ধের আর একটি রূপ বৈচিত্র্য হলো চার - চার - চার - এক (৪। ৪। ৪। ১।) বন্ধ। যথা ঃ

শিশুকালের। ভালবাসা। তোমরা বল। কি।
কিসের লাগ্যা। ডর করিব। বাপের ঘরের। ঝি।। (৫২)।

দলবৃত্ত রীতির দ্বিপদী বন্ধের অনেক পদ লক্ষিত হয় লোচনের পদাবলীতে। যথা ঃ

যুবা মায়্যা। পথে পায়্যা। মধ্যে কিসের। কথা।
হেন বুঝি। দাদার আমার।। হেঁট করিবি। মাথা।। (৫৩)।

এখানে দলবৃত্ত পয়ার ছন্দ। মাত্রাভাগ - আট - ছয় (৮।। ৬।) ভাগে। পর্বভাগ চার মাত্রায়।

দলবৃত্তের ত্রিপদী বন্ধের পদও লোচন ব্যবহার করেছেন। যথা ঃ—

ধবল পাটের জোড় পর‍্যাছে।।
রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়াছে।।
চরণ উপর দুল্যা যাইছে কোঁচা।
বাঁকমল সোনার নুপুর
বাজ্যা যাইছে মধুর মধুর
রূপ দেখিয়া ভুবন মুরছা।। (২)। এখানে পদমাত্রাভাগ হয়েছে আট - আট - দশ (৮।। ৮।। ১০।) বিভাগে। 'বাঁকমল সোনার নুপুর' অংশে দলমাত্রা সংখ্যা - ছয়। এরকম পার্থক্য বহু পদেই লক্ষিত হয়।

কলাবৃত্তের কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত নিদর্শন লোচনের পদে আছে। যেমন ঃ

তুঁহু গোরি ধনি। সে কাল অঙ্গ।
তুঁহু তাহে তাহে ভালে মিলব সঙ্গ।। (৩৯)।

এখানে পর্বমাত্রা ভাগ হয়েছে ছয় - ছয় (৬।৬।) একপদী বন্ধে।

মিশ্রবৃত্ত রীতির ব্যবহৃত ছন্দের মধ্যে দ্বিপদী পয়ার উল্লেখযোগ্য। যেমন ঃ

বন্ধু সে রসিক বটে। নহে তো চতুর।
মুরলীতে করি গান।। জানাইল গোকুল।। (৪৪)

এখানে পদমাত্রা ভাগ ৮।। ৬। ভাগে।

মিশ্রবৃত্ত রীতির লঘু ত্রিপদী বন্ধের মধ্যে আছে ৪৩ সংখ্যক পদটি। যথা ঃ

কি লাগি দাঁড়ায়্যা।। আছ হে নাগর।।
না বুঝি তোহার কাজ।
না জানি সে ধনী কত বা খুঁজিছে
সকল নগর মাঝ।।

মিশ্রবৃত্ত দীর্ঘ ত্রিপদী বন্ধের পদও রচনা করেছেন লোচন। যথা ঃ

শুন গো তাঁহার কাজ।। কহিতে বাসিয়ে লাজ
দেখা হৈল কদম্বের তলে।
বিবিধ ফুলের মালা যতনে গাঁথিয়া কালা
পরাইতে চায় মোর গলে।। (৪৫)

এখানে পদমাত্রা ভাগ হয়েছে ৮।। ৮।। ১০। ভাগে।

লোচনদাসের পদাবলীতে ছন্দোরীতির পরিচয় পাওয়া গেল। তবে, দলবৃত্ত রীতিতেই তাঁর কাব্য প্রতিভা যথার্থ কাব্যভাষা আশ্রয়ে সার্থকভাবে পরিস্ফুট বলে মনে হয়। বাংলা দলবৃত্ত ছন্দের তিনি প্রথম সার্থক রচয়িতা বলে গণ্য করা যায়।

লোচনদাস : অলঙ্কার ও চিত্রকল্প

অলঙ্কার বা চিত্রকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে লোচনদাস তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। কোন কোন স্থলে অবশ্য বাক্যকে অলঙ্কৃত করার চেষ্টা করেছেন। যথা ঃ

সোঙরি সোঙরি প্রাণ কান্দে নিশিদিন।
ছটফট করে যেন জল বিনে মীন।। (১৪)

—এখানে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পর সংসার বিরহে কাতর বিষ্ণুপ্রিয়াকে জল বিমুক্ত

মাছের সঙ্গে উপমা দিয়েছেন কবি। গৌরাঙ্গের বিরহে তিনি ছটফট করেছেন। উপমাটি একেবারেই ঘরোয়া।

চিত্রকল্পের সার্থক প্রয়োগ লোচনদাসের পদে তেমন দেখা যায় না। কোন কোন পদে বিক্ষিপ্ত চিত্রের আভাস ফুটে উঠেছে। যেমন ঃ

রাধার ঘরে কৃষ্ণ রাত্রে ঢুকে পড়েছেন। ব্যাপারটি প্রকাশ হয়ে পড়ায় রাধার ননদিনী ঘরে প্রবেশ করলে কৃষ্ণের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। তাঁর অবস্থাকে কবি বর্ণনা করেছেন - 'থর থরাইতে কাঁপে নাগর ননদিনীর ভয়ে'। (৪৯)।

আর একটি পদে দেখি, কৃষ্ণ রাধার ঘরে রাত্রে চুপি চুপি প্রবেশ করেছেন। রাধা তাঁকে লুকানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁকে লুকানো যাচ্ছে না। কেননা, 'অঙ্গ ছটায় ঘর ঝলমল লুকাইব কতি।' (৫৪)। অর্থাৎ কৃষ্ণরূপেই ঘর আলোয় ঝলমল করছে। তাঁকে কোথায় লুকানো যাবে। এখানে কৃষ্ণের চিত্রটি মহিমময় রূপে এঁকেছেন কবি।

গৌরাঙ্গের রূপলাবণ্যের প্রবল প্রভাবে নবদ্বীপের কুলবধূদের অবস্থা সঙ্গীন। তাঁর প্রতি প্রেমাবশে তারা বিহ্বল। সংসারের রাঁধা বাড়ার কাজকর্ম শিকেয় উঠছে। এই কুলনারীদের চিত্র এঁকে কবি বলেছেন—

কিসের রান্ধন কিসের বাঢ়ন কিসের হলদি বাঁটা। আঁখির জলে বুক ভিজিল ভাস্যা গেল পাটা।। (৯)। এসব স্থলে লোকাভিজ্ঞতাকেই কিছুটা চিত্রাত্মক করে আরোপ করেছেন সুযোগ মতো। এবং এ ব্যাপারে তিনি সক্ষমও হয়েছেন।

প্রমাণ পঞ্জী

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : বৈষ্ণব পদাবলী (সাহিত্য সংসদ, ১৩৮৬) পৃ-৪৭৩। (পার্শ্বস্থ সংখ্যা পদসংখ্যা সূচিত করে)।

উপসংহার

বিভিন্ন বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর কবিভাষা তাঁদের হাতে যে শিল্পসমন্বিত রসমূর্তি লাভ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। এবং তাঁদেরকবিভাষার মধ্যে দিয়ে যে কবিমনের ও কবি ব্যক্তিত্বের চকিত পরশ মাঝে মাঝে ব্যক্ত হয়েছে আলোচ্যে সাধ্যমত দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এক এক জন কবির মানসিকতাও যে এক এক রকম তাও লক্ষিত হয়। যেমন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিদ্যাপতির কবিভাষা আলোচনায় তাঁর যেসব বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করেছি প্রধানত, তা হলো—অপ্রাকৃত চরিত্রাশ্রয়ে চিরন্তন প্রেমগাথা বর্ণনার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট কৃত্রিম 'ব্রজবুলি' ভাষা সৃষ্টি। এবং এই ভাষাকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্যে এর ধ্বনিতাত্ত্বিক-ও রূপতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য সমন্বিত নানা শব্দগ্রহণ সচেতন ভাবে স্বরধ্বনির প্রয়োগে শব্দ কাঠামোয় উচ্চারণ পরিবর্তন প্রচেষ্টা। শব্দের সঙ্গে, বিশেষত শেষে আনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু ঁ যোগে কবিভাষায় মগ্নয়তা (Subjectivity) দানের চেষ্টা এবং ভবিষ্যৎ কালে 'ত' প্রত্যয় যোগে ব্রজবুলিকে সচেতনভাবে মৈথিলি ও বাংলা ভাষা থেকে পৃথকত দানে তৎপরতা। একদিকে তৎসম ও অলঙ্কার বহুল ভাষা ব্যবহারে তাঁর রাজসভাপুষ্ট নাগরিক মন ও বৈদগ্ধ্য এবং অন্যদিকে দেশজ শব্দাবলী, প্রবাদ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহারে কাব্য ভাষাকে জনপ্রিয় করার প্রয়াস পরিস্ফুট হয়। তাঁর ব্যবহৃত ছন্দোরীতি মূলতঃ প্রাকৃত অপভ্রংশ-উদ্ভুত প্রত্ন- কলাবৃত্ত। যদিও এর অনিয়মিত শিথিল রূপটিই তাঁর কবিভাষাকে স্বেচ্ছাগতি দান করেছে। জয়দেব প্রযুক্ত পাঁচ মাত্রার ছন্দোবন্ধ তিনি অসামান্য কৌশলে অনুসরণ করেছেন। একই পদে দ্বিবিধ বন্ধ এবং একই পদে মিশ্র পর্ববন্ধ আরোপ করে ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। ছন্দে তরঙ্গ দোলা আনতে আখর বা ধুয়া প্রয়োগও তাঁর সচেতন কবিমানসের পরিচয়। বিভিন্ন পদের ভাবানুষঙ্গে অলংকার ব্যবহারের প্রচেষ্টাও তাঁর কাব্যভাষার অমূল্য সম্পদ। বিচিত্র উপমা প্রয়োগে কাব্যে চমৎকারিত্ব সম্পাদন ও শব্দচিত্র এবং নিসর্গ সৌন্দর্য-চিত্র সৃষ্টিও তাঁর শিল্পীমনের পরিচয় বহন করে। কবিভাষার মধ্যে দিয়ে তাঁর পরিশীলিত কবিমনের উদ্দাম উচ্ছসিত ভাব যেমন পরিস্ফুট, যেমন কাব্যভাষার তির্যক বাক্‌ভঙ্গিতে তাঁর সতর্ক কবি মেজাজটি ধরা পড়ে, তেমনি প্রাকৃত অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ কাব্যভাষার মাধ্যমে তিনি মাঝে মধ্যে ক্ষণিক আত্মপ্রকাশ করেছেন। সর্বোপরি রাধার আত্মসমর্পণের মতো কবিও যেন প্রার্থনার পদগুলিতে সর্বতোভাবে মাধবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর আপাত নিরপেক্ষ কবি মানসিকতা ও তন্ময় বিষয়নিষ্ঠা খসে পড়েছে এবং কবি হৃদয়টি গীতিকাব্যিক ব্যঞ্জনায় বিষয়বস্তুর সাথে একাত্মতা লাভ করেছে। দেখার তীক্ষ্ণ চোখ ও হৃদয়ানুভূতি যুগপৎ তাঁর কবি ব্যক্তিত্ব গঠন করেছে। বিদ্যাপতিকে যেমন অকৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষার কবি বলা যায়, তেমনি চন্ডীদাসকে খাঁটি বাংলা কবিভাষা রীতির সৃষ্টিকর্তা বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর কবিভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কাব্যে এক দুরপনেয় আবেগ ও কোমল মাধুর্য সঞ্চার তাঁকে অপরাপর বৈষ্ণব পদকর্তা থেকে পৃথকত্ব দান করেছে। প্রাক চৈতন্য রাধাকৃষ্ণলীলা - কাব্যে তাঁদের যে মানবিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও আরোপিত অলৌকিকতা বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের মধ্যে লক্ষিত হয়, তাকে অনাড়ম্বড় ও সহজ ভঙ্গিতে উদঘাটিত করেছেন চন্ডীদাস। তাঁর সমগ্র পদাবলীর কবিভাষা রাধাকৃষ্ণের 'পিরীতি' সর্বস্ব মনোভাবটির

পরিচয় আবিস্কারে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে। পল্লীবাংলার লোকায়ত কথ্য ভাষাভঙ্গি ও প্রবাদ প্রবচনের মাধ্যমে তিনি রাধাকৃষ্ণের জীবন্ত বিগ্রহ নির্মাণে তৎপর হয়েছেন। ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি প্রধানত আশ্রয় করেছেন অক্ষর সংখ্যাত বা মিশ্রবৃত্ত ছন্দরীতি। তবে প্রয়োজনে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক ভাষা পরিবর্তনের মাধ্যমে ছন্দের মাত্রাসমতা রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বিদ্যাপতির মতো তাঁর পদেও একই পদে দ্বিবিধ ছন্দোবন্ধ লক্ষণীয়। মাত্রাসমতা বা ধ্বনি তরঙ্গ সৃষ্টিতে আখর বা অতিপর্বের প্রয়োগ তিনি করেছেন। কথ্যরীতির দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারও তাঁর কাব্যে দৃষ্ট হয়। কাব্যভাষায় শিল্প কারুকৃতি সৃষ্টির দিকে তাঁর বিদ্যাপতির মতো সতর্কতা ও সচেতনতা পরিস্ফুট হয় না। একথা ঠিক, কিন্তু একটা অনায়াস স্বতস্ফূর্ততা তাঁর কাব্যভাষাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। অলংকৃত ভাষা ব্যবহারের দিকেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। চিত্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রেও কথাচিত্রের বদলে মূলতঃ ভাবচিত্র-অঙ্কন-প্রয়াসই লক্ষিত হয়। মাঝে মাঝেই স্বগতোক্তি ও আত্মমগ্নতা তাঁর মগ্ন কবিমনটি ও রসাপ্লুত ব্যক্তিত্বটি তুলে ধরে। আবার প্রেমের নিস্কাম পরকীয়া ভাবটি সমাজে ধিক্কৃত হয় বলে, মাঝে মাঝে তাঁর কবিভাষায় সমকালীন সমাজের প্রতি তীব্র বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছে। এখানে তাঁর কবি ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তবে, প্রায়শঃই তিনি যেন সমাজ-সংস্কারকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁর সৃষ্ট রাধা চরিত্রের মতোই এক সুদৃঢ় আত্ম - নিবেদনে কবিভাষাকে সরল স্বচ্ছ ঋজুতা দান করেছেন। তাঁর অকৃত্রিম সাধক মনটি যেন তাঁর কবিভাষার মতোই। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা তার সবিশেষ আলোচনা করেছি।

চৈতন্য-উত্তর যুগে রাধাকৃষ্ণ-ঐতিহ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের আরোপণে নতুন মাত্রা লাভ করে এবং মূলতঃ চৈতন্যদেব আচরিত ও প্রভাবিত ভাব ভাবনা ধর্মাচার-তত্ত্ব বৈষ্ণব পদাবলী কে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। তাই চৈতন্য সমসাময়িক ও পরবর্তী কালীন বৈষ্ণব মহাজনপদকর্তাদের কাব্য ও কাব্যভাষা বিষয়বস্তুর মতোই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অবশ্য বিষয়বস্তুতে রাধাকৃষ্ণ লীলা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব নির্দিষ্ট স্তর পরম্পরায় অনুসৃত হতে থাকে, যার ফলে তা ক্রমশই অলৌকিকতা দুষ্ট হয়ে পড়ে এবং গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয় ভক্তিবন্যা - ধারায়। তবে এরই মধ্যে চৈতন্যদেবের জীবন সমন্বিত ও চৈতন্যদেব কেন্দ্রিক পদগুলি নতুনভাবে বৈচিত্র্য উৎপাদন করে। চৈতন্যোত্তর পদকর্তাদের কবিভাষার বৈশিষ্ট্য নিরুপণে উপরোক্ত - কথাগুলি মনে রাখা প্রয়োজন।

চৈতন্য-পরবর্তী কবিগোষ্ঠীর মধ্যে জ্ঞানদাস ও বিশিষ্ট কবিভাষা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন এবং ব্রজবুলি বাংলা উভয় ভাষাঙ্গিকেই কাব্য রচনা করেছেন। তবে তাঁর বাংলা পদাবলীগুলোই বিশিষ্টতা লাভ করেছে। জ্ঞানদাসের কাব্যগুরু হিসেবে বিদ্যাপতি নয়, চন্ডীদাসই চিহ্নিত। তবে চন্ডীদাসের কাব্যশিল্পের প্রতি যে অনীহা ছিল জ্ঞানদাসে তা অনুসৃত হয়নি। বরং শব্দ ব্যবহারে সচেতনতা ও কাব্যভাষাকে যথা-সম্ভব সঙ্গীতধর্মী ও শ্রুতিমধুর করতে তিনি তৎপর থেকেছেন। কবিভাষাকে লোকায়ত জনসমাজে আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে চলিত ও কথ্য ভাষাভঙ্গি আরোপ করেছেন সুকৌশলে। নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার ও প্রবাদ প্রৌঢ়োক্তির প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। কাব্যভাষায় নাটকীয়তা সৃষ্টি ও রাধাকৃষ্ণের সংলাপ মুখর ভাষাভঙ্গি তাঁকে চিহ্নিত করে অন্যান্য কাব্যকারদের থেকে। নাট্যধর্মীতার জন্য তাঁর পদাবলীতে অপূর্ব দ্বন্দ্ব সংশয় ক্রিয়া ও গতিশীলতার সঞ্চার হয়েছে। ছন্দের ক্ষেত্রে প্রধানত মিশ্রবৃত্তরীতি অনুসরণ করলেও অনেক স্থলে দলবৃত্ত রীতির প্রাকৃত ছন্দ তাঁর কবিভাষাকে লোকসমাজের কাছাকাছি এনেছে। ভাষাকে কোমল ধ্বনিমাধুর্যে অলংকৃত করার প্রয়াস তাঁর মধ্যেও অল্পবিস্তর ছিল। তবে অলঙ্কার সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভাষার

সৌন্দর্য বর্ধনে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল না। বরং স্বতস্ফূর্ত প্রয়াস কলার দিকেই ঝোঁক অনুভূত হয়। তাঁর কবিমনটি তথা ব্যক্তি জ্ঞানদাসকে গভীর ভাবে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে তাঁর সৃষ্ট অসাধারণ চিত্রকল্পগুলি। আধুনিক অর্থেও তা বুদ্ধি ও আবেগের যৌথ মূর্তি রূপায়ণে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। তাঁর কাব্যভাষায় এক গোপন ইশারা ইঙ্গিতময়তা যেন ব্যঞ্জিত হয়েছে। এক সুগভীর ইন্দ্রিয় চেতনার আবেশ চিত্রকল্পগুলিকে শব্দাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা দিয়েছে। এব্যাপারে কোন বৈষ্ণব কবিই তাঁর সমকক্ষ নন। এক রোমান্টিক বিষাদ চেতনা তাঁর কাব্যভাষায় ও চিত্রকল্পে সংকেতিত হয়েছে বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের মধ্যে যে মরমী ভাবনা ও বাউলজীবনের সহজিয়া ভিত্তিক সাধনমগ্নতা ছিল একমাত্র জ্ঞানদাসই তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফলে তাঁর কাব্যভাষা ও কবিব্যক্তিত্ব এক বর্ণ-গন্ধ রূপময় দৃশ্যজগৎ ও চিন্তা আবেগ ভাবনা মূলক রহস্যময় ইন্দ্রিয়জগৎকে ধরতে চেয়েছে।

চৈতন্য পরবর্তী বিশিষ্ট কাব্যকারদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজ তাঁর কাব্যভাষা নির্মাণে বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষাকেই প্রধানতঃ মান্য করেছেন। বলা যায় বিদ্যাপতিকে কাব্যগুরু, ব্রজবুলিকে কাব্যমাধ্যম ও চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ভাবকে কাব্যবিষয়বস্তু করে তিনি পদাবলী রচনায় তৎপর হন। একদিকে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন লীলার রাধাকৃষ্ণ, অন্যদিকে প্রাকৃত বৃন্দাবন নবদ্বীপের চৈতন্যদেব তাঁর কবিভাষায় ও কবিমনের সাহচর্যে পরিস্ফুট হয়েছে। অপূর্ব শব্দধ্বনি ও অফুরন্ত শব্দমেলের সাহায্যে তাঁর কাব্যভাষা স্পন্দিত হয়েছে। শব্দ নির্বাচনের অসামান্য কৃতিত্ব হেতু কবিভাষা এক বিশিষ্ট শিল্পকৃতি লাভ করেছে। একই শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে বিষয়বস্তুকে বিশেষ বক্তব্য মুখীন করার চেষ্টা আধুনিক কবিদের সমগোত্রীয় করেছে গোবিন্দদাসকে। এবং তাঁর কবিব্যক্তিত্বকে চিহ্নিত করেছে। ছন্দরীতির ক্ষেত্রে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কলাবৃত্ত রীতির বৈচিত্র্য সম্পাদনে। ছন্দ ব্যবহারে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তিনি সতর্কভাবে। শব্দঝঙ্কার তাঁর কবিভাষার প্রাণস্পন্দন স্বরূপ। বিচিত্র অলঙ্কার সৃষ্টির মাধ্যমে যেমন কবিভাষায় বর্ণাঢ্যতা এনেছেন, তেমনি বুদ্ধিও ইন্দ্রিয়াবেগ স্পর্শ দিয়ে চিত্রকল্প নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন।[১] নিসর্গ পটভূমিকে জীবন্ত রূপে উপস্থিত করে চিত্রকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি অপরাপর বৈষ্ণব কবিদের মাঝে নিজেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। কি শব্দচিত্র কি অর্থব্যঞ্জনাধর্মী চিত্র—উভয়ক্ষেত্রেই তিনি সফল হয়েছেন। এক বিস্ময়কর নিরপেক্ষতা বজায় রেখেও তাঁর নিবিড় - নিশ্চল ভক্তমনের বিশ্বাস তাঁর কবিভাষাকে ও কবিভাবনাকে বৈষ্ণবীয় সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছে। তাঁর কাব্যের সর্বত্রই একটি অধ্যাত্মিক উপলব্ধির সন্নিষ্ঠতা যেন 'গীতাঞ্জলির' গানগুলির মতোই দর্শনসমৃদ্ধ।

অপ্রধান তথা গৌণ পদকর্তাদের মধ্যে বলরামদাসের কাব্যভাষা ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় রীতিতেই আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর কলাবৃত্ত ছন্দোরীতিতে একপদী বন্ধে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। ভাষাকে অলঙ্কৃত করার উদ্দেশ্যে সুন্দর ভাবে যুগ্ম ব্যঞ্জনের ধ্বনি অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন। জগদানন্দের কবিভাষার প্রধান হাতিয়ার অপূর্ব শব্দ-সন্নিবেশ ও ধ্বনি ঝংকার। সমগ্র বৈষ্ণব কাব্যে তাঁর মতো শব্দসচেতন ও অলংকার সচেতন মনের পরিচয় কম কবিই রেখেছেন। শশিশেখরের মধ্যে কলাবৃত্তের পাঁচ পর্বমাত্রা বিশিষ্ট ছন্দোবন্ধ সার্থক ভাবে অনুসৃত হয়েছে। সরাসরি জয়দেব থেকেই তিনি এর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যটি নিয়েছেন বলে মনে হয়। গৌরাঙ্গের বাল্য জীবনকে সুন্দর ভাবে চিত্রকল্পের মাধ্যমে পরিস্ফুট করেছেন। বাসুঘোষের মধ্যে ব্রজবুলি ও আধা ব্রজবুলি ভাষার বাগভঙ্গিতে ছন্দোদৌর্বল্য লক্ষিত হয়। তবে চিত্রকল্পের মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের টুকরো

টুকরো ছবিগুলি সুন্দর সৃষ্টি হয়েছে। লোচনদাসের কবিভাষায় বিশেষভাবে লক্ষিত হয় ঘরোয়া কথ্য শব্দাবলীর ব্যাপক প্রয়োগ। ছন্দের ক্ষেত্রেও লৌকিক রীতির দলবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন তিনি। ফলে তাঁর পদবলী লৌকিক পদাবলীর কাছে চলে এসেছে আপন স্বাতন্ত্র্যে।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে যথার্থ ভাষাশিল্প বা মন্ডনকলার গুরুত্ব বৈষ্ণব কবিরা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁরা বৈষ্ণব কাব্যের কবিভাষার ওই জগৎ গড়ে দেন। এর পরিচয় মধ্যযুগের বৈষ্ণব কাব্যে আমরা পেয়েছি এবং তা পরবর্তী কালের বাংলা কাব্যধারাকেও নানাভাবে প্রভাবিত করে চলেছে।

গ্রন্থসূত্র

১. "An 'image' is that which presents an intellectual and emotiuonal complex in an instant of time." (Literary Easays of Ezra Pound, Edited with an introduction by T. S. Elict (Feber edition), Part I, A Retrospect, P- 4.)

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যধারায় চৈতন্য-পূর্ব, -সমসাময়িক এবং-পরবর্তীকালের যে বিপুল বৈষ্ণব সাহিত্য তা এখনও আমাদের বিস্মিত করে। পদাবলীর লোকায়ত সৌরভ যেমন জীবন প্রবৃত্তিকে নাড়া দেয়, তেমনি এর দর্শন সম্মত আবেদনও পদকর্তাদের অসামান্য প্রতিভায় স্বয়ংদীপ্ত।

পদাবলীর ভাষা-ছন্দ-অলংকার ও চিত্রকল্প সমন্বিত কবিভাষা ও কবিব্যক্তিত্বের প্রবণতাকে আলোচ্যগ্রন্থে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

978 - 81 - 89827 - 61 - 8